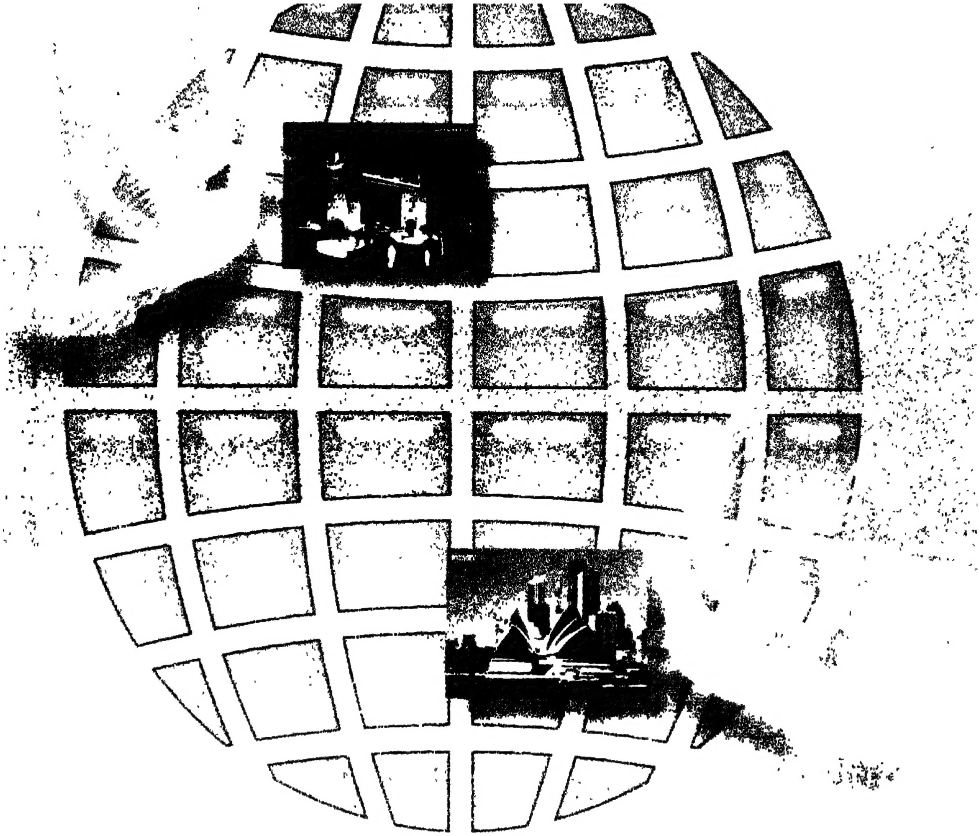

দেশে বিদেশে পথে প্রবাসে

অধ্যাপক প্রভাসচন্দ্র ধর

516

দেশে বিদেশে
পথে প্রবাসে

অধ্যাপক প্রভাসচন্দ্র ধর

STATE CENTRAL LIBRARY
AGARTALA
10819
27.07.08

পারুল প্রকাশনী

৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯, ফোন ঃ ২২৪১ ৬৪৭৪
আখাউড়া রোড, আগরতলা-৭৯৯ ০০১, ফোন ঃ ২৩৮ ৬৯৪৭

Library
11th FIN Com No
11th FIN MR 43223

প্রকাশিকা :
শ্রীমতি রত্না সাহা
আখাউড়া রোড, আগরতলা

প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি, ২০০৫

প্রচ্ছদ : শিবেন্দু সরকার

লেজার সেট :
সাপ্লাই সিন্ডিকেট
৮/৩, চিন্তামণি দাস লেন
কলকাতা-৯

প্রিন্টার্স :
চারু প্রেস
কলকাতা-৫৪

মূল্য : আশি টাকা

আমাদের দুঃখের সময়ে যে মেয়েরা মা হয়ে এসে স্নেহ দিয়ে শ্রদ্ধা দিয়ে আমাদের দুঃখ অপনোদন করেছেন ও কবছেন সেই—

কবিতা পোদ্দার

কৃষ্ণা দেবদাস

চুমকি সাহা

পুতুল শঙ্খবণিক

বনানী দত্ত

মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপা দেববর্মা

শিখা চক্রবর্তী

ও

সোমা সাহা

মায়েদের হাতে দিলাম

লেখকের অন্যান্য বই

- *ককবরক সৗরীঙমা* - ১৯৮৩
- রামায়ণ প্রভাসচন্দ্রনি -
- বরকধর্ম -
- Sri Rajmala - Vol-III - 1995
- সরব চিন্তন -
- উলটপুরাণের দেশ— আমেরিকার কথা
- শ্রীশ্রী সারদামঙ্গল কাব্য - ২০০৫

সূচিপত্র

অথ নির্বোধ কথা	১-৬
ফ্রান্স	৭-১৩
প্যারিস	১৪-২৩
ডিজনিল্যান্ড	২৪-৩৫
ভার্সাই	৩৬-৪২
কেমব্রিজ	৪৩ ৫১
রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেন্টার, বাকিংহামশায়ার	৫২-৫৪
রোগের নাম ব্যক্তিপূজা	৫৫-৫৮
লোয়েস্‌টফ্‌ট্‌	৫৯-৬১
সুইজাবল্যান্ড	৬২-৮৩
ইপ্সউইচ	৮৪-৯১
ক্যান্টারবেবি	৯২-১০০
লন্ডনে দুর্গাপূজা	১০১-১০৮
লন্ডনে আরেকদিন	১০৯-১১৬
গ্রীনিচ	১১৭-১২৮
অল্ডবরা সমুদ্র সৈকত	১২৯-১৩১
শ্রীমৎ নিম্বাকার্যের সাথে এবার ঢাকাতে	১৩২-১৪০
চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মহেশখালি	১৪১-১৫২
উজ্জয়িনীর কুম্ভমেলায় অমৃতের সন্ধানে	১৫৩-১৬৫
অনুক্রমণিকা	১৬৬-১৭০

অথ নির্বোধ কথা

"এদিকে আসুন।"

আমরা এগিয়ে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। পুলিশ অফিসারটি জিজ্ঞেস করলেন,

কোথায় যাবেন?

লন্ডন।

আজ তো কোনো ফ্লাইট নেই। দেখি আপনাদের টিকিট? কোন্ এয়ারলাইন্স?

আমি হতভম্ব। আমাদের টিকিট রয়াল জর্ডানিয়ান এয়ারলাইন্সের। আজ ২০০৩ সালের বারোই জুলাই শনিবার। আজ রাত সাড়ে বারোটায় আমাদের ফ্লাইট। আগরতলায় আমাদেব আত্মীয় ও স্বজন সকলেই জানেন আমাদের লন্ডন যাত্রার তারিখ ও সময়ের কথা। সন্ধে বেলাতেই খাইয়ে দাইয়ে ধোপদুরস্ত পোশাক পরিয়ে সোমা-চুমকি মায়েরা সন্তানের মতো যত্নে আমাদেরকে তৈরি করে পাঠিয়েছেন। এখন কলকাতায় নেতাজি সুভাষ বিমান বন্দরের আন্তর্জাতিক এলাকার দরজায় দাঁড়ানো পুলিশ অফিসার বলছেন, 'আজ কোনো ফ্লাইট নেই। দেখি আপনাদের টিকিট? কোন্ এয়াললাইন্স?'

টিকিট তো তৈরিই থাকে পকেটে। আমারও ছিল। বার করে ওঁর হাতে দিলাম। তিনি খুলে দেখে বলেন,

"হুঁ। আপনার প্লেন গতকাল চলে গেছে, চব্বিশ ঘণ্টা আগে।"

আকাশ কি মাথায় ভেঙ্গে পড়ে? পড়ুক আর নাই পড়ুক এমন একটা প্রবাদ তো আছে বাংলা ভাষায়। একবার মেয়েকে একবার ছেলেকে, আরও দু'চারবাব অন্য অন্য জিজ্ঞাসুকে প্রবাদটির অর্থ বুঝিয়েছি। আজই কেবল বুঝছি যে বুঝানোটা কত অগভীর ছিল। আকাশটা সত্যিই বুঝি ভেঙে পড়েছে। আমি চারদিক অন্ধকার দেখছি।

সঙ্গিনী বেলা পুলিশ অফিসারটিকে জিজ্ঞাসা করে,

এখানে ভিতরে ফোন করে জানবার ব্যবস্থা কিছু নেই?

আছে। কিন্তু ভিতরে কাকে ফোন করবেন? ভিতরে কেউ নেই। তা ছাড়া আজ তো শনিবার। সব এয়াবলাইন্সের অফিসই আজ বন্ধ হয়ে গেছে। কালও ববিবার। কিছু জানতে হলে সেই সোমবার সকালে। তার আগে কিছু হবার জো নেই। ঘাবড়াবেন না। এমন মাঝে মাঝেই হয়ে যায়। ইংরেজি আর বাংলা টাইমে তাবিখে গোলমাল পাকিয়ে যায়। আপনাদের টিকিট ইংরেজি সময় ০০.৩০, তারিখ ব'রোই জুলাই। অর্থাৎ, এগারোই জুলাই রাত সাড়ে বারোটায়। এমন হয়।

সেই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছিল আমি সংসারে নির্বোধতম মানুষটি। ধীরে ধীরে টেলিফোনের কাছে গিয়ে অলককে ফোন করে জানালাম আমাদের নির্বুদ্ধিতার কথা। বললাম যে আমরা ফিরে আসছি।

ট্যাক্সিতে বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছিলাম। ফিরে যাচ্ছি কলকাতায়। লন্ডন দুর অস্ত। টিকিটের ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল মে মাসেই। তখনই শঙ্কর সেন মশায় ফোনে জানিয়েছিলেন যে তিনি আমাদের টিকিট করে ফেলেছেন। যাত্রা রয়াল জর্ডানিয়ান এয়ারলাইন্সে আম্মান হয়ে লন্ডন। যাত্রা আরম্ভ বারোই জুলাই রাত সাড়ে বারোটায়। তারপর টিকিট পেয়েছিলাম কলকাতায় এসে। খুলে কি দেখেছিলাম? মনে নেই। সেই বারোই জুলাই রাত সাড়ে বারোটার কথা যে মগজে আটকে গেল। আর প্যাঁচ খুলল না। আজ এই বিপত্তি। জীবনে কত কিছু যে ঘটে যায়। কত অসম্ভব যে সম্ভব হয় কে জানে। আজ এই মুহূর্তে আমার যা ঘটল সেটা কোনো গল্পে লিখলে লোকে বলত, 'অসম্ভব, আজগুবি, গাঁজা। এমন কখনো হয়? তেষট্টি বছর বয়সের অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজির অধ্যাপক, প্রায় লক্ষ টাকার দুজনের লন্ডন যাওয়ার রিটার্ন টিকিট খুলেও দেখেননি, যাত্রার নির্দিষ্ট সময়ের চব্বিশ ঘণ্টা পরে তিনি এয়ারপোর্টে গিয়ে শুনলেন তিনি একদিন পরে এসেছেন? এমন হয়?' কিন্তু হয়ে তো গেল। আমি যে ট্যাক্সিতে বসে কলকাতায় অলক-সোমার বাড়ি থেকে এক ঘণ্টা আগে রওয়ানা হয়ে এসেছিলাম সেখানে ফিরে যাচ্ছি সেটা তো আর কল্পনা নয়? জলজ্যান্ত সত্য। আজগুবি নয়। গাঁজা নয়। Truth is stranger than fiction. তবে হয়। সত্য কখনো সখনো এমন ঘটে যায় যা গল্প হলে লোকে বিশ্বাস করত না। আমার বন্ধু মণিলাল চৌধুরী বি.এ. পরীক্ষার স্পেশাল বাংলা পরীক্ষা দিতে গিয়ে শুনেছিল যে তার পরীক্ষার তারিখ ছিল আগের দিন। ভুল না-করেও সকল সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অধ্যাপকবর প্রদীপ বসু ও তার সঙ্গের বরযাত্রী আমরা সন্ধে সাতটার বিয়ের লগ্ন ধরতে পারিনি। কনে অধ্যাপিকা অপর্ণার বাড়ির লোকেরা ও কনে নিজে দুর্ঘটনার আতঙ্কে ও ভয়ে কেঁদেকেটে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। বিয়েবাড়ির আলোর মালা নিভে গিয়েছিল। রাত তিনটেয় আমরা পৌঁছে হাঁকডাক করলে সবাই জাগেন, আলো জ্বলে, পুরোহিত আসেন, সূর্যদেব প্রায় বিয়ে দেখেন আর কী! জানুয়ারির ভোর রাতে ধর্মনগরে 'বোয়ালর লেঞ্জা' দিয়ে বরযাত্রী ভোজনের সেই অভিজ্ঞতা অনন্য হয়ে আছে মনে আজও। সে-কথা উঠলেই সুধারঞ্জন আজও উত্তেজনায় ক্রোধে ও আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন। সে তো বছর তিরিশেক আগের কথা মাত্র। তখনো টেলিফোন ব্যবস্থা অনেক পিছিয়ে। আগরতলা-ধর্মনগর পথের কোনো জায়গা থেকে ধর্মনগরে খবর পাঠানো সম্ভব ছিল না যে বর ও বরযাত্রী দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়নি। আসছে।

গত বছরই (২০০২) ছেলের সঙ্গে থেকে এসেছি আমেরিকায়—ওয়াশিংটনে। ফেরার পথে ছেলেরই করে দেওয়া ব্যবস্থায় লন্ডনে থেমে শহর লন্ডন, বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ড ও আবাল্য স্বপ্নের তীর্থস্থান উইলিয়াম শেক্সপীয়রের জন্মভূমি স্ট্রাটফোর্ড আপন আভন দেখে জীবন ধন্য করে এসেছি। কিন্তু বিশেষ পারিবারিক কারণে, কিছু আত্মীয়ের বৈর ব্যবহারে আমার স্ত্রীর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ে। জানুয়ারি ২০০৩ -এ তার অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যায়। অনেকেই সে-সব কথা জানলেও কেউ সক্রিয়ভাবে সাহায্যে করতে আসেন নি। মার্চ মাসে হঠাৎ সাহায্য আসে। আমার ভাই দীপঙ্কর ও ডা. জ্যোতির্ময় ঘোষ, ঔষধের চিকিৎসা এবং দাদা জিতেন পাল সামাজিক চিকিৎসার ভার নেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পুত্র লন্ডন থেকে তাগাদা দিতে থাকে তার মাকে নিয়ে কিছুদিনের জন্য ব্রিটেন চলে যেতে এবং কিছুদিন থেকে আসতে। কিছু ইতস্তত করে রাজি হয়ে যাই। প্রবাসের প্রস্তুতির গাড়ি চলতে

শুরু করে। বন্ধুবর পঙ্কজ রায়কে ফোন করে ভ্রমণ-সহায়ক শ্রীশঙ্কর সেনের নাম ও ফোন নাম্বার সংগ্রহ করি। তাঁকে অনুরোধ করি, আমাদের টিকিট ও ভিসার ব্যবস্থা করতে। পুত্র প্রসূন এবার ইংল্যান্ডবাসী। সে আমাদের ইউনাইটেড কিংডাম যাওয়া ও থাকার জন্য স্পনসরশিপ পাঠায় এবং ফ্রান্স ও সুইজারল্যান্ড ভ্রমণের জন্য স্টার টুআর্জ নামক ভ্রমণ সংস্থার প্যাকেজ টুআর এর ব্যবস্থা করে কাগজপত্র পাঠায়। তার কথামতো আমাদের ফোন-পরিচিত শঙ্কর সেন মশায়কে আমাদের জন্য ইউ. কে., সুইজারল্যান্ড ও শেনিয়ান (Shengen) ভিসার ব্যবস্থা করতে বলি। তিনি সব ব্যবস্থা করতে থাকেন আমাদের সই করা কাগজপত্র দিয়ে। জুনের মাঝামাঝি তিনি জানান যে আমাদের যাওয়া হবে বারোই জুলাই—রাত সাড়ে বারোটায়। সবাইকে এবং নিজেকে বলি সেই তারিখ ও সময়ের কথা। তাতেই আমার বারোটা বেজে যায়। আমি এয়ার পোর্টে পৌঁছাই চব্বিশ ঘণ্টা পরে।

দেরিতে পৌঁছালে কত অঘটনই ঘটে যায়। এমন একটা বড় অঘটনের কথা লেখা আছে আমাদের মহাভারতে। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ আসন্ন। ভারতবর্ষের নরপতিরা যুদ্ধে যোগ দিতে আসছেন সসৈন্যে। কেউ কৌরব এবং কেউ পাণ্ডব পক্ষে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করবেন। যুদ্ধ তো নয়, যেন খেলা। যস্মিন দেশে যাদাচার। সকলেই তো জানেন যে মদ্রদেশ এর রাজকন্যা মাদ্রী ছিলেন মহারাজ পাণ্ডুর কনিষ্ঠা মহিষী। তাঁরই পুত্র চতুর্থ ও পঞ্চম পাণ্ডব নকুল ও সহদেব। সেই মদ্র দেশের তদানীন্তন রাজা মাদ্রীর ভাই, মহারাজ শল্য, অর্থাৎ নকুল ও সহদেবের মামা সসৈন্যে আসছিলেন কুরুক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে। বিষয়টা একবার ভাবুন। সিংহাসনের জন্য যুদ্ধ। এখন যেমন হয় সিংহাসনেব জন্য নির্বাচন। এখন নির্বাচনে বিভিন্ন ধরনের প্রচার ও অপপ্রচারে বুদ্ধিজীবী ও দুর্বুদ্ধিজীবীরাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। অস্ত্র ও শস্ত্রের ব্যবহার এবং তজ্জনিত নিধন হয় অপ্রকাশ্যে। কিন্তু সেই মহাভারতের অপ্রগতিশীল যুগে বুদ্ধি ও দুর্বুদ্ধিজীবীদের জন্ম হয়নি, মিডিয়া নামক বস্তুসমষ্টি ছিল না। প্রচার ও অপপ্রচার ছিল নগণ্য। কেবল ছিল অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার ও নিধন—সব প্রকাশ্যে। কিন্তু একটা বিষয়ে মিল ছিল। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের বিশেষ সুবিধা ছিল তখনো, যেমন আছে এখনো। সরকারি যন্ত্রের (অপ) ব্যবহার, ভোটার তালিকায় কারচুপি, বাড়তি ব্যালট পেপার ছাপানো, বুথ দখল, নির্বাচনের আগে ও পরে নির্বাচন প্রার্থী, নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং মন্ত্রী ক্রয়বিক্রয়, ইত্যাদি হয় বলে আমরা খবরের কাগজে পড়তে পড়তে এখন অবাক হতে ভুলে গেছি। কিন্তু তখন তো এসব ব্যবস্থা ছিল না। তবু দুর্যোধন পক্ষ ক্ষমতায় ছিলেন এবং ঐশ্বর্য ব্যবহার করার সুযোগ ছাড়েননি। পাণ্ডবরা তো নিঃস্ব, এখনকার সরকার বিরোধী দলের মতো। কৌরবদের এমনি এক ঐশ্বর্য ব্যবহারের কথা লেখা আছে মহাভারতে। মদ্ররাজ শল্য সসৈন্যে আসছিলেন কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে—অবশ্যই পাণ্ডবদের পক্ষে। দুর্যোধনের পক্ষের লোকেরা মহারাজ শল্য ও তাঁর সৈন্যদেরকে মহাসমাদরে গ্রহণ করলেন। আতিথেয়তা গ্রহণ করার পর রাজা শল্য যখন জানলেন যে তিনি কৌরবদের অতিথি হয়েছেন তখন তিনি পরবশ। ফলে, সেই সময়ের মানদণ্ডের মর্যাদা রক্ষা করতে তাঁকে কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। পাণ্ডবদের দূত সময় মতো পৌঁছাতে পারলে এই অনর্থ ঘটত না।

আজ আমার এমনই অনর্থ ঘটে গেল। বাড়ি ফিরে এসে দেখলাম সকলের রাতের খাওয়া পণ্ড করেছি। ওঁরা খাচ্ছিলেন। আমি ফোনে জানালাম আমার বিপর্যয়ের কথা। ওঁরা এতটাই

শকট্ হলেন যে ওদের আর খাওয়া রুচল না। লন্ডনে ছেলেকে ফোন করে জানাতে তার চোখে জল এসে গেল। তিনটি মাস ধরে সে আশায় অপেক্ষা করছে বাবা-মা আসছে। মনে মনে কত পরিকল্পনা করেছে বেড়াবার, সুইজারল্যান্ড ও ফ্রান্সে প্যাকেজ টুআর-এর ব্যবস্থা করেছে। এখন সব শেষ হয়ে গেল! ফোন করলাম শঙ্করবাবুকে। তিনিও শকট্। ছেলে বলে এমন কথা সে শুনেছে আগেও। কিন্তু তার বাবার ক্ষেত্রে এমন ঘটতে পারে একথা তার মনে হয়নি। শঙ্করবাবুও জানালেন যে আমি বলে তিনি বিশেষ ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন বোধ করেননি। আমি কাকে দায়ী করি? আত্মগ্লানিতে ডুবে গেলাম। কাল রবিবার। সোমবার সকালে শঙ্করবাবু এসে আমাকে নিয়ে এয়ার লাইন্সের দপ্তরে যাবেন। বোধ হয় সামান্য গচ্চা দিলেই এর সুরাহা হয়ে যাবে। ছত্রিশ ঘণ্টা শরশয্যায় শয়ন করতেই হবে।

আমেরিকা থেকে ফিরে এসে জেট ল্যাগ সারানোর জন্য ঠিকমত ঘুমোতে পারিনি। ফলে ক'দিন যাবৎ রাতে ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছিল। রাত দেড়টা দু'টোয় ঘুম ভেঙে যায়। বড় অস্বস্তি। একথা শুনে স্বামী সচ্চিদানন্দ দাস কাঠিয়া বাবাজী আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, "তোমার তো বড় ভাগ্যি! যে সময়ে ঘুম ভাঙবার জন্য এত চেষ্টা করেন সন্তগণ, ঠাকুর বিনা চেষ্টায় তোমাকে সে সময়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে সাহায্য করছেন? খুব জপতপে লেগে যাও। এই সুযোগ নষ্ট করো না।" আজ আমার ঘুম নেই। সচ্চিদানন্দ দাসজীর উপদেশ পালন করার চেষ্টা করলাম। কোথায় কি? সাধুর পথ কি গৃহস্থের পক্ষে সহজ? আমার শুধু এতগুলি টাকা নষ্ট হয়ে যাওয়ার চিন্তা। আমার শুধু এত আশা নিরাশা হয়ে যাওয়ার চিন্তা। আমার শুধু আমার স্ত্রীর স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়ার এমন একটা সুযোগ ভেস্তে যাওয়ার চিন্তা। শ্রীমান অলব ক্রমাগত সাহস দিচ্ছিল, 'মেসো; আপনি যাবেন। টাকা লাগলে লাগবে, তবু চিন্তা করবেন না।

দুই রাত্রি এইভাবে গেল। ঠাকুরের নাম করার নিষ্ফল চেষ্টা উদ্বেগের দুর্বার বন্যায় ভেসে যেতে লাগল। তেরো তারিখের রাত থেকে অবিরাম বর্ষণ হতে লাগল। সোমবার সকালে বালিগঞ্জ প্লেস জলের তলায়। কিন্তু শঙ্কর সেন মশায়ও তো আমারই মতো উদ্বিগ্ন। তিনি এই বর্ষণেও এলেন। দু'জনেই ট্যাক্সি করে নৌকা চড়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে রয়াল জর্ডানিয়ান এয়ার লাইন্সের অফিসে গেলাম। অফিস খুলেছে। কিন্তু লোক মাত্র একজন। একটি অতি সৌম্যদর্শন যুবক উপস্থিত আছে। শঙ্কর সেন তাকে সমস্ত বলে আমাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠাতে অনুরোধ করলেন। ছেলেটি তার যন্ত্রগণককে খানিকক্ষণ এটাওটা করে জিজ্ঞাসা করলো। 'কবে যাবেন? কাল যেতে পারবেন?' আমরা দু'জনে একসঙ্গে সম্মতি জানালাম। দু'মিনিট বাদেই সে আমাদের হাতে কাগজ দিল। আমাদের লন্ডন যাওয়ার মন্ত্র কাগজ। সে টাকা পয়সা কিছু চাইল না। বলল যে-এরকম ভুল অনেকেই করছেন। প্রায়ই 'নো শো' হয়ে যাচ্ছে দেখে ওরা চেষ্টা করে এই ফ্লাইটটার সময় এক ঘণ্টা পিছিয়ে এনেছেন। এখন সময় হবে রাত সাড়ে এগারোটা। তবে আর ভুল হবে না। হঠাৎ করে মাথার উপর থেকে উদ্বেগের পাহাড়টা চলে গেল। আমি সহজে শ্বাস নিতে ও ফেলতে লাগলাম। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসে সবাইকে উদ্বেগ থেকে মুক্তি দিলাম। ফোন করলাম লন্ডনে। ছেলের আনন্দ সবচেয়ে বেশি। আবার ভাবতে পারছে, বাবা-মা আসছে এবং আসছে কালই। জয় মা। জয় রামকৃষ্ণ। আবার উচ্চারণ করতে পারছি সহজে। কি আনন্দ! সুখচরে বাবা বৃন্দাবনবিহারী দাসজীও স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

মধ্যরাতের পর আকাশে উড়লো আমাদের প্লেন। ভোরবেলায় মাটিতে যখন নামলাম তখন আমরা জর্ডনের রাজধানী আম্মানে। জর্ডন। মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলির মধ্যে জর্ডনই তুলনামূলকভাবে শান্তির দেশ। বাকিগুলি সব অশান্তিতে জ্বলছে। ইরাক, ইরান, সিরিয়া, কুয়েত, সবই জ্বলছে। খ্রিস্টানদের পবিত্র নদী জর্ডনও এই দেশের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত। বিশ্ববিখ্যাত অবাক জলখণ্ড 'ডেড সী'ও এই জর্ডন দেশেই অবস্থিত। 'ডেস সী' এর সঙ্গে 'ডেড সী স্ক্রল' কথাটিও জড়িত হযে গেছে। কথায় কথায যখন কথা উঠলোই তখন ওটার কথাও এখানে একটু বলেই নিই। অনুসন্ধিৎসু জনের ভাল লাগতে পারে। তবে তার আগে একটু শিবের গীত গেয়ে নিই। মধ্যপ্রাচ্য সম্বন্ধে দুটো কথা বলে নিই।

বিশাল মধ্যপ্রাচ্যসহ আফ্রিকা মহাদেশের সমগ্র উত্তরাঞ্চল বহু সহস্রাব্দ আগে সভ্যতার সুতিকাগার ছিল। কিন্তু ভূগোল এখানে ইতিহাসকে খেয়ে ফেলেছে। উত্তর গোলার্ধের তুষাব বলয় অনেক উত্তরে চলে গেছে। আফ্রিকার উত্তর ভাগ ও ইজরায়েল, ইরান, ইরাক, সিরিয়া, সৌদি আরব, ইত্যাদি দেশ মরুভূমি হযে গেছে। ফলে বৃষ্টিশূন্য দেশ প্রায় জনশূন্য হয়ে গেছে। কিন্তু একটা লাভ হয়েছে। যে-কোনো জায়গায় যে-কোনো বস্তু পড়ে থাকছে, নষ্ট হচ্ছে না। অথচ আমাদেব দেশে আবহাওয়ার আর্দ্রতায় বা উইয়ে সব নষ্ট করে ফেলে। আগরতলায় মহারাজা বীর বিক্রম কলেজেব সেমিনাব এনেক্সএ দোতলায় গোদরেজের আলমারিতে রাখা মূল্যবান কিছু বই গ্রীষ্মাবকাশেব মধ্যে উইয়ে খেয়ে ফেলল। কলকাতার বালিগঞ্জে অলকদের চার তলার ফ্ল্যাট-এ উইয়ের ওষুধ দিয়ে দরজা জানালা বন্ধ করে ওরা তিনদিন বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র বাস কবেছিল। মধ্যপ্রাচ্যে হাজার দু'হাজার বছর ধরে কাগজ পড়ে থাকে অবিকৃত। কারণ আর্দ্রতা নেই, উই বা কোনো পোকা নেই সেখানে।

১৯৪৭ সালের প্রথম দিককার কথা। কিছু আবব বালক ছাগল চড়াচ্ছিল ডেড সীর পশ্চিম পারে। ওরা তা-আমরিচ উপজাতিব ছেলে। জায়গাটি জেবিকো থেকে এগারো কিমি. দক্ষিণে খিরবেত কুমরান এলাকায়। হঠাৎ পাথবেব গায়ে একটি গর্তে ওদের চোখ আটকে যায়। বালক তো? কৌতুহলী হয় এবং হামাগুড়ি দিয়ে ভিতরে ঢুকে যায়। ভিতরে গিয়ে ওদের চক্ষু ছানাবড়া। সেখানে অনেক মাটির মটকি দেখতে পায়। মটকি হাতড়িয়ে ওরা সাতটি স্ক্রল পায়। স্ক্রল মানে পাকানো চ মড়া। সেলাই কবা লম্বা চামড়া, পাকানো। তাতে কি সব আঁকাবুকি। তিনটি আবার কাপড় দিয়ে পেঁচানো। ওরা সেগুলো নিয়ে এল বাড়িতে। দেখা গেল ওগুলোতে কি সব হিব্রু লেখা আছে। ছেলেবা এগুলি বেথলেহেম-এ নিয়ে গেল এবং এক বণিকের কাছে বিক্রি কবে দিল। সেই বণিক চারটি স্ক্রল পাঠালো জেরুসালেমের সেন্টমার্ক মঠের সিবীয় পণ্ডিত আথানাসিউস ইয়েশুই সামুয়েল এর কাছে। বাকি তিনটি ঐ বণিকের কাছ থেকে কিনে নিলেন জেরুসালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ই-ই-সুকেনিক। পবীক্ষা করে দেখা গেল যে এগুলো খ্রিস্ট পূর্ব দ্বিতীয় থেকে খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে বচিত। আবব-ইজবাযেল যুদ্ধ কিছুদিনের জন্য থামলে পরে ভালভাবে এই ডেড সী ক্রলের পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু হয়। ১৯৫১ সাল থেকে দু'শরও বেশি গুহা অনুসন্ধান করে দেখা হয়। সবই খিরবেত কুমরান এলাকার কাছে। পাওয়া গেল সুদুর অতীতে মনুষ্য বাসের সাক্ষ্য। পাওয়া গেল মুদ্রা, বাসন, অলঙ্কাব, আরও কত কি! অনেক তথ্য পাওয়া গেছে ওই স্ক্রলগুলি থেকে।

যাকগে এসব কথা। আম্মানে নামলাম সকাল বেলা। ওরা আমাদেরকে ওদেরই হোটেল 'আলিয়া'তে পাঠালেন। পাশপোর্টগুলি রেখে দিলেন কিন্তু। আমরা হোটেলে স্নান করলাম, ব্রেকফাস্ট করলাম, বিশ্রাম করলাম। চারদিক ধুসর শ্রীহীন একেবারে। এই জর্ডন! গ্রিক, রোমান, মিশরীয় ও আরব সভ্যতার লীলাক্ষেত্র এই জর্ডন। আজ তার কি দশা!

অন্যের কি দশা চিন্তা করি কেন? আমার দেশের কি দশা? অন্তত দশহাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতাতো আমার দেশের। এখন আমেরিকা আমাদেরকে সভ্যতা শিখায়! বিদেশী রাজনীতির সাগরেদরা আমাদের দেশকে বিক্রি করে দিতে চায়!

এগারোটা নাগাদ হোটেল ছেড়ে বিমান বন্দরে। আবার উড়ান, আবার অবতরণ। এখন লন্ডন। স্থানীয় সময় বোধ হয় আড়াইটা। ইমিগ্রেশানের ফ্যাচাং শেষ করে যখন বাইরে এলাম তখনই দেখতে পেলাম ছেলে ও বউমা— প্রসূন মুদিতা— দাঁড়িয়ে আছে। কুশল বিনিময়। ছেলেকে জিজ্ঞেস করি, 'কিসে যাব? ট্রেনে না ট্যাক্সিতে?' ছেলে ঘন হয়ে দাঁড়ায়। বলে, তোমাকে বলা হয়নি। ইচ্ছে করে বলিনি। একটা গাড়ি কিনেছি মাস দুই হল। আসলে তোমরা আসছ। বেড়াতে হবে না? ট্যাক্সি করে কত ঘুরবে বল? তাই কিনেই ফেললাম। ভাল হয়েছে না? বলি, ভাল আর বলতে! আমিও তো ভাবছিলাম। এবার ছেলের গাড়ি নেই। আমেরিকার মতো ইংল্যান্ড-এ তেমন বেড়ানো যাবে না। যাক গে। সেই চিন্তা গেল। চল যাই তোমার গাড়ির কাছে।' পাঁচ তলা পার্কিং বিল্ডিং-এর তিন তলায় গাড়ি। প্রসূন গাড়ি নিয়ে আসতে আসতেই মোবাইলে কথা বলছে। আমেরিকা থেকে নাবার্ট ফোন করেছেন। জানতে চাইছেন তার বাবা মা এসে পৌঁছলেন কিনা। প্রসূন বলছে, 'হ্যাঁ, আমি হিথরো থেকেই কথা বলছি। ওঁরা এসে পৌঁছেছেন। এক্ষুনি গাড়িতে উঠবেন। এখন গাড়ি চালাবো তো! এখন আর কথা বলি না। বাড়ি গিয়ে কথা বলবো।' গাড়িতে উঠে বসলাম। গাড়ি চললো।

এবার ইউরোপও গরম। দু'শো বছরের মধ্যে এমন গরম পড়েনি কোনোদিন। গাড়ির জানালা খুলে বসেছি। হু হু করছে বাতাস। ছেলে কথা বলছে, বউমা কথা বলছে। কত কথা বলছি আমরা দু'জনেও। এমন আনন্দ জীবনে ক'দিন আসে? দু'চোখ ভরে ইংল্যান্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখছি। কাচ-মসৃণ রাস্তা, নিঃশব্দ গাড়ির চলা। ভাবি যদি আমার দেশে এমন হত! নির্বোধ প্রত্যাশা। কোনোদিন হবে না। রাজনীতির দাদারা হতে দেবেন না। তাঁরা মনে করেন দেশে অভাব-অনটন না থাকলে তাদের অসুবিধা হয়ে যাবে। অভদ্রতা, অভব্যতা, অশ্রদ্ধা বুঝি রাজনীতির জন্য প্রয়োজনীয়। অশিক্ষা, কর্মহীনতা, না থাকলে কে এসে নেতার বক্তৃতার সময় মাঠ ভর্তি করবে? হায় ভগবান! কে বোঝাবে ওই মান্যবর নেতৃবৃন্দকে যে এই ধারণাগুলি ঠিক নয়! রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন দেশের উন্নতি করতে দিচ্ছে না। কিন্তু এরা পারবে না। স্বাধীনতা! ভারত কত উন্নতি করেছে করছে করবে। জয়হিন্দ। ভাবতে-ভাবতে, দেখতে দেখতে, কথা বলতে বলতে, কখনো বা ঝিমোতে ঝিমোতে এসে পৌঁছলাম ছেলের বাড়ি! ইপ্সউয়িচ, সাফোক, ইউনাইটেড কিংডাম।

ফ্রান্স

আতিপাতি করে খুঁজছেন তিনি কাকে? কৌতূহল হয় আমার। নিরাপদ দূরত্ব রেখে, ওঁর যাতে গোয়েন্দাগিরি করছি বলে আমার উপর সন্দেহ না হয় তেমনভাবে এদিক সেদিক অনর্থক তাকাতে তাকাতে আমি পেছন ধরি। Sea France গায়ে লেখা জাহাজটি কম বড় নাকি? গোটা পঞ্চাশ বাস, প্রায় সমসংখ্যক ট্রাক, শ'খানেক গাড়ি পেটে ঢুকিয়ে, সমস্ত যানের যাত্রীদেরকে সঙ্গে নিয়ে, আরও কত চ্যানেল পার হবার যাত্রী নিয়ে ডোভার থেকে ক্যালে, অর্থাৎ ইংল্যান্ড থেকে ফ্রান্সে যাচ্ছে এই জাহাজটি। এটি একটি ফেরি জাহাজ। রোজ কয়বারই কত ফেরি জাহাজ এপার ওপার করে, কত বিভিন্ন দেশের মানুষ নিয়ে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়। আজ আমরাও যাচ্ছি। হঠাৎ এক মহিলাকে ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে যেতে দেখলে কৌতূহল জাগে না? কৌতূহল আর পরচর্চার সুযোগ না থাকলে জীবন বিস্বাদ হয়ে যেত না? ওগুলো আছে বলেই না জীবনে বৈচিত্র্য আছে, বাঁচাতে সুখ আছে। পিছু নিয়ে চলতে চলতে একেবারে সেই চারতলার ছাতে। প্রচণ্ড বাতাস। সাগরের বুকে তো এমনিতেই বাতাস থাকে। তায় আবার চলন্ত জাহাজের চার তলার ছাতে। এত বাতাস যে ছাতে দাঁড়িয়ে থাকাই কষ্ট, হাঁটা তো আরও কষ্টের। ছাতে, এখানে সেখানে টকটকে লাল গণ্ডা গণ্ডা চেয়ার পাতা। চারটে করে চেয়ার এক সঙ্গে জোড়া; তাও আবার সেগুলি ছাতের সঙ্গে স্ক্রু দিয়ে সাঁটা। একেবারে পোক্ত ব্যবস্থা। বজরংবলীজির পিতৃদেব যতই চেষ্টা করুন না কেন এই চেয়ার তুলে উড়িয়ে সাগরে ফেলে দেওয়ার সাধ্য তাঁর নেই। তবে তাঁরও চেষ্টার অন্ত নেই। তিনি সজোরে বইছেন, শোঁ শোঁ শব্দে গর্জন করছেন, ফুঁসছেন যেন ক্রোধে বা হাসছেন বুঝি অকারণ মিত্র-সুলভ আনন্দে। আমি ওই মহিলার অনুসরণ করে হোমসিয়ানা (Holmseana) করছি। হাঁটতে হাঁটতে বেসামাল হয়ে পড়ছি। চেয়ারে, রেলিং-এ, পাইপে ধরে সামাল দিচ্ছি বার বার। কিন্তু অকারণ কৌতূহলে অচেনা বিগতযৌবনা উদ্বিগ্না মহিলার পশ্চাতে যাচ্ছি। বাঁদিকে, পেছনে ও সামনে দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র; ডান দিকে জাহাজের চারতলায় দাঁড়ানো ঘরের দেয়াল। মাঝে মাঝে সাদা জোড়া জোড়া মানব মানবী ঘন হয়ে লাল চেয়ারে বসা। হঠাৎ সেই নাম-না-জানা মহিলা দাঁড়িয়ে পড়লেন। আমিও দাঁড়ালাম। মুখ অন্যদিকে করলাম। দূরে অপসৃয়মাণ ইংল্যান্ডের উপকূলকে অতি যত্ন সহকারে দেখতে লাগলাম। সামনের একটা জোড়া থেকে একজন উঠে পড়েছে ও অন্য দিকে চলে যাচ্ছে। একজন বসে আছে। মহিলাটি এগিয়ে তার কাছে গেলেন, বসলেন পাশে, বললেন যেন কিছু। তারপব তাকে নিয়ে ফিরে আসলেন। ওটি মেয়ে, মহিলার মেয়ে। জাহাজে হঠাৎ পাওয়া সমবয়সী পুরুষটির সাথে এখানে এসে ঘন হয়ে বসেছিল। মা বোধ হয় হঠাৎই আবিষ্কার করেন যে মেয়ে কাছে নেই। সুতরাং....। চিরন্তন ব্যাপার। সবাই এ ব্যাপারে পড়ে। আমি একাগ্র মনে ওই ডোভার দেখছি। ক্ষুব্ধ কন্যা ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা মাতা আমার পাশ দিয়েই ফিরলেন। চোখাচোখি হল না। ওরা বুঝতে পারলেন না আমি ওখানে কেন। জানলেন না যে আমি অকারণে ওদের পিছু নিয়েছি। দু'মিনিট পরে আমি ফিরলাম। পবনদেবকে ছাত ছেড়ে দিয়ে, একটা হাতল টেনে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়লাম। একটা অ্যাডভেঞ্চার করা হল।

সগৃহিণী বিদেশে এসেছি। দু'হাজার দুই সালে প্রথম বিদেশ পাড়ি দিয়েছিলাম। এবার দু-হাজার তিনে দ্বিতীয় বার। সেবার আমেরিকা গিয়েছিলাম। তবে আমেরিকা থেকে ফেরার পথে স্বল্প সময়ের জন্য লন্ডন বাস করে গিয়েছিলাম। আমার আবাল্য স্বপ্ন ছিল উইলিয়াম শেক্সপীয়রের জন্মস্থান নামক তীর্থস্থানটি একবার দেখার। দেখেছিলাম। সে-সব কথা আমার 'উলট পুরাণের দেশ—আমেরিকার কথা'য় লিখেছি। অনেকে তা পড়ে থাকবেন। প্রভাসচন্দ্রের সেই লন্ডন, স্ট্রাটফোর্ড আপন আভন, কটস্‌ওয়ল্ড গ্রাম ও বিশ্ববিদ্যালয় শহর অক্সফোর্ড দেখার বিবরণ অনেকের ভাল লেগেছে। অনেকে তাঁদের ভাললাগা আমাকে সাক্ষাতে বলেছেন অথবা দূর থেকে লিখে জানিয়েছেন। তখন পুরীতে জগন্নাথ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্বার্ক দর্শনের সেমিনারে জুটেছিলাম। বইটি দিয়েছিলাম গুরুপ্রতীম আচার্য ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী মশায়কে। পরদিন স্মিতমুখে তর্জনী তুলে তর্জন করে তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'আপনার ফাইন হবে।' আমি বিনীতভাবে জানতে চাইলাম আমার গোস্তাকিটি কি। কেন ফাইন। শুনলাম যে গোস্তাকি আমার বই—আমেরিকার কথা। রাত এগারোটায় বইটি হাতে নিয়ে শুয়েছিলেন তিনি। ঘুম আনার সাহায্যকারী হবে বইটি। কিন্তু বইটি হয়ে গেল ঘুম তাড়ানোর ঔষধ। শেষ রাত চারটেয় বই শেষ হলে তবে তিনি সেটি বন্ধ করতে পারেন। তাঁর নিদ্রা হয়নি। তাই আমার শাস্তির ব্যবস্থা। আগরতলার শ্রদ্ধেয় মহারাজ কুমার সহদেব বিক্রম কিশোর দেববর্মন মহাশয় আমার বাড়িতে এসে ধন্যবাদ দিয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন যে আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের এইসব জায়গাগুলি আবার যেন দেখে এলেন। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ত্রিপুরার বড় মহারাজ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজি, মালদহ আশ্রমের স্বামী দিব্যানন্দজি এবং আলঙ (অরুণাচল)-এর স্বামী সুমেধানন্দজি মহারাজগণ বলেছেন বইটি তাদেরও ভাল লেগেছে। প্রশংসা শুনতে সকলেরই ভাল লাগে। আমারও লেগেছে। সুতরাং দ্বিতীয়বার বিদেশে গিয়েও লিখতে বসে গেছি ভ্রমণানন্দের বিবরণ। অংশভাগী করতে চাই আত্মজনকে এই মহান আনন্দের।

মানুষ কবে লিখতে শিখেছিল তার কোন হদিশ পাওয়া যায় না। কিন্তু লেখা আবিষ্কারের ফলে মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার জমতে আরম্ভ করে। লেখা সাহিত্যে পরিণত হয়। আমাদের সবচাইতে প্রিয় লেখা হল 'চিঠি'। প্রাণের কথা, প্রেমের কথা, ভাললাগার কথা ভালবাসার কথা বয়ে আনে ওই চিঠি। শুধু চিঠিতে উপন্যাস লেখা হয়েছে, কাব্য হয়েছে। আমার ছেলেটি বড় সুন্দর চিঠি লিখত। কিন্তু টেলিফোন এসে চিঠির যুগের অন্ত করে দিল। চিঠি আর লেখে না লোকে বেশি। ফোন করে, কথা বলে। আমার বড় কষ্ট হয়। একটা শিল্প নষ্ট হয়ে গেল। ভেবে চিন্তে একটা একটা শব্দ চয়ন করে লেখা চিঠির সাথে ফোনের তুলনা হয়? অবশ্য আজকাল অনেকেই আমাদের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীজির মতো সময় নিয়ে, ভেবে চিন্তে চয়ন করে শব্দ ব্যবহার করেন। তবু তা কি আর চিঠির তুল্য হয়? তবে ফোনেরও ভাল দিক আছে। তৎক্ষণাৎ যোগাযোগ হয়। স্বর শোনা যায়।

প্রসূন মুদিতা তো তাগাদা দিতে লাগল আবার বিদেশ যেতে। আমারও মনে হয় যাওয়া উচিত। ওদের কাছে গেলে বেলার স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। সে অবশ্য ছেলেকে বলে একবার দেশে আসতে। বলে, 'তোমরা একবার আগরতলা আস না? আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের বন্ধু-বান্ধব সকলে তোমাদের কথা জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কবে আসবে জানতে চান, বলেন কতদিন তোমাদেরকে দেখেন না। ওঁরাও তো দেখবার আশা করেন। আস না, কটা দিন

থেকে যাও না।' ছেলে বলে, "আমাদের প্রধান অসুবিধা ছুটি পাওয়া। আমাদের ছুটি বড় কম, মা। তা ছাড়া আমরা আগরতলা এলেও প্রধান কথা তোমাদের সঙ্গে থাকা। কিন্তু তোমরা এলেও তো এক সঙ্গে থাকা হবে। বড় কথা এখানে তোমরা ছেলের বাড়িতে থাকবে। আরও বড় কথা কত নতুন জায়গা দেখবে, বেড়াবে, আনন্দ পাবে। এসব তো আর আমরা আগরতলা গেলে হবে না। আমরা একসঙ্গে ঘুরবো, বেড়াবো। এসে পড়ো।" সুতরাং রাজি হয়ে গেলাম। আগরতলায় আশ্রমে আশ্রমে যাঁদের সঙ্গে বসি, গীতা, মহাভারত, ভাগবত, পড়ি বা আলোচনা করি তাদের থেকে, ত্রিপুরা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিষদ থেকে, বড় মহারাজ পূর্ণাত্মানন্দজির কাছ থেকে, ভাই সঙ্কেতের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে উঠে পড়লাম বিদেশের বিমানে। সবাইকে বললাম লন্ডন যাচ্ছি। ছেলে বউমার সঙ্গে ক'দিন থেকে আসি'। সবাই জানতে চান কত দিনের প্রবাস। বলি, 'দু'মাস আড়াই মাস। বিদেশে দীর্ঘ দিন থাকতে ভাল লাগে না।'

প্রথম যখন কিশোরগঞ্জের ন্যামতপুর থেকে কলকাতা গিয়েছিলাম তখন আমার বয়স ছিল অল্প, বুদ্ধি ও বিদ্যা ছিল কম। সেইবার আমার কি অবস্থা হয়েছিল তা 'আমেরিকার কথা'য় বলেছি। অনেকে দেখে থাকবেন। সেই সময়ে তেরোনিশ বয়সী আমার প্রতিবেশী সুকুমারী নামে একটি মেয়ে ছিল। সুকুমারীর বাবাকে আমরা সুবোধদা ডাকতাম। তিনি তখন আমার হাতে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। বলেছিলেন যে তাঁর পিসতুতো ভাইয়ের ছেলে পীযুষও কলকাতায়ই থাকে। আমি যখন ওই কলকাতাতেই যাচ্ছি তখন ওই চিঠিটি নিয়ে পীযুষের সঙ্গে দেখা করে চিঠিটি তাঁর হাতে দিয়ে তাঁকে সুবোধদাদের কুশল মঙ্গল জানালে বড় ভাল হয়। নিয়েছিলাম। এবারেও আমরা লন্ডন যাচ্ছি একথা মহন্ত মহারাজ বৃন্দাবনবিহারী দাস কাঠিয়াবাবাজির কাছে শুনে আমাদের অপরিচিত এক ভদ্রলোক একটি অনুরোধ পাঠান বাবাজি মহারাজের মাধ্যমে। তাঁব ছেলে লন্ডনে থাকে। ওই ছেলের জন্য কিছু টাকা নিয়ে গিয়ে তাকে দিলে বড় উপকার হয়। শিলচর থেকে আমাদেব দিদিমণি কৃষ্ণা বলেন তাঁর দাদা ক্লিভল্যান্ডে থাকেন। তিনি ডাক্তাব। দেখা করতে পারলে ভাল লাগবে। কিশোর বয়সে প্রতিবেশী সুকুমারীর বাবা আমার সুবোধদা নিজে বলেছিলেন চিঠি এনে পীযুষবাবুকে পৌঁছে দিতে। বৃদ্ধ বয়সে বাবাজি মহারাজেব মাধ্যমে নাম-না-জানা এক পিতার অনুরোধ এসেছে লন্ডনই যখন যাচ্ছি তখন ক'টা টাকা নিয়ে তাঁর পুত্রকে দিতে। ফোনের মাধ্যমে শিলচর থেকে বার্তা আসে ক্লিভল্যান্ডে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। এখন আমি বৃদ্ধ। বিদ্যার সার্টিফিকেট কুড়িয়েছি কয়েক গন্ডা। বুদ্ধি বাড়েনি মোটে। বরং বয়স ও সার্টিফিকেটের ভারে সেটা কমে গেছে। সোমা মা একবার বলেছিল, 'দেখ মেসো, কাণ্ড। চেনো না, নাম পর্যন্ত শোন নি, সেই মানুষটির টাকা নিয়ে অচেনা তার ছেলেকে দেবে! কিন্তু সমবয়সী পড়শী সুকুমারীর বাবার ওই অনুরোধ যেমন না রেখে পারিনি, সুবোধনারায়ণ পণ্ডিতের হাতচিঠিখানা এনেছিলাম তাঁর ভাইপো পীযুষবাবুর হাতে পৌঁছে দিতে, তেমনি বাবাজি মহারাজের আদেশ মান্য না করার প্রশ্নই ওঠে না। নাম-না-জানা ভদ্রলোকের অচেনা পুত্রের জন্য টাকা নিয়ে এসেছিলাম। এনে দিলেন সমীরকান্তি ঘোষ। যাঁরা আমার 'আমেরিকার কথা' পড়েছেন তাঁরা জানেন যে কিশোব বয়সে আমার গন্তব্যস্থল ছিল কোন্নগর, ঠিক কলকাতা নয়। মামাকে যখন পীযুষ বাবুর চিঠিটি দেখালাম, তিনি দেখলেন এবং আমিও দেখলাম যে পীযুষবাবু থাকেন চিত্তরঞ্জন। সেই ১৯৫৫ সালে কয়লাচালিত ট্রেনে কলকাতা থেকে দূরত্ব প্রায় সারা

দিনের। সুতরাং সুবোধনারায়ণ পণ্ডিতের সেই অনুরোধ রক্ষা করে চিঠিটি পীযূষের হাতে দিয়ে তাকে সুবোধদাদের কুশল মঙ্গল জানানো সম্ভব হয়নি। মাতুলের পরামর্শ মতো দু-আনা দিয়ে ডাকঘর থেকে একটি এনভেলাপ কিনে তাতে চিঠিটি পুরে উপরে ঠিকানা লিখে লেটার বক্সে ফেলে দিয়েছিলাম। আর দেখা হয়নি সপ্তদশী সুকুমারীর সঙ্গে। দেখা হলে সে ডাগর চোখের পাতা ভিজিয়ে অধরোষ্ঠ ফুলিয়ে নির্বাক গঞ্জনায় জানাতো, 'তুমি একবার নিজে যেতে পারলে না?' ঊনপঞ্চাশ বছর আগের কথা। সু তো আর কুমারী নেই। পিতামহীর মহিমায় পৌত্রী দৌহিত্রীদের আদর খাচ্ছে। ডাগর চোখ চশমার আবডালে চলে গেছে। এসব কথা তার মনে থাকার কথা নয়। দু-হাজার তিন সালের জুলাই মাসের ষোল তারিখে লন্ডনের হিথরো বিমান বন্দরে নেমে দেখি ছেলে বউমা দাঁড়িয়ে আছে। আমরা যাবো ইপ্সউইচ।

২০০২ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডি. সি.র ডালেস বিমানবন্দরে নেমে ছেলে বউমার সঙ্গে তাদের গাড়িতে চড়ে যখন এনানডেলে তাদের বাড়িতে যাই তখন জীবনে প্রথম—বাষট্টি বছর বয়সে নিজের গাড়িতে চড়ার আনন্দ হয়েছিল। এখন অবশ্য প্রায়ই কৃষ্ণায়ণবাসী নাগেশ মেহতা আমাকে গাড়ি কিনতে বলেন। আমি বলি, গাড়ি কিনে কোথায় রাখব? গাড়ি চড়ার জন্য আর ক'দিন বাঁচব? গাড়ি করে কোথায় যাব? কেবল আসল কথাটা বলি না, গাড়ি কেনার টাকা কোথায় পাব? এবার ইংল্যান্ডে ছেলের গাড়ি নেই। গত বছরের মতো এবার আর গাড়ি করে এন্তার বেড়ানো হবে না। এমন কি এই হিথরো বিমান বন্দর থেকেও ট্রেনে বাসে বা ট্যাক্সিতে যেতে হবে। ছেলের বাড়ি ইপ্সউইচে! মন প্রায় খারাপ হয়ে যায় আর কি? হিথরোতেই আমাদের বাক্স-প্যাটরা নিয়ে ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে ছেলে বলে যে প্রায় দু'মাস হলো সে গাড়ি কিনেছে। আমাদেরকে সারপ্রাইজ দেবে বলে এই কথা আগে বলেনি। সারপ্রাইজড হয়ে খুব ভাল লাগল আমাদের। ছেলের অভ্যেস, বাবা মাকে বিভিন্ন স্থান দেখাবার তার যা উৎসাহ, তাতে এবারও গাড়ি চড়া হবে অনেক সন্দেহ নেই। কাছে যাই গাড়িটির NISSAN, PRIMERA. নম্বর J460 JDX.

পরদিনই প্রসূনকে নাম-না-জানা কলকাতাবাসী স্নেহময় পিতার কথা বলি। যে পুত্রকে টাকা দিতে হবে তার নাম ঠিকানা ব্যাংক একাউন্ট নম্বর, টাকা যা দিয়েছেন, ইত্যাদি সব বলি। ছেলে বলে যে তিনি ইপ্সউইচ থেকে শ'খানেক মাইল দূরে থাকেন। আমি ১৯৫৫ সালে সুকুমারীর বাবার ভাইপো পীযূষের চিঠি নিয়ে চিত্তরঞ্জন যেতে পারিনি। ডাক মারফত চিঠিখানা পাঠিয়েছিলাম। কত দিনে পেয়েছিলেন কে জানে। পঞ্চাশ বছরে বিজ্ঞানের দৌলতে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছে। অপরিচিত সেই পার্থসারথি ভৌমিকের টাকা ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে মুহূর্তে তার ব্যাংক একাউন্টে জমা হয়ে গেল। সোমাকে চিঠি লিখলাম বাবাকে বলতে। ক্লিভল্যান্ডও অনেক দূরে প্রায় সারা দিনের ড্রাইভ। এত দূরে গিয়ে সাক্ষাতে কথা বলতে পারিনি। ডা. কে. ডি. ভট্টাচার্যের সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে ক'দিনই। বলব ভগিনী কৃষ্ণাকে। খুশি হবেন তিনি।

ছেলে ও বউমার উপর্যুপরি তাগাদায় অবশেষে মে (২০০৪) মাসের প্রথম সপ্তাহ নাগাদ রাজি হয়ে গেলাম ইংল্যান্ড যাওয়ার জন্য। বারোটি মাসের মধ্যে দ্বিতীয় বার বিদেশ যাওয়া। গল্প মনে হবে। কিন্তু গল্প হলেও সত্যি। ছেলে খুশি হল। বললো, কেবল ইউ. কে.র নয়, তোমরা ফ্রান্স যাওয়ার জন্য শেনিয়ান (Shengen) এবং সুইজারল্যান্ড যাওয়ার জন্য সুইস

ভিসাও নিয়ে এসো। সেইসব ভিসা পাওয়ার সুবিধা হবে বলে সে কিছু কাগজপত্রও পাঠাল। তাতে দেখা গেল যে আমরা দু'জন ছাব্বিশ থেকে উনত্রিশে জুলাই স্টার ট্যুআর্জ নামক এক ভ্রমণ সংস্থার তত্ত্বাবধানে ফ্রান্স, বিশেষ করে প্যারিস ভ্রমণ করব বলে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে ওদের টিকিট কেটেছে। আজ ছাব্বিশে জুলাই, ২০০৩ তারিখে লন্ডন শহরের ২৭৫ নং বার্কিং রোড থেকে 'স্টার ট্যুআর্জ' এর বাসে উঠেছি সকাল সাতটায়। তুলে দিয়ে গেছে প্রসূন মুদিতা। বিশাল বাসটির গায়ে নাম লেখা Thomas of Rhonda. সেখান থেকে বাসের চালক গ্যারড ও দিগদর্শক গেইল এর তত্ত্বাবধানে বাসে চড়ে ইংল্যান্ডের বন্দর ডোভার পর্যন্ত এসে বাসে বসেই Sea France নামক জাহাজটির পেটে ঢুকে গেলাম। তার পর বাস থেকে নেমে জাহাজে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। আমাদের বাসে দুই অভিভাবক—স্বামী গ্যারড ও তাঁর স্ত্রী গেইল। দুজনেই পালা করে বাস চালায়, দুজনেই মাইক হাতে নিয়ে বক্তৃতা দেয়, আমাদের সুখ-সুবিধা দেখে। ফ্রান্সে যাচ্ছি বাসভর্তি ষাট জন যাত্রী। এদের প্রায় সকলেই বাদামি। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, মরিশাস, মাদাগাস্কার, কেনিয়া, ফিজি, এসব দেশের লোক। যে মহিলাটি হঠাৎ উদ্বিগ্ন হয়ে এদিক সেদিক দেখে ছাতে গিয়ে তার দুহিতাকে আবিষ্কার করলেন, যার পেছন পেছন কৌতূহল আমাকে এতখানি পথ দৌড় করাল, তিনিও ভারতীয়। তবে গত পঁচিশ বছর যাবৎ লন্ডন শহরের ওয়েম্বলিতে বাস করছেন। সাত বছর আগে একবার ভারতের উজ্জয়িনীতে মাকে দেখতে গিয়েছিলেন। তিনি ফরাসি ভাষা জানেন, লন্ডনে থাকেন, তবু ফরাসি দেশে কখনো যাওয়া হয়ে উঠেনি, মহিলার নাম ধরুন রীণা ; রীণা কেলকার. বয়স চল্লিশের এপার বা ওপার। বয়স কসমেটিক্সের দৌরাত্ম্যে তাঁকে ধরতে পারছে না। ওৎ পেতে বসে ছিদ্র অন্বেষণ করছে। তাঁর যে কন্যাটিরে খুঁজে পেতে ধরে নিয়ে এলেন তার বয়স মায়ের বয়সের অর্ধেক হবে। কন্যার নাম প্রিয়া। সার্থকনামা। 'তন্বী শ্যামা শিখরীদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী, মধ্যে ক্ষাম' চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভি'।

ডোভার। নাম দেখেই নয়ন সেই বন্দর দেখতে থাকলেও মন অন্তর্মুখিন হয়ে পড়ে। কত দিন পড়েছি, কলেজ ছাত্রছাত্রীদেরকে পড়িয়েছি ম্যাথু আর্নল্ডের কবিতা 'ডোভার বীচ'। অবিস্মরণীয় সেই কবিতার শেষ ক'টি ছত্র—

'Ah, love, let us be true
To one another' for the world, which seems
To lie before us like a land of dreams,
So various, so beautiful, so new,
Hath really neither joy, nor love, nor light,
Nor certitude, nor peace, nor help for pain;
And we are here as on a darkling plain
Swept with confused alarms of struggle and fight
where ignorant armies clash by night

সুন্দর। অতি সুন্দর। এখন দিন। সকাল ন'টা। সামনে বন্দর। কত ঘরবাড়ি, লোকলস্কর, ব্যস্ততা। আমার মন কবিতায়। সেখানে এখন জ্যোৎস্না রাত ; সামনে বিস্তৃত, কর্দমাক্ত ডোভার সৈকত। কবি কি বলছেন আমি যেন শুনছি। সারাটা জীবন এইভাবে সামনের জিনিস না

দেখে মনের অলীক ছবি দেখে দেখেই কাটিয়ে দিলাম। সকলের কাছেই অপদার্থ হয়ে রইলাম, যাকগে, শেষ তো করে এনেছি ইনিংস। এবার চলে যাব ডাক এলেই। আমার জন্য কেউ কাঁদুক আর না-কাঁদুক, আমি হাসতে হাসতে চলে যেতে পারব। সংসারে নিজের জন্য যাঁরা কিছু করতে পারেন, তাঁরা করিৎকর্মা বলে খ্যাত হন। রবার্ট ব্রাউনিং-এর কবিতার কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলি সব আমার মতো অপদার্থ। তাঁরা যাই করেন, লোকে উল্টো বোঝে। পুরস্কারের বদলে তিরস্কার জোটে ভাগ্যে। সুতরাং, তাঁরা একটা বিশল্যকরণী খুঁজে পেয়েছেন। সেটি দিয়ে অন্তরের ক্ষোভ প্রশমিত করেন—

সব কাজের পুরস্কাব এই সংসারেই যদি জোটে,
ফিরে গিয়ে চাওয়ার তবে রইবে না আর কিছু মোটে।
আমি হাসতে হাসতে দাঁড়াব বিশ্বপিতার চরণতলে,
'আমি কিছু পাইনি গো, এবার আমায় তুমি দাও' বলে।

এখানে আগরতলার ট্রাফিক পুলিশের মতো ফ্লুবোসেন্ট পোশাক পবে এক মহিলা অফিসার বাসে উঠে এসে আমাদের পাসপোর্ট ও ভিসা দেখে গিয়েছিলেন। এখানেও দুই জাত। যাঁদের পাশপোর্ট ব্রিটিশ বা ইউবোপীয়ান ইউনিযনেব কোনো দেশেব অথবা আমেবিকা যুক্তরাষ্ট্র বা কানাডার তাঁবা অভিজাত, তাঁদের ভিসাব প্রয়োজন নেই। পাসপোর্টখানা দেখালেই চলে। বাকিদের পাসপোর্ট এবং তাতে লাগানো ভিসা দেখাতে হয— শেনিযান ভিসা। তবে দেখল মাত্র। আর কিছু না। গ্যারড-গেইলের কথামত সকলে পাসপোর্ট হাতে নিয়েই বসে ছিলাম। মহিলা অফিসারটি এসে দেখলেন মাত্র। যাত্রী প্রতি খরচ কবলেন পঁযতাল্লিশ সেকেন্ড। কিন্তু দেশের কাছে আমাদেব র‍্যাপার-স্যাপার আলাদা। সেখানে ওবা চায় না লোকে ভাবত থেকে তাদের দেশে যাক বা তাদেব দেশ থেকে ভারতে আসুক। বাংলা দেশ থেকে ভারতে আসতে হলে বা ভারত থেকে বাংলাদেশে যেতে হলে পাঁচশো টাকা কবে কর দিতে হয— ভ্রমণ কর। বাংলা দেশে গিয়েছিলাম সেদিন। আগরতলা-ঢাকা বাসে যাত্রীসংখ্যা মোট ছয় জন। আমাদের গার্জিয়ান ছিলেন শ্রীমান ডাক্তার সুজিত বায়। খুব কাজেব ছেলে আমাদেব সুজিত। আখাউরা আগরতলা চেকপোস্টের দু'পারেই তাব জানাশোনা অফিসার আছেন। তবু সব খাতাপত্র লিখতে এবং আমাদের বাসকে দুই চেকপোস্ট পার হতে সময় লাগিয়ে দিলেন দেড় ঘণ্টা। যাত্রী ছয়জন। যাত্রী প্রতি সময় খরচ পনেবো মিনিট। যদি বাস ভর্তি থাকত? আমাদের কপাল, তবে সর্বত্রই যে এমন তিক্ত অভিজ্ঞতা হয় তাও নয়। ভিসার জন্য গিয়েছিলাম বাংলাদেশের ভিসা অফিসে। সেখানকার অফিসাব আমাদেব পাসপোর্ট দেখলেন, আমরা যে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড গিয়ে বেড়িয়ে এসেছি তা দেখলেন এবং দু'মিনিটেই বলে দিলেন, 'হযে যাবে।' অবশ্য আমি যে সারা জীবন কলেজে শিক্ষকতা করেছি তাও নিশ্চয় কিছুটা প্রভাবিত করেছে অফিসারকে। তখন অফিসারটির লাঞ্চের সময়। তবু তিনি দশ মিনিট ধরে শিষ্টালাপ করলেন, এমনকি আমাদেরকে চা খাওয়াতে পারলেন না বলে আপশোষ করলেন। বিকেলে ভিসা পেয়ে গিয়েছিলাম। নিজেরও যেতে হয়নি। বড় পুত্র ডাক্তার মণিলাল ধর গিয়ে এনেছিলেন। একটা কথা বলা হয়নি। বাংলাদেশ যেতে হলে ডলার কিনে সাথে নিতে হয় যাত্রীর ভরণপোষণের গ্যারান্টি।

Sea France লেখা জাহাজটি এবং আরও অনেক জাহাজের গায়ে বিশাল অক্ষবে P&O

লেখা দেখা যায়। মনে পড়ে ছোটোবেলায় এই লেখা পত্রিকায় জাহাজের বিজ্ঞাপনে দেখতে পেতাম। বেলাকে নিয়ে দুজনে জাহাজ পরিক্রমা শুরু করলাম। বিশাল ব্যাপার। তলায় তলায় খাবারের, উপহার সামগ্রীর, সুদৃশ্য বোতলবন্দি মহার্ঘ পানীয়ের, গহনার, খেলনার ও পাদুকার পণ্যসম্ভার সাজানো। বড় বড় করে সর্বত্র লেখা, 'এখানে ট্যাক্স লাগে না'। দুজনে দু কাপ কফি খেলাম ২.১০ পাউন্ড বা ১৬৮ টাকা দিয়ে। পরে আবার ঘুরে ঘুরে দেখা। প্রিয়ার হারিয়ে যাওয়া, ছাতে গিয়ে হরিজিতের সঙ্গে বসে সমুদ্র দেখা, হঠাৎ পেছন থেকে প্রিয়ার মা আসছেন বুঝতে পেরে হরিজিতের পলায়ন প্রিয়ার মায়ের কন্যার পাশে বসে তাকে ভর্ৎসনা ও তাকে নিয়ে আসা, সবই এই ঘুরে ঘুরে দেখার মধ্যে হয়ে গেল। আরও একটা কাজ হয়ে গেল। জাহাজের কাফেটেরিয়ায় বসে চুরাশি টাকা কাপের কফি খেতে খেতে পরিচয় করে নিলাম প্রায় সমবয়সী তামিলনাড়ুর সালেম নিবাসী থিরু ওয়াই. আর. পৃথ্বীরাজ এবং তাঁর পত্নী যমুনা দেবীর সঙ্গেও। এঁরাও আমাদের মতোই এসেছেন। ব্যবসায়ী পৃথ্বীরাজও এসেছেন স্ত্রীকে নিয়ে ইংল্যান্ডে ছেলে বউমার সঙ্গে ক'দিন থাকতে। ছেলে নারায়ণ থাকে অল্ডারশটে। এরা এসেছেন মে মাসে, চলে যাবেন অগাস্টে। চারদি· চারজনে একসাথে দেখলাম প্যারিস।

আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে অবস্থিত ফ্রান্স দেশটি ইউরোপ মহাদেশের পশ্চিমাংশে অবস্থিত। ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। সাহিত্যে, চিত্রকলায়, দর্শনে, বিজ্ঞানে, রাজনীতিতে এবং আরও বহুক্ষেত্রে ফ্রান্স জগতের দিশারি। ফরাসি সাহিত্য ইউরোপে সকল সাহিত্যের অগ্রণী ছিল। পরে চসার, শেক্সপীয়র ও মিল্টনের অবদানের ফলে ইংরেজি সাহিত্য এগিয়ে যায়। চিত্রকলায় এই দেশ সর্বদাই এগিয়ে আছে। দর্শনে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স সারা পৃথিবীতে আধুনিক চিন্তাধারার সূচনা শোনায়। বিজ্ঞানেও ফ্রান্স অগ্রণী ভূমিকা নিতে থাকে। রাজনীতিতে পৃথিবীর ইতিহাসে ফ্রান্সের ভূমিকা মহত্বপূর্ণ। 'সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা'র স্লোগানটি ফ্রান্সই সকল মানুষকে দিয়েছে। ফরাসি বিপ্লব ও প্যারিস কমিউন সকল বামপন্থী আন্দোলনের প্রেরণার উৎস হল। ইংরেজ জাতিকে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন এডমান্ড বার্ক প্রমুখ অনেক কৃতবিদ্য রাষ্ট্রনীতিবিদ। বার্ক-এর 'Speech on Conciliation with America' একটি যুগান্তকারী ভাষণ। কিন্তু ইংরেজগণ তা শোনেনি। আমেরিকার স্বাধীনতার সেই যুদ্ধে ফ্রান্স আমেরিকাকে সাহায্য করেছিল। আমেরিকা সে-কথা স্মরণ রেখেছে। ভারতেও ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতীয়দেরকে সাহায্য করেছে ফ্রান্স। আমাদের দুর্ভাগ্য সেই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। ক্লাইভ দুপ্লের ভূমিকা ভারতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

সেই ফ্রান্স ভ্রমণে এসেছি স্টার টুঅার্সের সঙ্গে আমরা। সময় অল্প, মাত্র পাঁচ দিন। কিন্তু আজকালকার ভ্রমণকারীগণ এরকমই আসেন। ভ্রমণ অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। আমার মতো কলেজ শিক্ষক যে ভারত থেকে ফ্রান্সে আসতে পেরেছি তা কেবল ঈশ্বর ইচ্ছায়। তাঁর ইচ্ছা পুত্রের বদান্যতা রূপ পরিগ্রহ করে এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছে। ফ্রান্সের ভিতর দিয়ে হু হু করে বাস চলছে, এসব কথা ভাবছি আর দু'পাশে চলে যাওয়া কৃষিজমি দেখছি।

প্যারিস

প্যারিস। ফ্রান্স বা ফরাসি দেশের রাজধানী। ফরাসিরা নিজেরা বলেন পারী। ফরাসি ভাষাও ইংরেজির মতো রোমান লিপিতে লেখা হয়। তবে লেখায় অক্ষরের যেন একটু বাহুল্যই থাকে। এই ফরাসিরা শব্দের শেষে ব্যবহৃত এক বা একাধিক ব্যঞ্জন বর্ণ উচ্চারণ করেন না। আমাদের দেশে যে ক'টি ফরাসি শব্দ নিঃশব্দে আমাদের ব্যবহারের ভাষায় ঢুকে গেছে তাতেও এই অন্ত্য ব্যঞ্জন বর্জনের নিয়ম চালু আছে। উদাহরণস্বরূপ রেস্তরাঁ, ডিপো, ডেবু, ইত্যাদি শব্দের কথা স্মরণ করতে পারি। এই নিয়মে Paris-কে আমাদেরও 'পারী' বলারই কথা। কিন্তু ইংরেজদের মতো আমরাও 'পারী'-কে প্যারিসই বলি। আসলে আমাদের বাইরে থেকে আসা সবই তো ইংরেজের মাধ্যমেই পাওয়া। আমার মনে পড়ে তিরিশ বছর আগে বন্ধু অধ্যাপক অগাস্টিন লেসলির সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার কথা। ওয়ালটেয়ারে সেন্ট জোসেফ্‌স্‌ উইমেন্স কলেজে কাজ করতেন লেসলি। সেদিন অধ্যাপকদের ঘরে খোঁজ করাতে জনৈকা ফরাসি অধ্যাপিকা বলেছিলেন, 'ও গদ্‌, ই হ্যাজ্‌ জাস্ত গন্‌ হোম্‌। ইউ ক্যান্ত মিত্‌ ইম্‌ বিফোর তুমরো এত্‌ তেন্‌।' ফরাসি ভাষার ফনোলজিতে ট-বর্গ নেই। সুতরাং, ট, ঠ, ড, ঢ, ধ্বনিগুলি সব ত, থ, দ, ধ, হয়ে যায়। আমরা জানি, কিন্তু বলার সময় মনে থাকে না। তখন ইংরেজের মত বলে ফেলি। অভ্যাস যে! ইংরেজের আবার ত-বর্গ নেই। ফলে তার ত, থ, দ, ধ, ধ্বনিগুলি ট, ঠ, ড, ঢ, হয়ে যায়। এই কারণে বাঙালি নাট্যকার তার নাটকের ইংরেজ চরিত্রের মুখে বাংলা ভাষার উচ্চারণ বদলে দিয়েছেন। সেজন্য শুনতে পাই সাহেব ইংরেজ বলছে, 'টোমরা টাহাডের কঠা শুনিবে না, আমাডের কঠা মট চলিবে।' রোমান লিপি দেশে দেশে বিচিত্র কৌতুকের সৃষ্টি করেছে। ইন্দোনেশিয়ার সরকারি ভাষা 'বাহাষা ইন্দোনেশিয়া' রোমান লিপিতে লেখা হয়। প্রত্যেকটি বর্ণের উচ্চারণ সেখানে নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়। সুতরাং, পড়ুয়ারা যখন ইংরেজি শিক্ষা আরম্ভ করে তখন বিপত্তি দেখা দেয়। তারা Orange-কে ওরাঙ্গে ও Village-কে ভিল্লাগে পড়ে।

কিন্তু কি আমার কপাল, বলুন! প্যারিসের কথা বলব বলে বসেছিলাম। সে কথা না বলে কোন্‌ সেই ইন্দোনেশিয়ায় চলে গেলাম কেমন অনায়াসে। আসল কথা রইল পড়ে। এবার প্যারিসের কথায় আসি। তবে প্যারিসের কথা বলার আগে ফ্রান্সের কথা একটু বলে নিতে হয়। ভারতে আমরা ওই ইংল্যান্ড ও ইংরেজের খবর যতটা রাখি, ততটা আর কোনো দেশের রাখি না। সম্পর্ক থাকলে খবরও রাখা হয়, নইলে হয় না। ইংরেজের সঙ্গে আমাদের একটা সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল। সে সম্পর্ক অনভিপ্রেত। কিন্তু সম্পর্ক তো? এই তো আমরা যখন ডোভার এলাম তখনই কত কথা মনে পড়ল। ডোভারে এসে জাহাজে উঠলাম। ফেরি জাহাজ। এই জাহাজে চড়ে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেব। আমরা ফরাসি উপকূলে ক্যালে Calais বন্দরে গিয়ে নামব। জাহাজে উঠেই রতির কথা মনে পড়ল। আমরা জাহাজে চড়ে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যবর্তী সমুদ্রের যে সঙ্কীর্ণ আংশটুকু পাড়ি দিলাম তারই নাম ইংলিশ চ্যানেল। জাহাজে সেই চ্যানেল পাড়ি দিতে আমাদের প্রায় দেড়টি ঘণ্টা লাগলো। মন তো তৈরি হয়েই থাকে জিজ্ঞাসা করুন আর নাই করুন সে আপনাকে স্মৃতির আলমারি থেকে

খুলে খুলে থরে থরে সাজানো জিনিস বার করে দেখাতে থাকে। শাড়ির দোকানের সদা প্রসন্নমুখ সেলস্‌ম্যনদের মতো। একটামাত্র শাড়ি দেখে তাই পছন্দ করে কিনে এনেছেন এমন ব্যাপার ঘটেছে কোনোদিন কোনো ক্রেতা মহিলার জীবনে? ঘটে কখনো? কক্ষনো না। শাড়ির দোকানে গিয়ে বসামাত্র থরে থরে শাড়ি নামবে : ওরা একটা একটা করে খুলে দেখাবেন ; তিনি দেখবেন, মাঝে মাঝে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া পুরুষ মানুষটির মতামত জানতে চাইবেন ; তিনি মতামত দিলেন কি না সে বিষয়ে বিশেষ মন দেবেন না; দেখবেন আর দেখবেন। একটি শাড়ি কেনার হলে প্রথমে উনিশটা পছন্দ করবেন, ধীরে ধীরে অপছন্দ করতে করতে একটা রাখবেন। কখনো বা তাও হবে না। এক দুই তিন চার দোকান দেখে তবে পছন্দ হবে। কখনো এক দিনে হবে না। একাধিক দিন দোকানে যাবেন। তবে হবে। পুরুষ সঙ্গীটি আজীবন নিরামিষাশী যে চরম অনীহায় আমিষ ভোজ্যদ্রব্য দেখেন সেই দৃষ্টিতে শাড়ি দেখবেন, উঠবেন, যাবেন। যদি তিনি স্বামী হন গম্ভীর হতে থাকবেন, হয়ত ক্রুদ্ধ হবেন। অন্য কেউ হলে মনের ভাব গোপন করে শাড়ির তারিফ করবেন। দোকানিরা এসব জানেন এবং পরম আগ্রহ দেখিয়ে শাড়ি দেখিয়ে চলবেন। তাঁরা প্রতিদিন এই নাটকে অভিনয় করে চলছেন। এটা যে তাদের ব্যবসা, জীবিকা। করতে হয়

মনও দোকানির মতো। সে তার কাজ করেই যাবে। আপনার প্রয়োজন অপ্রয়োজন বা ইচ্ছা অনিচ্ছার তোয়াক্কাই করে না সে। সুতরাং, ইংলিশ চ্যানেল দেখামাত্র মন আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় সেই কবে পড়েছিলাম যে Look Stranger কবিতা, তার কথা। কবিতায় যেমন আছে এখানেও তেমনি গাঙচিলগুলো খাড়া চকের পাহাড়ে বসতে চাইছে কিন্তু পারছে না, পিছলে যাচ্ছে। আমি দেখছি কিন্তু মন অন্য তথ্য এনে সামনে রাখছে। শাড়ির মত। দেখ, পছন্দ কর। মন জানায় এই ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়ার জন্য তুমি এত বড় জাহাজে চড়েছ, ঘুরে বেড়াচ্ছ। জান, এই চ্যানেল অনেক পুরুষ ও মেয়ে সাঁতরেও পাড়ি দিয়েছে। জগদ্বিখ্যাত হয়ে গেছে তাঁরা এই কাজ করে। এই বীর বীরাঙ্গনাদের মধ্যে আমাদের দেশের মানুষও আছেন। আরতি সাহা আর রতিরঞ্জন ধরের নাম জান না? রতিরঞ্জন ধর তো আমাদের নিকট জন, আগরতলার ছেলে। আমাদের ছেলেমেয়েরা তখন ছোটো। আমরা থাকি তখন কলেজ টিলায় কোয়ার্টার্সে। ছবির মতো সুন্দর জায়গা। চারপাশে লেকের জল। সুন্দর শাপলা ফুল। শীতকালে সাইবেরিয়া থেকে পাখিরা আসে বেড়াতে সেখানে। আমার সহধর্মিণী বেলার উৎসাহের অন্ত নেই। একবার যা করবে মনে করে, করেই ফেলে। সবই যে ভাল কাজ হবে তার কোনো কথা নেই। তবে ও যেসব কাজ করতে যায় ওর মতে সবই ভাল কাজ। মাঝে মাঝে ফলটা ভাল হয় না। সেসব পরে হবে। এখন রতিরঞ্জনের কথাটা বলি। বেলার হঠাৎ মনে হল আমাদের কোয়ার্টার্স পাড়ায় এতগুলো ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, বাড়ির চারদিকেই এত সুন্দর জল, অথচ একটা ছেলেমেয়ে সাঁতার জানে না। একদিন একটা বিপদ আপদও তো ঘটে যেতে পারে? লোকে তখন বলবে কি? সুতরাং সে লেগে গেল। সরকারের ক্রীড়াদপ্তর শ্রীমতী বেলা ধরের আগ্রহের আতিশয্যের কদর করলেন। ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী শ্রীমান রতিরঞ্জন ধর সহ তিন জন সাঁতারু কলেজ টিলায় বাচ্চাদের সাঁতার শেখাবার দায়িত্ব পেলেন। ওদেরও খুব ভাল লেগে গেল কাজটা। প্রতিদিন বিকেল বেলা সরগরম হয়ে উঠতে লাগল আমাদের পাড়া। বড়রা দর্শক হয়ে উঠলাম। বেলার চেষ্টার গোড়ার দিকে যাঁরা

স্কেপটিক ছিলেন, পরে তাঁরাও বিকালে বেতের চেয়ার নিয়ে এসে বসে আনন্দ উপভোগ করতে লাগলেন। যাঁরা সাঁতার শেখাতো তাদের সেনাপতি ছিল শ্রীমান রতিরঞ্জন ধর। কত বছর আগের কথা। সাঁতার শিক্ষার্থী বাচ্চাদের মায়েরা সানন্দে পালা করে শিক্ষকদেরকে টিফিন খাওয়াতেন। একটা অনবদ্য হৃদ্যতার ইতিহাস মন স্মৃতির আলমারিতে গুছিয়ে রেখেছিল। এত বছর পরে সে তা এনে আমার সামনে উপস্থাপিত করলো। বললো, এই তথ্যটি তোমার কোনো কাজে লাগে কি না দেখ। এই ইংলিশ চ্যানেল যাঁরা সাঁতরে পাড়ি দিয়েছে তাদের মধ্যে রতিরঞ্জন ধব একজন। মনে আছে তাকে?" মনে আছে। তবে আছে মাত্র। এখন রাস্তায় দেখা হলে, 'ভালো আছ তো?' জিজ্ঞাসা করি।

তবে সবকাজেই যে শ্রীমতী বেলা ধর এমন কৃতকার্য হন তা ঠিক নয়। ওর কিছু বাতিক আছে। তার মধ্যে একটা বাতিকের নাম 'পরোপকার'। যাদের নিকটজন এই বাতিকে ভোগেন তাঁরা নিশ্চয়ই হাড়ে হাড়ে বোঝেন এই বাতিকের কি হ্যাপা। বেলাদেবী রাস্তার জলের কল খোলা থাকলে বাজারের থলে রাস্তায় রেখে সেই কল বন্ধ করেন। ছোট বাচ্চা মায়ের আঙুল ছেড়ে একলা হাটলে এগিয়ে গিয়ে মাকে বকে দেন, আরও কত কি। তবে এসব তো পুষিয়ে যায়। অনেক সময় পোষায় না। শুনুন এক কাহিনী। সংক্ষেপে বলবো। ঘাবড়াবেন না।

আমাদের পাড়ায় এক বাড়িতে ভাড়া থাকে একটি মেয়ে আর তার দেড় বছরের মেয়ে। মেয়েটির স্বামী বেশ দূরে চাকরি করে। প্রতিমাসে একবার দু-তিন দিনের জন্য বাড়ি আসে। একবার ওদের বড় বিপদ পড়ে। মেয়েটির স্বামী দুর্ঘটনায় পড়ে মারাত্মক জখম হয়। তাকে নিয়ে চেন্নাই যাবার জোগাড়যন্ত্র করছে। মেয়ের বাপের বাড়িতেও তখন বিপদ। অসুখ দুজনের, বড় ধরনের। তাঁরাও সাহায্য করতে পারছেন না। বেলা তো কেঁদেই অস্থির। প্রভিডেন্ড ফান্ড থেকে দশ হাজার টাকা তুলে স্টেট ব্যাঙ্কের পূর্ণিমাকে বলে কয়ে হাজার টাকার দশখানা নোট জোগাড় করে তবে সেই মেয়েকে দিয়ে আসে। ঠাকুরপূজা দেয় ওই মেয়ের স্বামীর আরোগ্য কামনা করে। যেভাবেই হোক ছেলেটিকে ভাল করে হাসি মুখে ফিরে আসে মেয়ে। এসেই চার হাজার টাকা ফিরিয়ে দেয়। পাঁচ বছর পার হয়ে গেছে। ওরা আমাদের পাড়া ছেড়ে অন্যত্র বাড়ি ভাড়া করে চলে গেছে। আমাদের নিট ফল কি হলো বুঝতে পারছেন? এত বড় অঙ্কের ধাক্কা না-খেলেও ছোটখাট এমন ধাক্কা আমরা প্রায়শই খাই। পরোপকারের হ্যাপা।

নাহ। আবার ডোভার ক্যালেতে ফিরে যাওয়া দরকার। ফ্রান্স আয়তনে ইউরোপের তৃতীয় বৃহত্তম দেশ— রুশদেশ ও ইউক্রেনের পরেই। ফ্রান্সের আয়তন ৫,৫১,৫০০ বর্গ কিলোমিটার। ২০০২এ ফ্রান্সের লোকসংখ্যা ছিল ৫,৯৪,১১,০০০। ফ্রান্সে ৭৫% মানুষ ক্যাথলিক, ৩% মুসলিম, ২% প্রোটেস্টান্ট ও ১% ইহুদি। অনেকে ধর্মহীন। ফ্রান্সের টাকার নাম আগে ছিল ফ্রাঙ্ক। এখন ফ্রান্স ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের সদস্য বলে টাকার নাম ইউরো। অবশ্য ফ্রাঙ্কও চালু আছে, এখনো লিগাল টেন্ডার, উঠে যায়নি। ফ্রান্সের ইতিহাস আমাদের ইতিহাসের মতোই যুদ্ধ, রক্ত আর দারিদ্র্যের সঙ্গে বিলাসের ইতিহাস। আমাদের যেমন মুঘল বিলাস ও ঐশ্বর্যের তুলনা নেই, সমগ্র ইউরোপেও ফ্রান্সের সম্রাটদের বিলাসের তুলনা নেই। সেই বিলাস যেমন ছিল জমকালো, তেমনি ছিল নিষ্ঠুর। কার্লাইল-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, "কার্লাইল

ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন যে, 'যে আইন অনুসারে একজন ভূম্যধিকারী মৃগয়া হইতে আসিয়া দুই জন দাস বধ করিয়া তাহাদের রক্তে প্রক্ষালন করিতে পারিতেন সে আইন ইদানীং আর প্রচলিত ছিল না।" ইদানী প্রচলিত ছিল না! তবে পূর্বে ছিল! " পঞ্চাশ বৎসর মধ্যে শারলোয়ার ন্যায় কোনো ব্যক্তি স্থপতিদিগকে গুলি করিয়া তাহারা কি প্রকারে ছাদের উপর হইতে গড়াইয়া পড়ে, দেখিয়া আনন্দ লাভ করে না।" বঙ্কিমচন্দ্র আরও বলেছেন, "পঞ্চদশ লুই প্রমোদানুরক্ত, বৃথা ভোগাসক্ত, ব্যয়শৌণ্ড, স্বার্থপর রাজা ছিলেন। তাহার উপপত্নীগণের পরিতুষ্টির জন্য অনন্ত ধনরাশি আবশ্যক। মাদাম পোম্পাদুর ও মাদাম দুবারি যে ঐশ্বর্য ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা পরিণীতা রাজমহিষীর নিষ্কলঙ্ক কপালেও জোটে না। মুঘলদের সম্বন্ধে এসব কথা লেখা নেই। তবে শাহজাদাকে ভালবাসার অপরাধে আনারকলিকে জ্যান্ত বন্দি করার কাহিনী তো আমরা ভারতীয়রা জানি। বিদেশী মুঘলেরা স্বদেশী হিন্দুদের উপর কত-না অত্যাচার করেছেন, জিজিয়া কর বসিয়েছেন, এসব ইতিহাসে আছে। ফ্রান্সে বিদেশী ইংরেজ জমিদারদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল পঞ্চদশ শতাব্দীতেও। দেশের সম্রাট ছিলেন ইংরেজের হাতের পুতুল। তখন আর্ক নামক গ্রামের নিরক্ষর এক তরুণী, 'জোয়ান অব আর্ক, ঈশ্বরের আদেশ পান ইংরেজ তাড়াতে জর্জ বার্ণার্ড শ' সেই কথা তাঁর 'সেন্ট জোন' নামক নাটকে অমর করে রেখেছেন। এই জোয়ান অব আর্ক বা সেন্ট জোনই প্রথম বিশ্ববাসীকে শেখান ভাষার নামে ও ভাষাভাষীর নামে শ্লোগান দিতে। 'ফ্রান্স ফরাসিদের, ইংল্যান্ড ইংরেজদের' বলে জোয়ান যে ডাক দিয়েছিলেন তারই এক রূপ দেখেছি আমরা ১৯৭১ সালে, আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'তে। রাজনীতিও সমান ভাবেই চলেছে। ঐ ফ্রান্সের রোমান ক্যাথলিক পুরোহিতগণ জোয়ান অব্ আর্ককে জ্যান্ত চিতায় তুলে জ্বালিয়ে মেরেছে। মারার আগে তাকে ডাইনি আখ্যা দিয়েছে। জোয়ান এর অপরাধ তিনি সোজাসুজি ঈশ্বরের আদেশ শুনেছেন বলে দাবি করেছেন। ক্যাথলিকগণ মনে করেন সাধারণ মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে যোগাযোগ যদি বা হয় তবে তা করবার একমাত্র লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হচ্ছেন ভ্যাটিকান এর পোপ। জোয়ান পোপএর এই লাইসেন্স অস্বীকার করেছেন। সুতরাং তিনি ডাইনি। সুতরাং বিচারের প্রহসন হয়েছে। জীবন্ত তাঁকে জ্বলন্ত চিতায় তুলে প্রাণদণ্ড দেওয়ার আদেশ হয়েছে এবং সেই আদেশ পালিত হয়েছে। ফ্রান্সে এমত কাণ্ড অনেক হয়েছে পঞ্চদশ শতাব্দীর সংস্কারের সময়। ফ্রান্সে প্রতিবাদী হুগুয়েনো (প্রোটেস্ট্যান্ট) গণ হাজারে হাজারে নিহত হয়েছেন জোয়ান অব্ আর্কের মতো, রোমান ক্যাথলিকদের হাতে। কাতারে কাতারে মানুষ দেশ ছেড়েছে প্রাণ বাঁচাতে। এখনো ফ্রান্সে ক্যাথলিক ৭৩% আর হুগুয়েনো ২%। ক্যাথলিক পোপের পুলিশেরা নাৎসি গেস্টাপো বা সোভিয়েত দেশের কেজিবির মতোই ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল। ধর্ম আর রাজনীতি সমান অন্ধ ও নৃশংস হয়ে উঠতে পারে অযোগ্যের হাতে পড়লে। সুতরাং জোয়ান অব আর্কই বলুন, মুজিবুর রহমানই বলুন আর রবার্ট ব্রাউনিঙ এর কবিতার 'পেট্রিয়ট'ই বলুন, এরা আগুনে জ্বলে, গুলিতে মরে বা ফাঁসিতে লটকায়। ফরাসিরা জোয়ান অব আর্ককে ডাইনি আখ্যা দিয়েছে এবং জ্যান্ত চিতায় ফেলে জ্বালিয়ে মেরেছে। চারশো বছর পরে ফ্রান্সের ক্যাথলিকরাই জোয়ানকে সেইন্ট জোয়ান করেছে, অর্থাৎ ক্যাননাইজ করেছে। প্যারিস শহরের সবচেয়ে ভাল জায়গায়, রাজপ্রাসাদ চত্বরে, আর্চ দ্য ট্রায়াম্ফ এর কাছে, অশ্বারোহিনী জোয়ান অব্ আর্কের মূর্তি সোনার বরণে সদম্ভে দাঁড়িয়ে আছে দীপ্তিময়ী হয়ে। দেখে এলাম, শির নত করে শ্রদ্ধা জানালাম।

ইতিহাস। কত মূর্তি দাঁড়ায়, পড়ে যায়। লেনিন, স্তালিন, সাদ্দাম এর মূর্তি দাঁড়িয়েছিল, পড়েও গেছে। বার্নার্ড শ'এর নাটক 'সেন্ট জোয়ান'-এর শেষে শ' আরও একটি অঙ্ক জুড়ে দিয়ে জোয়ান-এর সেইন্ট হওয়ার কথা বলেছেন। তারও পরে শ' আরও একটি অঙ্ক জুড়ে দিয়ে দেখিয়েছেন জোয়ান-এর পক্ষে সওয়াল করেছিলেন, ডাইনী বলতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন, তাঁরা এখন আনন্দ প্রকাশ করছেন, জোয়ান-এর সেইন্ট হওয়ায়। সেই সময় জোয়ান এসে বললেন যে তিনি আবার ফিরে আসতে চান। অমনি আবহাওয়া পাল্টে যায়। সকলেই জোয়ানের ফিরে আসার প্রস্তাবের বিরোধী। বহুদিন পূর্বে মৃত বিদ্রোহীকে সেইন্ট বানিয়ে শ্রদ্ধা জানানো যায়। সেটা নিরাপদ এবং সহজ। কিন্তু সে ফিরে এলে তাকে সহ্য করা যাবে না। রোমান ক্যাথলিকেরা প্রথম থেকেই বিশ্বাস করেন এবং করবেন যে ঈশ্বরের আদেশ কেবল পোপ, পাদরি ও পুরোহিতের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব। অন্যথায় নয়। যদি জোয়ান ফিরে আসেন এবং বলেন যে তিনি সরাসরি ঈশ্বরের আদেশ পেয়েছেন তাহলে তাকে আবার মৃত্যুদণ্ডই দিতে হবে, বাইবেলবিরোধী কথা বলে ডাইনি হওয়ার অপবাধে। তবে এখন হয়ত আর জ্যান্ত চিতায় ফেলা হবে না। শি উইল বি কিল্ড উইথ কাইন্ডনেস—ফাঁসি, গুলি, ইলেকট্রিক চেয়ার ইত্যাদি অনেক সভ্য ব্যবস্থা আছে!

সেই ফ্রান্স দেখতে এসেছি সেই আগরতলা থেকে। মাঝে মাঝেই গ্যারড ও গেইল যাত্রীদেরকে অবহিত করার জন্য মাইক হাতে তুলে নিয়ে কথা বলছে, ডানে বা বাঁয়ে দর্শনীয় কিছু থাকলে সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে ও সেগুলি সম্বন্ধে বলছে। ক্যালে থেকে প্যারিস যাওয়ার পথের দু'ধারের নিসর্গ দৃশ্য আমাদের দেশের মতোই। কোথাও ফসল তোলা হয়েছে, কোথাও জমিতে সোনারবরণ পাকা ফসল, আবার কোথাও এখনো ফসল কাঁচা এবং সবুজ। ব্যতিক্রম শুধু আয়নার মতো মসৃণ রাস্তা এবং শব্দহীন গাড়ি চলা। সাড়ে চার ঘণ্টা বাস চলার পর প্যারিস পৌছানো গেল। প্যারিস ফ্রান্সের রাজধানী। বড় সুন্দর শহর। সারা রাত এত আলো জ্বলে এই শহরে যে লোকে এই শহরকে সিটি অব লাইট্‌স্‌ আখ্যা দিয়েছে।

খ্রিস্টপূর্ব কালে বর্তমান প্যারিসের জায়গায় ঘন জঙ্গল ছিল। তখন সেইন নদীর চরে প্যারিসি নামের একটি ছোট উপজাতি গোষ্ঠী বাস করতো। চরে থাকতো বলে জন্তু জানোয়ারের ভয় ছিল না। চারদিকে তো জল! কিন্তু মানুষ নামক জানোয়ারটির গতি তো সর্বত্র। তাঁর থেকে বাঁচবার কোনো উপায় নেই। বাহান্ন খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে একদল রোমান সৈন্য সেইন নদীর চরে এই প্যারিসিদেরকে দেখে এবং সেই জায়গা দখল করে নেয়। পরে সেখানে নদীর দুই তীরে জনপদ গড়ে ওঠে আব সেই জনপদের নাম হয় প্যারিস। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই শহর নাৎসিদের দখলে চলে যায়। কিন্তু হিটলারের নাৎসি বাহিনী বোমাবৃষ্টি করে লন্ডন শহর ধ্বংস করার চেষ্টা করলেও প্যারিসের তেমন কোন ক্ষতি করেনি। অনেকে মনে করেন যে হিটলারের স্বপ্ন ছিল তিনি সম্রাট হবেন; সুন্দরী প্যারিস হবে তাঁর রাজধানী। তাই প্যারিসকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেনি তাঁর নাৎসি বাহিনী। নিজেকে সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে যাঁরা তাদেরকে ইংরেজিতে মেগালোম্যানিয়াক বলে। এ এমন এক রোগ যা রোগীকে কেন্দ্র করে তার সহস্র লক্ষ স্তাবকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এটিলা, আলেকজান্ডার, তৈমুরলঙ, নেপোলিয়ন, হিটলার, স্তালিন, এরা এই রকম সুপারম্যান হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা

তাদের দেশবাসীর অকুণ্ঠ ও অপরিণামদর্শী সমর্থন পেয়েছিলেন। হিটলার যদি প্যারিসকে তাঁর রাজধানী করবেন ভেবে থাকেন তো নেপোলিয়ন ভেবেছিলেন তিনি রোম সম্রাট হবেন। সেই ভাবনার একটি মূর্ত প্রতীক আছে প্যারিসে। শহরে যেখানে পুরানো রাজপ্রসাদ, আর্চ দ্য ট্রায়াম্ফ, ইত্যাদি, সেখানেই বেশ বড় ও উঁচু একটি ধাতব স্তম্ভ আছে। আমাদের দিল্লির লৌহস্তম্ভের চাইতেও বড় এই স্তম্ভ। কামান ও অন্যান্য সমরাস্ত্র গলিয়ে ছাঁচে ঢেলে এই স্তম্ভ তৈরি হয়েছে। এর সারা গায়ে কত বিচিত্র চিত্র। এই ধাতব স্তম্ভের মাথায় দাঁড়িয়ে আছেন ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টি। গায়ে তার জুলিয়াস সিজারের পোশাক! মেগালোমেনিয়াকের একটি বিশ্ববিখ্যাত প্রতীক।

প্যারিস শহরে দ্রষ্টব্যের আর শেষ নেই। পুরানো শহর এলাকার প্রতিটি বাড়িই স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে অতুলনীয় সুন্দর করে তৈরি। আছে বিখ্যাত ল্যুভর মিউজিয়াম। চিত্র, ভাস্কর্য সহ কত যে দর্শনীয় বস্তু আছে সেখানে তার যেন সংখ্যা নেই। গ্যারড বলছিলেন যে যদি কেউ ল্যুভর মিউজিয়ামে রক্ষিত প্রতিটি বস্তুর সামনে তিন মিনিট করে দাঁড়ায তবে তাঁর তিন মাস লাগবে এই মিউজিযামের বস্তুসামগ্রী দেখে শেষ করতে! পুরোনো সম্রাটদের প্রাসাদটি তো কয় পুরুষ ধরে গড়ে উঠেছে। দেখে দেখে আর শেষ হয না। প্রাসাদের অদূরেই দাঁডিয়ে আছে 'বিজয়-তোরণ'— আর্চ দ্য ট্রায়াম্ফ। এরকম তোরণ বিভিন্ন উপলক্ষে কত জায়গায়ই তৈরি হয়। আগরতলায় তুলসীবতী বিদ্যালয়ের হোস্টেলের সামনে যে তোরণটি দাঁড়িয়ে আছে সেটি ত্রিপুরার মহারাজের সিংহাসন আরোহণ উপলক্ষে তৈরি হয়েছিল। অদূরেই ছিল 'জ্যাক্সন্ গেট।' অধুনা নিশ্চিহ্ন। দিল্লিতে আছে 'ইন্ডিয়া গেট'। মুম্বইতে আছে 'গেটওয়ে অব ইন্ডিয়া'। হায়দরাবাদে আছে 'চারমিনার'। আর্চ দ্য ট্রায়াম্ফ ফরাসি জাতির স্বদেশ প্রেমের নিদর্শন। নেপোলিয়ন বোনাপার্টি ১৮০৬ সালে তাঁর সৈন্যদের স্মৃতিস্তম্ভ হিসাবে এই বিজয় তোরণ নির্মাণ আরম্ভ করেন। রাজা লুই ফিলিপ ১৮৩৬ সালে এর নির্মাণ শেষ করেন। এই তোরণের তলায় প্রথম মহাযুদ্ধে শহিদ হওয়া নাম-না-জানা সৈনিকদের স্মৃতিস্তম্ভও তৈরি হয়েছে। অজানা সৈনিকদের স্মৃতিতে তৈরি এমন স্থানও সেখানে রাখা 'অমরজ্যোতি' এখন বহু দেশেই আছে। ভারতের দিল্লিতেও আছে। কিন্তু এমনটি প্রথম হয ফ্রান্সে, প্যারিসে, এই আর্চ দ্য ট্রায়াম্ফের নীচে। 'নতর দাম' বা আমাদের মেযে, অর্থাৎ কুমারী মাতা মেরির নামে বিশাল গির্জাটিও প্যারিসের একটি দ্রষ্টব্য স্থান। এই নামে আরো অনেক গির্জা অন্যত্রও আছে। কিন্তু প্যারিসের 'নতর দাম' তুলনাহীন। প্যারিসে আর্চ বা তোরণ আছে আরও ক'টি। কিন্তু আর্চ দ্য ট্রায়াম্ফ' স্বমহিমায় উদ্ভাসিত। প্রাসাদের বাইরেই আছে তিনটি কাচের পিরামিড; একটি বড় আর দু'টি ছোট ছোট।

প্যারিসের দোকানের কথাই বা কত বলি। আমরা গত বছর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলে প্রবাস করে এসেছি। ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, আটলান্টিক সিটি, বাল্টিমোর ইত্যাদি শহর দেখে এসেছি। সুতরাং, বাজার দোকান দেখে ভড়কে যাওয়ার মতো আমরা নই। কিন্তু প্যারিসের দোকানরাজি বলবার মতো বটে। একটি দোকানের নাম, 'গ্যালারিজ লাফায়েৎ'। একটি রাস্তার দু'পাশের দু'টি ছ'তলা বিশাল বাড়ি মিলে এই বিপণি। এক একটি তলায় এক-এক রকম পসরা। এক ভাগের চারতলায় বাচ্চাদের খেলনা। এখানে আমাদের

সঙ্গী তামিলদম্পতি পৃথ্বীরাজ যমুনাকে হঠাৎ দেখতে পাই না। দশ মিনিট ধরে খুঁজে খুঁজে হয়রান। পরে বেলাকে এক জায়গায় দাঁড় কবিয়ে রেখে আবও দশ মিনিট ঘুবে তাঁদেরকে পেলাম। বুঝুন কত বড় দোকান সেই 'গ্যালারিজ লাফায়েৎ'।

প্যারিসে খাবার দোকান এবং পানীয়ের দোকান অনেক। ক্রেতাও সংখ্যাহীন। এখানে খাদ্য ও পানীয়ের দোকানে এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্যত্র কোথাও আছে বলে শুনিনি। প্যারিস শহরে, বিশেষ করে এখানকার সাজেঁ এলিজেঁ এলাকায় এই বৈশিষ্ট্যটি চোখে পড়ে। দোকানের বাইরে, রাস্তার পাশে অনেক চেয়ার টেবিল পাতা আছে। পানীয়ের গেলাস হাতে নিয়ে দোকানের ভিতর দাঁড়িয়ে পান করলে যে পানীযেব দাম ধরুন কুড়ি টাকা, দোকানের ভিতরে সাজিয়ে রাখা চেয়ারে বসে সেই পানীয় পান করলে তার দাম হবে চল্লিশ টাকা; আর বাইরে খোলা আকাশের নীচে চেয়ারে বসে আয়েস করে যদি পান করতে চান তবে সেই পানীয়েরই দাম দিতে হবে একশো টাকা। শহরের কত জায়গায় কত বিচিত্র বর্ণের আলোর সমারোহ। কিন্তু সাজেঁ এলিজেঁতে আলার রং সম্বন্ধেও আইন আছে। এখানে দোকানের বাইরে কেবল সাদা আলোই ব্যবহার করা চলে। অন্য বর্ণ বেআইনি।

গোটা প্যারিস শহরে গড়ে উঠেছে সেইন নদীর দু'পাড়ে। সেইন একটি শীর্ণতোয়া নদী। বৃষ্টি হলে পরে দু'কুল ছাপানো আগরতলার হাওড়া নদীর মতো। তবে সেইন কখনো শুকিয়ে যায় না। সর্বদাই জলপূর্ণ। সর্বদাই লঞ্চ ও ছোট জাহাজ চলছে। প্যারিস শহর এলাকায় নদীর উপরে উনিশটি সেতু। সবচেয়ে পুরনো সেতুটির নাম নয়া পুল। আগে সব কাঠের সেতু ছিল তো? প্রথম যে পাকা সেতুটি হয়েছিল লোকে তাকে নয়া পুল বলতে থাকে। ক্রমে সব সেতুই পাকা হয়ে গেছে। কিন্তু প্রথম পাকা পুলটির নাম নয়া পুল রয়ে গেল। সেতুগুলি যে কত সুন্দব হতে পারে তা প্যারিসের সেইন নদীর উপর করা উনিশটি সেতু না দেখলে কেউ বলতে পারবে না। কত সুন্দর সুন্দর ভাস্কর্য যে সেতুর দুপাশে বসিয়েছে তার হিসাব নেই যেন। আটাশে জুলাই ২০০৩ বিকাল ছটা থেকে সন্ধ্যা আটটা অবধি আমাদের সেইন নদীর উপর নৌকা বিহার ও ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। সবগুলি সেতুর নীচ দিয়ে যাওয়া-আসা হল। সবিস্ময়ে দেখলাম সেতুগুলির তলাগুলিকেও কেমন যত্ন করে শিল্প সামগ্রী দিয়ে সাজানো হয়েছে। সুন্দর যোড়শোপচাব আহার হলো। আমাদেব সহযাত্রীগণ আহারের পরে নাচগান করলেন। সবাই আনন্দ করলেন। নদীর দু'পাড়ে বসা লোকও অন্য জাহাজের লোকেরা হাততালি দিয়ে এই জাহাজে আমাদেরকে উৎসাহ দিলেন। বহুদিন মনে থাকবে সেই সান্ধ্য আনন্দের কথা।

পুরোনো প্যারিস রেল স্টেশনটি ছিল সেইনের পাড়েই। তখন ট্রেন ছিল দু'কামরার। গাড়ি যখন লম্বা হতে থাকলো তখন সেই ছোট্ট স্টেশনে আর কুলোয় না। সুতরাং, নতুন স্টেশন তৈরি হল দূরে। কিন্তু এরা পুরানো স্টেশনটি নষ্ট করেনি। সেটি এখনো আছে। সেই বিরাট ঘড়িটি আছে। দেয়ালে বড় বড় করে লেখা স্টেশনগুলির নাম— বর্দো, ভার্সাই, ইত্যাদি। এই স্টেশনটি এখন একটি রেলওয়ে মিউজিয়াম। অদূরেই ন্যাশনাল এসমব্লি হাউস বা ফ্রান্সের পার্লামেন্ট ভবন। এটি আমাদের ভারতের পার্লামেন্টের সঙ্গে তুলনা করলে একেবারে কিছুই নয়। সাদামাটা। কিন্তু ফরাসিদের মতো এমন গণতান্ত্রিক আর কারা কোথায় আছে? পার্লামেন্টে

STATE CENTRAL ... AGARTALA 10212 27

ঝগড়াঝাটি ও মারামারিতেও ফরাসিরা ওস্তাদ। ঢাকার মত প্যারিসের এসেমব্লিতেও একজন মাননীয় সদস্যের ছোড়া চেয়ারের আঘাতে একজন ডেপুটি স্পিকার নিহত হন।

যার কথা বলে লোক ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের কথা বলতে শুরু করে সেই আইফেল টাওয়ার তো রয়েই গেল। তার কথা না বললে আর প্যারিসের কথা কি বলা হত? সেটা ১৮৮৯ সালের কথা। প্যারিসে একটা একজিবিশান হবে। মহাসমারোহে সারা দেশ সেই একজিবিশান-এর প্রস্তুতিতে লেগে গেছে। একজিবিশান করে দেখিয়ে দেবে ফরাসিরা সারা ইউরোপকে যে তারা কত উন্নতি করেছেন শিল্পে, বিজ্ঞানে, কৃষিতে, সর্বত্র। প্যারিসের সম্ভ্রান্ত নাগরিকদের একজন ছিলেন আলেকজান্দার গুস্তাভ আইফেল। তিনি ইঞ্জিনীয়ার। তিনি সেই একজিবিশানে অংশ গ্রহণ করবেন। তাঁর প্রদর্শিত বস্তুটি একজিবিশানের পরেও সেই জায়গাতেই থাকবে। সরিয়ে ফেলা হবে না। সুতরাং, তাঁর একটি বড় জায়গা চাই চিরস্থায়ী ভাবে। একজিবিশানের জায়গা থেকে একটু দূরে, সেইন নদীর তীরে তিনি একটি জায়গা পছন্দ করলেন। তাঁকে সেই জায়গাটি দেওয়া হল। তবে তাঁর সেই ময়দানবের পরিকল্পনা রূপায়িত করার মতো এত অর্থ সাহায্য দিতে পারলেন না সংগঠক কমিটি। আলেকজান্দার গুস্তাভ আইফেল দমবার পাত্র নন। তিনি অসাধারণ মানুষ। টাকার জোগাড়ে লেগে গেলেন এবং টাকা জোগাড় করলেন। কত অর্থ? ১৮৮৯ সালে তিনি জোগাড় করলেন দশ লক্ষ ডলারের সম পরিমাণ অর্থ। তবে প্রথম বৎসরেই টাওয়ার দেখতে আসেন বিশ লক্ষ লোক। আর তাদের কাছ থেকে পাওয়া দর্শনী দিয়েই টাওয়ার নির্মাণের পুরো অর্থ উঠে আসে। গুস্তাভ আইফেল এমনই কৃতকর্মা লোক ছিলেন। তাঁর কীর্তি আইফেল টাওয়ার এখনো দাঁড়িয়ে আছে সদম্ভে, ১১৪ বৎসর পরেও। থাকবে বহুকাল আরও প্রতিদিন হাজার হাজার দেশী ও বিদেশী নরনারী সবিস্ময়ে এটি দেখছেন ও শ্রদ্ধার সঙ্গে এর নির্মাতা আলেকজান্দার গুস্তাভ আইফেলকে স্মরণ করছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে এই টাওয়ারের নির্মাতা গুস্তাভ আইফেলই নিউইয়র্কে স্ট্যাচু অব লিবার্টির ভিতরের ইস্পাতের কাঠামোটি তৈরী করেছিলেন। সেই স্ট্যাচু অব লিবার্টির একটি রেপ্লিকা সেইন নদীর একটি চরে দাঁড়িয়ে আছে। তবে এটি মূল স্ট্যাচুর এক-পঞ্চমাংশ মাত্র।

আইফেল টাওয়ারটি সেই ইউনিভার্সাল এক্সপোজিসানের জন্য গুস্তাভ আইফেল তৈরি করেছিলেন মানুষকে দেখাতে যে লোহা ও ইস্পাতকে কত ভাবে ব্যবহার করা যায়। বিশাল এই টাওয়ারটির ছবি তো সকলেই দেখে থাকবেন। কিন্তু ছবি দেখে এর বিশালত্বের ধারণা করা যায় না। এটির উচ্চতা তিনশ' মিটার, নয়শ' চুরাশি ফুট। তখনকার দিনে এটি ছিল সারা বিশ্বে মনুষ্যনির্মিত সর্বোচ্চ স্তম্ভ। এখন এর চূড়ায় ওঠার জন্য অতিকায় লিফট লাগানো হয়েছে। ওঠার কোনো পরিশ্রম নেই। কিন্তু প্রথম প্রথম মানুষ তো সিঁড়ি ভেঙেই উঠতেন। বলা ভাল যে টাওয়ারটি মাটি থেকে দেখতে পয়সা লাগে না। কিন্তু লিফটে চড়ে উপরে যেতে চাইলে টিকিট কাটতে হয়। টিকিটের মূল্য তিন ইউরো বা একশ' একাত্তর টাকা। লাইনে দাঁড়াতে হয় অন্তত পঁয়তাল্লিশ মিনিট। দু'টি তো মাত্র লিফট্। তবে প্রতি লিফটে প্রতিবারে জনাপঞ্চাশেক লোক উঠে যায়। ২৬ জুলাই ২০০৩-এ আমরা বিকেল বেলা যখন লিফটের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম তখন আকাশে ঘন কালো মেঘ, ঝিরঝির বৃষ্টি ঝরছে। লোক

কম। আমরা মিনিট বিশেক দাঁড়িয়েই লিফটের নাগাল পেয়ে যাই। উপরে উঠি। তবে বৃষ্টির জন্য সব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল না।

আইফেল টাওয়ারটি বহু ইস্পাতখণ্ড জোড়া দিয়ে তৈরি হয়েছে। বারো হাজার বড় ঢালাই লোহার খণ্ড ও আড়াই লক্ষ ছোট ইস্পাত খণ্ড ও নাট বল্টু লেগেছে এতে। মোট ওজন সাত হাজার মেট্রিক টন। নির্মাণ সময় প্রায় সাতাশ মাস। ১৯৫৯ সালে বিশ মিটার লম্বা একটি রেডিও এন্টেনা লাগানোতে এর উচ্চতা বিশ মিটার বেড়ে গেছে। দিনের বেলা দেখে প্রাণ ভরেনি। রাতের প্যারিস দেখার (দক্ষিণা মাথা পিছু দশ ইউরো বা পাঁচশ' সত্তর টাকা) সময় আবার আইফেল টাওয়ার দেখা হল। রাত এগারোটায় ও বারোটায় দশ মিনিটের জন্য আইফেল টাওয়ার অতি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সাধারণ আলোময় টাওয়ারের গায়ে তখন জ্বলে ওঠে আরও বিশ হাজার বাল্‌ব। এগুলি ক্যামেরার ফ্ল্যাশ লাইটের মতো জ্বলছে আর নিভছে।

দেখা হয়, কিন্তু শেষ হয় না। ওই বিশাল ভাস্কর্যটির একটি ছবি নেব আমার স্ত্রীকে সামনে দাঁড় করিয়ে। সোজা দাঁড়িয়ে, কাত হয়ে, হাটু গেড়ে, কিছুতেই মনোমতো হচ্ছিল না। শেষে ধপাস করে বসেই ক্লিক করলাম। তখনই পাশ থেকে কে যেন বলে উঠলেন, 'নমস্কার, ভাল আছেন তো? আমি হামিদ। আমি বাংলা জানে। কলকাতায় ছিল তো? বাড়ি মুম্বই। দশ বছর ফ্রান্সে থাকে। কলকাতায় ডিরেক্টার অধিকারীর ছেলে আমার বন্ধু আছে। দেখলে বলবেন হামিদের কথা।" আমাকে অবাক করে দিয়ে আবার 'নমস্কার' বলে স্মিত মুখে চলে গেলেন হামিদ। স্থান প্যারিসের বিশ্বখ্যাত 'অপেরা হাউস'-এর সামনে। এখন এটি 'ন্যাশনাল আকাদেমি অব আর্তস'। সিমেন্ট রং-এর পাথরের বিশাল অট্টালিকা। পিছনে বিরাট উঠান। বড়লোকেরা (ঘোড়ার) গাড়ি সহ উঠানে ঢুকে যেতেন সঙ্গিনীকে নিয়ে। কেউ যাতে দেখতে না পায় সঙ্গিনীকে। তিনিও তো কোনোও সম্ভ্রান্ত লোকের গৃহিণী। গাড়ি থেকে নেমেই সোজা বক্সে। হয়তো অন্য কোনো বক্সে বসে আছে তাঁর কোনো আত্মজন অন্য কোন সম্ভ্রান্ত নাগরিকের সঙ্গে। তবে লুকোচুরির সেই পুরোনো রেওয়াজ এখন আর নেই। এখন গণতান্ত্রিক যুগ। এখন কেউ কারও তোয়াক্কা করে না। এখন সব প্রকাশ্যে, সদর্পে হয়। এখন যার যা ইচ্ছে করার যুগ।

আমরা এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছি। এখানে চারটেয় আমাদের বাস এসে দাঁড়াবে, আমরা বাসে চড়ব। ফুটপাথে বসে আছেন একটি পরিবার। দেখে বাঙালিই মনে হয়। জিজ্ঞেস করি। হ্যাঁ। রেহানা খাতুন বসে আছেন দুই ছেলের সঙ্গে। হাতে কোলার টিন। ইনির বাড়ি 'অবিগঞ্জ'। আছেন লন্ডনে বাইশ বছর। 'প্যারিসে এই 'পরথম'। ভাল লাগে না। দুই বছর অইলেই দেশের লাগি মন ছটফট করে।' তাই দেশে যান। তবে খরচ কত! সাত 'ভইন' ওরা। 'সবেই' ইংল্যান্ডে থাকে। চাকরি করে না কেউ। সব জামাইরা ব্যবসা করে। 'দুকান' আছে। 'সকাল বেলা যে ছুডো ভইনেরে দেখলেন ঐড়া টিচারি করে। নতুন বিয়া অইছে। তাইর বিয়া উপলক্ষেই হগলের ফ্রান্সে এই বেড়ানো। দেখতেও পরিশ্রম। আডাউডি লাগে কত? পারি না।'

'উলট পুরাণের দেশ—আমেরিকার কথা'য় লিখেছি যে আমরা নিউ জার্সি ও নায়াগ্রায়

রাত্রিবাস করেছিলাম 'ইকনোলজ' নামের একটি হোটেলে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই হোটেলটির নয়শ'রও বেশি শাখা আছে। এবার প্যারিসে তিনরাত্রি বাস হলো ওই নভোতেল এর একটি শাখায়। নানা দেশেই আছে এই হোটেলের শাখা। প্যারিসেই আছে সাতাশটি নভোতেল। আমরা ইংল্যান্ডে যে ইপ্সউইচে থাকি সেখানেও একটি নভোতেল আছে। আমরা প্যারিসে যে শাখাটিতে ছিলাম তার এক রাতের ভাড়া একশো ইউরো।

ডিজনিল্যান্ড-প্যারিস

সাতাশে জুলাই ২০০৩ মঙ্গলবার। আজ আমাদের দেখা হবে ডিজনিল্যান্ড, প্যারিস। সকাল বেলা সাত তাড়াতাড়ি হোটেল নভোতেল-এর শয্যা ছেড়ে, প্রাতরাশ করে রওয়ানা দেওয়া গেল। পথ তো কম নয়। প্রায় একঘণ্টা বাসে যেতে হবে। সবাই সময় মতো এসে গেছে। আমাদের পেছনে ওদিকের সিটে প্রিয়া আর প্রিয়ার মা। একটু দূরে হরিজিৎ তার বন্ধুর সঙ্গে বসেছে। হরিজিৎ জোরে কথা বলে জানান দিচ্ছে যে সে ওখানে আছে। প্রিয়ার যেন নিজের কানকে বিশ্বাস হচ্ছে না। ক্ষণে ক্ষণে ভীরু দু'টি চোখ তুলে দেখে নিচ্ছে সত্যিই হরিজিৎ ওখানে আছে কি না। প্রিয়ার মা অনবরত প্রিয়ার কানে কত কথা বলছে, কত তার মুখের অভিব্যক্তি। স্পষ্টতই প্রিয়া কিছু শুনছে না। তার এখন, 'হিয়া লাগি হিয়া কান্দে গুণে মন ভোর, প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।' প্রিয়ার এখন শুধু কর্ণই নয়, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ই নষ্ট। কেবল মন, অর্থাৎ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়টি হরিজিতের ধ্যানে মগ্ন। তাই প্রিয়া কিছু শুনছে না। বাস চলছে। আমরা ডিজনিল্যান্ড যাচ্ছি। যথা সময়ে বাস গন্তব্যস্থলে পৌঁছলো। জনপ্রতি উনচল্লিশ ইউরো অর্থাৎ দু-হাজার দু'শো তেইশ টাকা দিয়ে টিকিট নেয়া হল। আমার আর বেলার দুটো টিকিটের দাম প্রায় সাড়ে চার হাজার টাকা। এত দামের কেন এর অর্ধেক দামের কোন টিকিট বোধ হয় ভারতে নেই। গ্যারড বলছেন, 'এখন সকাল এগারোটা বাজতে পনেরো মিনিট বাকি। রাত এগারোটা বিশ মিনিটে এখানে এসে বাসে উঠবেন। মনে রাখবেন ফ্রেঞ্চ টাইম, ভারতীয় টাইম নয়। বড় লজ্জা লাগে। এরা যত বারই আমাদেরকে ছাড়েন, ফিরবার সময় বলে দেন, তত বারই মনে করিয়ে দেন যে সময়টা ভারতীয় সময় নয়, মনে রেখে চলতে হবে। রাগ করার অধিকার নেই আমাদের। আমরা সময়টাকে এমনই অসময় করে ফেলেছি।

সময় নিয়ে ভারতবর্ষে কত কথা, কত গল্প। সব চেয়ে বেশি কাহিনী আছে ট্রেনের সময় নিয়ে। একটা বলি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল। কিশোরগঞ্জ স্টেশন। একজন যাত্রী সোয়া দশটার সময় এসে স্টেশন মাস্টারকে জিজ্ঞেস করেন, 'স্যার, সাড়ে দশটার গাড়ি ক'টার সময় আসবে? উত্তর আসে, 'জানি না।' যাত্রীটি বাইরে এসেই দেখেন গাড়ি আসছে, তখন দশটা বিশ। ক্ষুব্ধ যাত্রী আবার ঘরে ঢুকেন, বলেন, 'আপনি বল্লেন জানি না, কিন্তু গাড়ি তো সময়ের আগেই আসছে।' স্টেশন মাস্টার নিরুত্তাপ জবাব দেন, 'এইটা গতকালকার গাড়ি।' আমাদের সদাপ্রসন্ন অধ্যক্ষ সুমঙ্গল সেন মশাই বলেন, 'ইংরেজরা ভারত ছাড়বার সময় কত জিনিস ফেলে গেছে কিন্তু ঘড়িটা নিয়ে গেছে।' ভারতে সর্বত্র সময়ের প্রতি সীমাহীন অবহেলা। মনে পড়ে পরলোকগত ডা. ফণীদাসের কথা। একদিন বলছিলেন, 'আজকে মেজাজটা খারাপ। দুপুর বেলা আমাদের— সাহার বাড়িতে খাওয়ার নেমন্তন্ন। প্রায় একটা বাজে। গিয়ে দেখি বড় বড় কাতলা মাছ ধপাস ধপাস করে ফেলছে। বললাম, 'মাছ দেখাবেন যদি, তবে সে কথাটা বলতে হয়। খেয়ে দেয়ে এসে মাছ দেখে যেতাম।' কিন্তু এই মাছ কেটে রেধে খাওয়াবেন সে তো সন্ধ্যেবেলা হবে। মাছ দেখলাম। এখন বাড়ি গিয়ে খাই। বলে চলে এসেছি।' তবে কেউ কেউ সময় রক্ষা করেন ভারতেও। আগরতলায় জিতেন পাল দাদা কোন সভা ডাকলে তা সময়মতো আরম্ভ করেন। অগ্নি আচার্য সময়মতো আসেন। রামকৃষ্ণ

মিশন ও পরমার্থ সাধক সংঘের সভাও সময়মতো শুরু হয়। তবু বহু জায়গাতেই উদ্যোক্তাদের অনুরোধে সময়মতো গিয়ে দেখেছি বাঁশ পোতা হচ্ছে। সামিয়ানা টাঙানো হবে, শতরঞ্জি পড়বে, লোক আসবে, তবে তো সভা। সুতরাং, ডিজনিল্যান্ডের সামনে গ্যারড যদি বলেন 'ভারতীয় সময় নয়' তখন রাগ করব কোন্ সাহসে।

আগরতলায় ফোন করে আট বছরের সঙ্কেতকে যখন বললাম 'ডিজনিল্যান্ড' দেখে এসেছি' তখন সে বলে, 'ওটা তো অস্ট্রেলিয়ায়'। না তা নয়। ওয়াল্ট ডিজনি কোম্পানি নামে আমেরিকায় একটি সংস্থা আছে। এরা মানুষের চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থার ব্যবসা করেন। এরা পার্ক ও হোটেল ইত্যাদি রাখেন, ফিল্ম তৈরি ও পরিবেশন করেন এবং একটি টেলিভিশন চ্যানেল চালান। এরা ক্যালিফোর্নিয়ার এনাহেইমে একটি ডিজনিল্যান্ড তৈরি করে চালাচ্ছেন ১৯৫৫ সাল থেকে। ১৯৭১ সাল থেকে এমন একটি চলছে ফ্লোরিডা রাজ্যের অরলান্ডোতে। ১৯৮৩ সাল থেকে আর একটি ডিজনিল্যান্ড চলছে টোকিওতে। প্যারিসের নিকটে এই ডিজনিল্যান্ডটি চলছে ১৯৯২ থেকে। শুনেছিলাম এমন একটি ডিজনিল্যান্ড হওয়ার কথাবার্তা হচ্ছে মুম্বাইতে। কবে হবে কে জানে।

ওয়াল্ট ডিজনি (১৯০১-৬৬) এক অসাধারণ চরিত্র। ইতিহাসে সর্বাধিক খ্যাত এই ছায়াচিত্র নির্মাতা। প্রথম খ্যাত হন ১৯২০-৩০ এর মধ্যে। তাঁর সৃষ্ট কার্টুন চরিত্র ডোনাল্ড ডাক ও মিকি মাউস এখনও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বন্যপ্রাণীদের নিয়ে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কার্টুন ফিল্মও তৈরি করেন। ১৯২৭ সাল থেকে সবাক চিত্র হয়। তিনিই ডিজনিল্যান্ড থিম পার্ক তৈরি করেন এনাহেইম, ক্যালিফোর্নিয়ায়। সংকেত আট বছরের হলেও তার কথায় আমি বড়ই গুরুত্ব দিই। তাই সে ডিজনিল্যান্ড অস্ট্রেলিয়ায় বলাতে খুঁজে খুঁজে সব খবর সংগ্রহ করে এখানে বললাম। এবার প্যারিসের নিকটে যে ডিজনিল্যান্ড গড়ে উঠেছে সেটিতে কী দেখে এলাম তাই বলি।

বিশাল, বিরাট, বড়, অতিকায়, এসব শব্দ এতবার ব্যবহার করছি যে যাঁরাই আমার এই লেখা পড়বেন তাঁরাই মুচকি হাসবেন বোধ হয় আমার অপরিপক্বতা দেখে। কি করবো বলুন। আমার ঝুলিতে শব্দ এত কম যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই শব্দ বার বার ব্যবহার করতে হয়। প্রত্যেকেই আমরা নিজের নিজের ধারণার সীমার মধ্যে বাস করি যে। সেই সীমার বাইরে যেতে পারি না। ছোটবেলায় একটা গল্প শুনেছিলাম, বলি আপনাদেরকে। আমাদের গ্রামের দুই যুবক কলকাতা যায় রোজগারের উদ্দেশ্যে তাদের নাম সিরাজ ও নিরানন্দ। দুজনে গিয়ে উঠে মকবুল চাচার বাসায়। পরদিন চাচা তাদেরকে নিয়ে কলকাতা দেখাতে বেরোয়। হাওড়া ব্রিজের ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় নিরানন্দ জিজ্ঞেস করে, 'চাচা, ধেরাকটাই লুআর?' চাচা বলে, 'হ।' খানিকক্ষণ ভেবে নিরানন্দ বলে, 'বাপরে, শ' ট্যাহা লইয়া টান মারসে।' বেচারা নিরানন্দের ধারণার সীমার মধ্যে একশ' টাকা একটা বিরাট অঙ্ক। তাই সে সেই অঙ্কটার কথাই বললেন। যাঁরাই আমার 'আমেরিকার কথা' পড়েছেন, তাঁরাই আমার চান মোহনদার কথা জানেন। তাঁরও একটা কথা বলি। এই কথা 'শব্দ' সম্বন্ধে। সুতরাং, এটি আরও বেশি প্রাসঙ্গিক। তিনি বাইরে চাকরি করেন। তাঁর ক্লাস সিক্সে পড়া মেয়ে প্রতি সপ্তাহে একটি চিঠি লেখে পোস্ট কার্ডে। প্রথম কথা পোস্ট কার্ডের দাম মাত্র এক পয়সা, খরচ কম। দ্বিতীয় কথা পোস্ট কার্ডে লেখার জায়গা কম। ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রীর পক্ষে সেটা

বড় কথা। বেশি লেখার ক্ষমতাই তার নেই। একদা মেয়ের পত্র পেয়ে চানমোহনদা হতভম্ব। মেয়ের চিঠির শুরুটা তাকে ভাবিয়ে তুলল। পত্রের শুরুতে চানমোহন পুত্রী লিখেছে, 'শ্রীচরণেষু, কতিপয় বাবা।' বুঝতে পারছেন সকলে যে চানমোহনদা তার পিতৃত্বের বহুবচন হওয়াকে খুব একটা গৌরবের চিহ্ন বলে ধরতে পারলেন না। প্রথমে তিনি দুহিতার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হলেন। একটু পরে কন্যার মাতা সম্পর্কে চিন্তিত হলেন। চানমোহনদা বাড়ি গেলেই অভিযোগ শুনতেন যে একা দু'টি সন্তান নিয়ে তিনি আর সামলাতে পারেন না। একদিন যেদিকে ইচ্ছা চলে যাবেন। চানমোহনদা ভাবতে লাগলেন যে তাঁর এই সহসা কতিপয়ত্ব প্রাপ্তি তাঁর পত্নী 'সতী'র অসার্থকনাম্নী হয়ে যাওয়ার কথা তো বলছে না? কিছুক্ষণ উদ্বেগে কাটাবার পর ব্যাপারটা পরিষ্কার হয় এবং তাঁর মুখে হাসি ফোটে। রহস্যটি এই রকম : মেয়ের মাতৃভাষায় দখল বাড়াবার উদ্দেশ্যে দাদা তাকে বলেছিলেন প্রতি চিঠিতে একটি নতুন শব্দ ব্যবহার করতে। তবে বাবার বুঝবার সুবিধার জন্য সেই নতুন শব্দটির নীচে একটি রেখা টেনে দিতেও বলেছিলেন। খুব সম্ভব হাতের পোস্টকার্ডটিতে 'কতিপয়' সেই নতুন শব্দ। বোধ হয় অসাবধানতাবশতঃ চঞ্চলা বালিকা শব্দটি আন্ডারলাইন করতে ভুলে গেছে। যাক গে। কোনার্কের মন্দির দর্শনে যাঁরা যান তাঁদের অনেকেই মন্দিরগাত্রের ভাস্কর্যসমূহে এমনই নিবিষ্ট হয়ে পড়েন যে আর উপরে উঠে গর্ভগৃহে উপবিষ্ট বিগ্রহ মূর্তি দেখা হয়ে ওঠে না। আমিও এত অন্য কথা বলছি যে ডিজনিল্যান্ডে আর প্রবেশ করতে পারছি না। এবার নিশ্চয় করবো।

আমরা ফ্রান্স দেখতে যাবার আগে পুত্র প্রসূন নানাভাবে আমাদেরকে প্রস্তুত করছিল। কোন লাইব্রেরি থেকে বিবিসির তৈরি Get by in French বলে একটি প্যাকেট পর্যন্ত নিয়ে এসেছিল। তাতে একটি ভিডিও ক্যাসেট, একটি বই এবং দু'টি অডিও ক্যাসেট। ছেলের তো বাপ সম্বন্ধে অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু বাপের তো হয়ে গেল তিন কুড়ি তিন। এ বয়সে আমার মত সাধারণ মানুষের শেখার ক্ষমতা কমে যায়। সুতরাং, এমন ব্যবস্থা ছেলে করে দিলেও আমার ফরাসি ভাষা শিক্ষা বঁজুঁ, বঁ সোঁয়া, মশিয়েঁ, মেরসি, সিলভু প্লে, ইত্যাদি হাতে গোনা ক'টি শব্দেই সীমাবদ্ধ রইল, আর এগুলো না। আমার বয়সে পুত্রের সঙ্গে ভূমিকা বদলে যায়। সে পিতা আমি পুত্র। পুত্র বলেছিল, বাবা, ডিজনিল্যান্ড এ দু'টি ভাগ, ডিজনি পার্ক আর ডিজনিস্টুডিও। একদিনে একটার বেশি দেখা যায় না। এক টিকিটে একটাই বোধ দেখতেও দেয়। সুতরাং, গেট দিয়ে ঢুকেই তোমাদের ঠিক করে নিতে হবে কোনটায় যাবে। ঐ ডিজনিপার্কে বেশির ভাগেই বিভিন্ন ধরনের রাইড। আমার মন হয় এসবের ধাক্কা তোমরা সইতে পারবে না। তোমাদের জন্য ডিজনি স্টুডিওই ভাল হবে। তবে ওখানে গিয়ে কারা কোথায় যাচ্ছে ঠিক করে নিও। আমি বলে দিলাম মাত্র।' তাই করেছি। পঞ্চাশ জন সহযাত্রীর ছেচল্লিশ জনই পার্কে গেলেন। আমরা দু'জন এবং সালেমবাসী তামিল দম্পতি পৃথ্বীরাজ এবং যমুনা স্টুডিওমুখী হলাম। যা দেখলাম সবই অবাক কাণ্ড। দুপুর সাড়ে এগারোটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত কেবল দেখে যাওয়া। নিজেদেরই বিশ্বাস হয় না। এতটা সময় ঘুরে বেড়ালাম কেমন করে! ক্লান্তি লাগেনি। ক্ষুধা পায়নি।

ছেলে সাধারণভাবেই পরামর্শ দিয়েছিল, আমিও সাধারণভাবেই সেই পরামর্শ গ্রহণ

করেছিলাম। বড় ভাল করেছিলাম। অনেক বছর আগে, তা হয়ত পঁচিশ বছর আগে, সপরিবারে দিল্লী গিয়েছিলাম। ওদেরকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম ওই আপ্পুঘর। ওখানে ওইসব রোলার কোস্টার রাইড ছিল। ওসবে চড়ে আমার তো কাহিল অবস্থা। চার-পঞ্চমাংশ সময়ই চক্ষু বন্ধ করে পাড়ি দিয়েছিলাম। প্যারিসের ডিজনিল্যান্ডের রোলার কোস্টার রাইড তো দিল্লীর আপ্পুঘরের রাইড এর তুলনায় চতুর্গুণ ভয়াবহ বা থ্রিলিং। কিন্তু আমার সইবার ক্ষমতা যতটা ছিল ১৯৭৮ সালে তা অনেক কমে গেছে ২০০৩ সালে। সুতরাং ওই কোস্টার রাইড থেকে দূরে থাকাই সমীচীন। তাই করে ডিজনিল্যান্ড পার্ককে পরম শ্রদ্ধায় দূরে রেখে ডিজনিল্যান্ডে স্টুডিওর দিকে পা বাড়ালাম। ঢুকেই বাঁদিকে বিরাট সব প্ল্যানেট হলিউড,' 'ওয়াইল্ড ওয়েস্ট' ইত্যাদি লেখা এলাকা দেখে এগুলোতে ঢুকে যায় সবে। আমরাও যাই। কিন্তু এগুলি সব দোকান। এমন করে সেই পসরা সাজানো যে এগুলি যে দোকান তা বুঝতেই অনেক সময় কেটে যায়। তবে যাই আরো ভিতরে।

প্রথমে গিয়ে বসলাম যে অডিটোরিয়ামে সেখানে দেখানো হবে সিনেম্যাজিক। তখনো আলো জ্বলছে। কিন্তু মন্দ জায়গায় বসেছি। সামনে বসা দু'টি মানব-মানবী যে সিনেম্যাজিকে ব্যস্ত তাতে বড় অস্বস্তিতে পড়েছি. এমনিতেই পশ্চিমী মানুষেরা দৈহিক রেলেল্লাপনায় সমস্ত জন্তুদের ছাড়িয়ে যায়। তার মধ্যে ফ্রান্স তথা প্যারিসের স্থান একেবারে সামনে। তার মধ্যেও আমাদের সামনে বসা দুজন একেবারে লাগামছাড়া আলো নিভলো এবং এরা বোধ হয় পর্দায় ছায়াচিত্র আরম্ভ হবে বলে নিজেদের প্রদর্শনী আপাতত স্থগিত রাখলে এখন তাদের প্রদর্শনীর দর্শক থাকবে না বলে। তীব্র আলোও নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, বজ্রপাত সমান শব্দও সম্পূর্ণ নৈঃশব্দ দিয়ে সিনেম্যাজিক শুরু হল। প্রাগৈতিহাসিক যুগ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সব যেন একাকার করে দিল। ওদের সঙ্গে রাখতে গিয়ে নিজেরাই বেতালা হয়ে গেলাম। শব্দে কর্ণপটাহ যেন ছিন্ন হয়ে যায়। একটি পনের সেকেন্ডের দৃশ্য দেখে সংকেতের কথা মনে পড়লো। বৃষ্টি হচ্ছে। রাস্তায় দৈনিক সংবাদের সামনে জল। নায়িকা জলভেঙ্গে গটগটিয়ে বেরিয়ে গেল। নায়কও সমান তেজে পা দিল আর ডুবে গেল। আর উঠল না। নায়করা এমন করে পেছন ধরে যেতে গিয়ে হামেশাই ডুবে যায়, কে আর দেখে' এখানে সিনেম্যাজিকে সেই ব্যাপারটা সুন্দর ধরেছে দেখে বেশ লাগল. পঁচিশ মিনিটের শো' হাতে কাজু বাদাম। শো চলা কালে মুখ হা করেছিল, বন্ধ হয়নি' সুতরাং কাজু শেষ হয়নি এবার হবে।

ওখানে কী? বড একটা ছাতা। এর নীচে গিয়ে দাঁড়ালেই বৃষ্টি হয়। ছাতার নীচে কেউ না থাকলে আর বৃষ্টি হয় না। সবাই যাচ্ছে. ফটো উঠছে, হাসছে, ভিজে চলে আসছে। সুতরাং আগরতলা থেকে যারা এসেছে তাদেরই ব্যতিক্রম হয় কি করে? তাদেরও যাওয়া দাঁড়ানো, ফটো ওঠা, হাসা, ভেজা হলো। বাইরে এলে কত ছেলেমানুষী হয়। বাড়িতে সব গোটানো শামুক হয়ে থাকা, প্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত করে সংসার চলা। হায় পতঞ্জলি।

এরপর ওয়াল্ট ডিজনি 'গইবার ক্যাফে' কম্পিউটারের সামনে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান, গ্রহ তারামণ্ডল সব দেখুন। তারপর পছন্দ করে বলুন কোথায় যেতে চান। থলে ও পকেটে যা আছে সব, মায় পাশপোর্ট, সঙ্গের খাঁচাটিতে রেখে তালা লাগিয়ে চাবিটি নিজের পকেটে রাখতে হবে। এবার খাঁচার চেয়ারে বসে, বড দিয়ে নিজেকে বাঁধ দরজা বন্ধ ও যাত্রা শুরু। এ এক

ছেলেভুলানো যাত্রা। কিছুই না, তবু সব কিছু। দেবর্ষি নারদের ত্রিভুবন দর্শন। নারায়ণের মহিমায় এক জায়গায় দাঁড়িয়েই বারো বছর কাটিয়ে দেওয়া। এখানে অবশ্য বাহন ঢেঁকি নেই। রীতিমত মহাকাশ যাত্রীর মতো নিরাপত্তার সমস্ত ব্যবস্থা করে বসা; মনোবেগে গ্রহ নক্ষত্রের দেশে বেড়িয়ে আসা ; পুলক, স্বেদ, কম্প, ভয়, ইত্যাদি সমস্ত অভিজ্ঞতা লাভ করা; এবং সব শেষে বেরিয়ে এসে বুঝতে পারা আসলে যাওয়া কোথাও হয়নি। এক জায়গায় বসেই বিশ্বভ্রমণ হয়ে গেল। দুই মিনিটে দুই ঘণ্টার অভিজ্ঞতা হল। শ্রীমৎ দেবর্ষি নারদ সাধারণতঃ খোলামনের মানুষ, থুড়ি দেবর্ষি। কারো মন্দ করেন না। কেউ বিপদে পড়লে তাকে সাহায্য করেন। তবে তাঁর একটা হবি আছে, বড় অনন্য হবি। কেউ শান্তিতে আছে দেখলে তিনি ঝগড়া লাগিয়ে দেন। তাঁর কৌশলে কেউ ঝগড়া করছে দেখলে দেবর্ষির বড় আনন্দ হয়। এই আনন্দের জন্য দেবর্ষি ঝগড়া লাগিয়ে বেড়ান। পৃথিবীর শাসক রাজনীতিবিদদের মত ডিভাইড এণ্ড রুল। ইংরেজ হিন্দু মুসলমানে ঝগড়া বাঁধিয়ে রাজ করতো, এখন রাজনৈতিক নেতারাও তাই করে। কোথাও সেকুলারিজম, কোথাও হিন্দুত্ব, কোথাও ব্রাহ্মণ, শূদ্র, ইত্যাদি তুলে ঝগড়া বাঁধায় ও নিজেরা আখের গুছায়। সহপাঠির সাইকেলের পিছনের সিটটি ছাড়া আর কিছু জোটেনি যার, সে মন্ত্রী হয়, ষড়যন্ত্রী হয় ও থেমে থাকে না। সে গাড়ী চড়ে, আগে পিছে শান্ত্রি যায়, স্তাবকের স্তুতি শোনে, অন্যায় করে, অবিচার করে, ঝগড়া বাঁধায়। নিজের গদি ঠিক রাখে। দেবর্ষির কোন গদির লোভ ছিল না। ঝগড়া বাঁধানোটা নারদজীর একটা মোটিভলেস ম্যালাইনটি ছিল, এক উদ্দেশ্যহীন অসূয়া, একটা ব্যসন ছিল। তবু তিনি কোন বড় রকম ব্যাপারে জড়াতেন না। তিনি সিরিয়াস কোন বিষয়ে ব্যস্ত হতেন না। একদিন ব্যাপার গোলমেলে হয়ে পড়লো।

নারায়ণ সেদিন নারদজিকে নিয়ে সৃষ্টি দর্শনে বের হলেন। আগে এরকম হত। সম্রাট হারুণ অল রশিদ ছদ্মবেশে বের হয়ে প্রজাদের অবস্থা দেখতেন। স্কুলে কলেজে ইন্সপেক্টর আসতেন। নারায়ণও সৃষ্টি দর্শন করতেন। এখন এসব নেই। রাজা কর্ণেন পশ্যতি, মন্ত্রী স্তাবকদের কথাই মাত্র শোনেন, ঈশ্বরও নৈবেদ্যভোগী হয়ে পড়েছেন। যাক এসব কথা। নারায়ণ ও নারদ মহাশয় ঘুরে ঘুরে দেখছেন। দেবর্ষি তাঁর স্বভাব মত একটু পর পরই 'নারায়ণ নারায়ণ' বলে হুঙ্কার দিচ্ছেন। টি ভি তে এই হুঙ্কার শোনা যায়। কিন্তু আসলটা তো শোনা যায় না। শ্রীযুক্ত নারদ মহাশয় তো সর্বদাই ঘুরছেন এবং এইরকম হুঙ্কার দিচ্ছেন। আমরা শুনি কেউ? আলবাৎ না। তাই স্বাভাবিক। ব্রডকাস্ট শুনতে যেমন রেডিও লাগে, টেলিকাস্ট রিসিভ করতে যেমন টেলিভিশান লাগে, নারদকাস্ট শুনতে তেমনি ভক্তিস্নাত হৃদয় লাগে। যাদের হৃদয় তেমন তারা শোনেন বইকি। আমরা লোভে, ক্রোধে কামনায়, অসূয়ায়, ডুবে আছি, তাই দেবর্ষির 'নারায়ণ নারায়ণ' সততই ধ্বনিত হলেও শুনতে পাই না। হায় কপাল!

দেবর্ষি নারদ সেই ইন্সপেকশনের সময় একটু অন্য রকম হয়ে পড়লেন। তাঁর অহং বেড়ে গেল। বড়র নৈকট্যে তাই হয়। মন্ত্রীর দরজায় যে কর্মচারীটি দ্বাররক্ষী, তার সমান স্তরের কর্মী প্রাইমারি স্কুলে থাকে। কিন্তু মন্ত্রীর দ্বাররক্ষী প্রাইমারি স্কুলের কর্মচারীটিকে অধস্তন মনে করে। বইমেলায় শিক্ষামন্ত্রী কোন অধ্যাপকের কাঁধে হাত দিয়ে কথা বলতে বলতে একটু হাটলে সে তো বড় হয়েই যায় তার শার্টের কলার আপনাআপনি খাঁড়া হয়ে উঠে। নারদজিরও নারায়ণ নৈকট্যে স্বাভিমান জাগ্রত হয়ে উঠল। তনি সংসারী মানুষের নিন্দা শুরু

করলেন। এরা একবারও নারায়ণের নাম করে না, কাম-ক্রোধ-লোভ অসূয়া নিয়েই ব্যস্ত আছে, ইত্যাদি বলতে লাগলেন। নারায়ণ বোধ হয় একটু মুচকি হাসলেন। ব্যাটা নারদকে তিনি একটু শিক্ষা দিতে মনস্থ করলেন।

তিনি নারদকে বললেন যে তাঁর পিপাসা পেয়েছে। একটু জলের ব্যবস্থা হয়? নারদ ভুলে গেলেন যে নারায়ণের সাধারণের মতো পিপাসা পায় না। তিনি আস্তেব্যস্তে জল আনতে গেলেন। কাছেই একটা পুকুর দেখা গেল। নারদ গেলেন ঘাটে। এক রূপসী জল নিতে এসেছেন। নারদের সঙ্গে তাব চোখাচোখি হল, না-বলা কথা হলো, প্রথম দর্শনে প্রেম হল। দেবর্ষি তাব সঙ্গে তার বাড়িতে গেলেন, কথা বললেন, রূপসীর পাণিগ্রহণ করলেন, সংসারী হলেন, পিতা হলেন, সুখ গেল, দুঃখে পড়লেন। তখন তিনি শুনতে পেলেন নারায়ণ ডাকছেন, 'কোথায় নারদ? একটু জল আন না? 'নারদ জেগে উঠলেন, যেন কত বছর পর। নারায়ণ তখন হেসে বললেন, 'নারদ, এই দীর্ঘক্ষণে কতবার নারায়ণ বলেছ?' নারদের শিক্ষা হল। তিনি বুঝলেন, অন্যের বিচার করা তার অধিকারে পড়ে না।

আমাদেরও বিশ্বদর্শন হয়ে গেল এক জায়গায় বসেই। মনে মনেই। মনই আসল কথা। আমাদের প্যারাডাইস চৌমুহুনীর চন্দনের কথা যেমন। সাত বছর বয়স। পাশের বাড়ির জেঠতুত বোন দীপালি দিদির বিয়ে। বিয়ে দেখবে চন্দন। কিন্তু বিয়ে তো রাতে। অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে তাকে সন্ধ্যায় ঘুম পাড়ানো হল এবং রাত এগারোটায় তোলাও হলো। নিয়ে যাওয়া হলো চন্দনকে গেটে। এক্ষুণি বর আসছে। কিন্তু শিশুর একি ব্যবহার? বরবেশি টোপর পরা যুবককে সে বর মানে না। বলে, 'এইটা তো মানিকদা। বর দেখাও। 'সকলের হাসি, চন্দনের চিৎকার। সাত বছরের বালকের মনের ভিতর বরের যে ছবি আছে সেটা বরের পোশাকে মানিকদা এলে মিলে না। অন্য ছবি চাই। এই ছবি নিয়েই যত গোলমাল। কত রকম বুদ্ধদেবের ছবি, খ্রিস্টানদের দু'হাজার দুশো রকম বিভিন্ন চার্চ আর হিন্দুর দেবতার তো আর সংখ্যা বলা যায় না। নিত্য নতুন পুরুষোত্তম জন্ম নিচ্ছেন, প্রণাম পাচ্ছেন আর হিন্দু আরও বিভক্ত হচ্ছে। অলম্ অতিবিস্তরেণ।

এবার ওখানে। বড় বড় অক্ষরে লেখা আর্মাগেড্ডন। দাঁড়িয়ে পড়ি কিউয়ে। কৃষ্ণাঙ্গী, মৌক্তিক দশনা, মাইক ধারিণী, বিলোল কটাক্ষী, তন্বী, তরুণী বলছেন, আগুলাই এদিকে অন্যেরা ওদিকে। ইংরেজি বুঝেন যাঁরা তারা এদিকে। দশ মিনিট দাঁড়ানোর পর দরজা খুললো, চিচিং ফাঁক। ঢুকলো সকলে। যারা ভিতরে ছিল, তারা ওদিকে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। বেশি বড় ঘর নয়, সবাই এসে দাঁড়িয়েছে। বিশাল পর্দায় সৃষ্টির আরম্ভ দেখানো হচ্ছে। কেশব ধৃত মীন শরীরং জয় জগদীশ হরে.. .। আরে না, না। এসব না। গর্জন, গলন, পতন। বিশ্বগ্রাসী ব্যাপার বটে। তবে সব ছবিতে। তাও বেশিক্ষণ নয় বোধ হয়। এবার দোতলায়। ঘরে বিচিত্র, বিকট, বিরাট সব যন্ত্রপাতি। হঠাৎ এদিকে কি জানি ভেঙ্গে পড়ে গেল। জ্বলে উঠলো আগুন। তাপ লাগছে গায়ে। অমনি ওদিকে শুরু ভূমিকম্প কাছেই একটা থাম পেয়ে জড়িয়ে ধরি। শুরু হয়ে গেছে জলোচ্ছ্বাস, জলের, গরম জলের ঝাপটা লাগছে। আগ্নেয়গিরি জেগে উঠেছে। লাভার স্রোত বইছে আমার পাশ দিয়ে, গায়ে লাগে লাগে অবস্থা। দশটি দিকের দশ দিক দিয়েই ভয়ংকর কিছু হচ্ছে। আমি ভয় পাচ্ছি। জানি এসব দর্শকের দেখার জন্য তৈরি, সব কৃত্রিম। কিন্তু জানলে কি হবে। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান এখানে পরাভূত।

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্ট ব্রহ্মানন্দ মহারাজ যেতেন এক বাড়িতে মাঝে মাঝে। বাড়ির দু'টি শিশু বড় ভালবাসত মহারাজ জেঠুকে। একদিন মহারাজ ওখানে গিয়ে বসলেন বাইরের শূন্য বসার ঘরটিতে, হাঁক পেড়ে জানান দিলেন তিনি এসেছেন। শিশুদুটি দৌড়ে এসে দেখে ঘরে সোফায় বসে একটি ভল্লুক মাথা নাড়ছে। আসলে মহারাজ ঘরে একটি কম্বল দেখতে পেয়ে সেটি গায়ে মাথায় দিয়ে মাথা নাড়ছেন। শিশুরা দরজায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ভয় পেয়ে গেছে। মহারাজ জেঠুর হাঁক শুনে দৌড়ে এসেছে। কিন্তু এখানে একি উৎপাত! বড়টি বলছে, 'জেঠু, আমি জানি তুমি জেঠু। কিন্তু তোমাকে ভল্লুক মনে হচ্ছে। আমাদের ভয় করছে। তুমি জেঠু হও।'

শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায়ও সেই অবস্থা। অর্জুন বিশ্বরূপ দেখতে চেয়েছেন। তাই প্রিয় অর্জুনকে ভগবান বিশ্বরূপ দেখাচ্ছেন। অর্জুন জানেন যে তাঁর সামনে এই বিশাল ভয়ঙ্কর রূপে শ্রীকৃষ্ণই দণ্ডায়মান। কিন্তু এই জানার কোন মূল্য নেই। এইরূপ দেখে তার হৃদয় কম্পিত, তিনি ভীত। তিনি বলছেন,

অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস।। গীতা-১১-৪৫

পূর্বে কেউ দেখেনি আপনার এই আশ্চর্য রূপ দেখে আমি আনন্দিত হচ্ছি। আবার আমার মন ভয় ব্যাকুলও হচ্ছে। (সুতরাং আপনার এই রূপ সম্বরণ করুন।) হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, আপনি প্রসন্ন হোন আমাকে আপনার পরিচিত দেবরূপ অর্থাৎ নারায়ণ রূপ দেখান।

দ্বাপরযুগের সর্বাগ্রগণ্য মহাবীর অকুতোভয় কৃষ্ণসখা অর্জুনের যদি এমন দীনদশা হতে পারে তো আমি কোন্ ছার আগরতলার প্রভাস ধর! ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের অদূরবর্তী ডিজনিল্যান্ডের এই আর্মাগেড্ডনে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ভূমিকম্প অগ্ন্যুৎপাত, জলোচ্ছ্বাস, চিৎকার সব দেখে ও শুনে ভীত হয়ে পড়েছিলাম। ক্রমে ওইসব শেষ হয়। একবার মনে হয় সংকেত সঙ্গে না থেকে ভাল হয়েছে। তার ছোট্ট বুকটাতে বড় ভয় লাগতো এখানে। বেরিয়ে এলাম আর্মাগেড্ডন থেকে। এবার আর কিছু।

বেলা ও যমুনা ঠিক করে ফেলেছেন এবার তাঁরা ওই রেলগাড়িটায় চড়বেন। আমেন, তথাস্তু, তবে তাই হোক। লাইন করে যেতে যেতে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। যাক গে। পরের ট্রেনে যাব! না। কথাটা ঠিক হলো না। ট্রেনের মতো দেখতে কম্পার্টমেন্টগুলো, নীচে চাকায় বাসের মতো টায়ার লাগানো হলেও এই যানগুলির নাম ট্রাম, এই রাইডটাকে ট্রাম রাইড বলা হয়। স্বল্পক্ষণের মধ্যেই আর একটি ট্রাম এসে দাঁড়ায়। বসা যাত্রীরা ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়, এদিকে পটাপট আমাদের দরজা খুলে, আমরা উঠে বসি। আমাদের ট্রাম রাইড শুরু হয়। শ্লথগতি যান। এখানে কেউ গন্তব্যস্থলে যাচ্ছে না, কারো হাতে কোন বাজারের থলে, ওষুধের প্রেস্‌ক্রিপশান, বা মনে দয়িতের বলা মিলনস্থানের নির্দেশ নেই। যাওয়াটাই এখানে সব। এই যে এটি ডিজনি স্টুডিওর মালখানা। কত জিনিস, কত মূর্তি, কত কলকব্জা, কত গাড়ি। এদিকে পাহাড়, বেশ উঁচু, তিরতির করে নামছে তরলিত চন্দ্রিকা চন্দনবর্ণা।' কিছু গাড়ি ঘোড়া। হঠাৎ ভূমিকম্প। পাহাড় ভেঙ্গে পড়ছে। আমাদের কম্পার্টমেন্ট উলটে যাচ্ছে। পাহাড় ঢেকে জল

নামছে। ট্রামে জল। আবার সব ঠিকঠাক। ট্রাম ঘুরে পাহাড়ের ও-পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলাম ওটা পাহাড়ই নয়; পাহাড়ের একটা চামড়া মাত্র। একটা বিরাট ঘর। কত যন্ত্রপাতি, কত লোক কাজ করছে। এবার জঙ্গল, ডাইনোসর। পুরোনো, পরিত্যক্ত, ভাঙ্গা শহর। বস্তি, বাগান, কারখানা। দশ বারো মিনিটে ট্রাম ভ্রমণ শেষ। নামো নামো। যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা উঠবে, ট্রাম চলবে, ভেঙ্গে পড়বে, জল ঢুকবে, যাত্রীরা ভীত ও আনন্দিত হবে। আমরা একটু বসি। এবার ডিজনিল্যান্ড সিনেমা প্যারেড। কিন্তু সেটা কোথায় হবে? ওয়াই আর পৃথ্বীরাজ একটি জ্যাকেট পরে জবরদস্ত চেহারা করেছেন। এগিয়ে একজন ডিজনিল্যান্ড ইউনিফর্ম-ধারীকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এই সিনেমা প্যারেডটা কোথায় হবে। মুচকি হেসে সে বলে, এই তো, আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে যাও। তাকাই এদিকে ওদিকে। ওখানে এসে জমা হচ্ছে বটে কিছু লোক।

দাঁড়াই ওখানে। ওমা! পিলপিল করে লোক এসে দাঁড়াচ্ছে পথটার দুপাশে। রক্তলাল পোশাক পরা দুই কৃষ্ণা পথের দুপাশে লোকদেরকে ঠিক করে দাঁড় করাচ্ছে, তেইশে জানুয়ারি আমাদের আগরতলায় নেতাজি স্কুলের মিছিল আসার আগে স্বেচ্ছাসেবীরা যেমন করে লোকদেরকে দাঁড় করায়। এখানে অবশ্য সেখানকার মতো ততক্ষণ দাঁড়াতে হবে না। রূপকথার দেশ থেকে সাজানো টেবল্যু বেরিয়ে আসছে আর মাঝে মাঝে পায়ে হেটে কেউ কেউ। আসছে মিকি মাউস, আসছে ডোনাল্ড ডাক, আসছে কার্টুন ফিল্মগুলির সকলে; কেউ পায়ে হেটে, কেউ গাড়ি চড়ে। আসছে সিন্ডারেলা, আসছে হাতি ঘোড়া, কত কিছু। পটাপট ছবি তুলছে সবাই। সাধারণত বেলাকে নিয়েই দৃশ্য ধরি। এবার তিনি যমুনাকে নিয়ে ওদিকে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদেরকে ছবিতে নেয়া গেল না। শেষ হয়ে গেল উত্তেজনাভরা বর্ণোজ্জ্বল ডিজনিল্যান্ড সিনে প্যারেড।

এইবার এই রাইড। গাইড মেয়েটি বলে, 'আঙ্কল, যাবে? বড্ড স্পিডে চলে এই রাইড টা। এক কাজ কর, যাও ভিতরে। দাঁড়িয়ে দেখ অন্যদের যাওয়া, তারপর চলে এসো। তাই করলাম। বাইরে এসে দেখি সতর্কবাণী, আগে চোখে পড়েনি। লিখেছে 'তোমার হৃদযন্ত্র কি দুর্বল? তবে যেও না। ঘড়ি আংটি, থলে ছিটকে পড়তে পারো। ওসব অন্যের কাছে রেখে যাও। বাচ্চা নেওয়া চলবে না।' মনে পড়ল আসার সময় ছেলের সতর্কবাণী। এখানে তো মাত্র একটা এমন রাইড। পার্কে তো এমন অনেক। ভাগ্যিস্ ওখানে যাইনি! ঠাকুর যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন।

চলুন যাই ওখানে স্টান্ট ম্যান অ্যাকশান-এ। লাইন যেখানে থামল সেটা একটা ছোট জায়গা। ওমা! এখানে কি দেখাবে? সামনে যতটা খালি জায়গা পেছনে তার চেয়ে অনেক বেশি জায়গায় মানুষ এসে ভীড় করেছে। সামনের বাঁধা তুলে নিতেই আমরা এগিয়ে যাই একটা পথ দিয়ে খানিকটা গিয়ে সামনে ডাইনে ঘুরি। রাস্তাটা সোজা গেছে। বাঁয়ে গ্যালারি, অন্তত হাজার দশেক মানুষ বসার জায়গা। ডানে একটা খালে নোংরা জল, খালের ওপারে বড় মাঠ, তার পারে একটা নিম্নমধ্যবিত্ত এলাকা। দোতলা তিনতলা বাড়ি, দোকান ইত্যাদি। একেবারে হুবহু এমন জায়গা কলকাতায় অনেক পাওয়া যাবে। মাঝামাঝি গিয়ে গ্যালারিতে সামনের দিকে বসা গেল। লোক আসছে আসছেই। মিনিট বিশেক বোধ হয় লাগল এই গ্যালারি ভরতে। ভর্তি হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে মানুষ এসে গ্যালারি ভর্তি হতে হতে একটা দু'টো করে প্রায় ত্রিশটা গাড়ি এসেছে এবং অসুন্দর ভাবে এখানে ওখানে সেখানে দাঁড়িয়েছে। ছ'সাতটা মোটরসাইকেল আরোহী ইতস্তত নিরর্থক ভাবে ঘুরছে। কিছু ফল বিক্রেতার বড় বড় ফল সাজানো গাড়ি এসেছে। মনে হয় ফলেরই বাজার বসে গেল একখানা। এবার দুজন এলেন। এক জনের কাঁধে পুরানো দিনের পেল্লায় বড় আধমনি টিভি ক্যামেরা। অন্য জনের হাতে ছোট একটা মাইক। আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে ক্যামেরা ফোকাস করেছেন একজন আর কথা বলছেন অন্য জন। বেলা আমাকে দেখায়, ওই দূরে তেতলার গায়ে আমাদের ছবি দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ ভটভট শব্দ। একটা মোটরসাইকেলের পেছনে আরেকটা ছুটছে। পেছনেরটা থেকে সামনেরটার দিকে গুলি ছোড়া হচ্ছে। সামনের আরোহী একটা গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়ল। পিছনেরটা আরোহীহীন সাইকেলের পেছনে গুলি ছুড়তে ছুড়তে এগিয়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওখানে গুলি-গোলা শুরু হয়ে গেছে। মাঠ পার হয়ে ওরা গলিতে ঢুকে গেল। প্রচণ্ড গুলির শব্দ। ওই বাড়িটাতে একজন গেল প্রাণ বাঁচাতে আর ছ'সাত জন গেল গুলি করতে করতে তার পেছনে। হতবুদ্ধি আক্রান্ত মানুষটি তিনতলার ছাদে দাঁড়িয়েও বিপদ দেখে ওখান থেকে লাফিয়ে নীচে পড়ল এবং ওর কিছু হল না। সে দাড়িয়ে হেসে গ্যালারিতে বসা আমাদেরকে স্যালুট করলো। দর্শক আমরা হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানালাম। যত কিছু হচ্ছে সব ওই উপরে তেতলার দেয়াল পর্দায় দেখা যাচ্ছে। তাও দেখছি।

কালো গাড়ি একটা চুপিসারে চলে যাচ্ছিল। তিনটে অন্য গাড়ি তার পিছু ধাওয়া করছে। একটু ডাইনে গিয়ে লাটিমের মতো ঘুরছে। অন্যগুলি থামতে না পেরে এগিয়ে গেল। আবার ঘুরে এল। একটা এসে ধাক্কা খেল এবং দুই টুকরো হয়ে গেল। দুইটা টুকরো দুই দিকে গড়িয়ে পড়ল। অন্যেরা গিয়ে দুটো টুকরোকে গড়িয়ে এনে একত্র জুড়ে দিলে গাড়িটা চলতে আরম্ভ করল। একটু চলে থামল। চালক দরজা খুলে বেরিয়ে এসে টুপি খুলে স্যালুট করলো, সবাই হাততালি দিয়ে সম্বর্ধনা জানালাম। সব পর্দায়ও দেখলাম। কে বলে চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ.....। আমরা নিবিষ্ট মনে সব দেখছি। দুনিয়ার আর কোন চিন্তা নেই মনে।

ওদিক থেকে গুলির শব্দ এগিয়ে আসছে। একটা গাড়ি আসছে। সামনে জায়গা নেই যথেষ্ট। গাড়িটা মাটির সঙ্গে ষাট ডিগ্রি কোণ করে এক দিকের দুটো চাকার উপর দিয়ে চলে সেই সঙ্কীর্ণ ফাঁক দিয়েই বেরিয়ে গেল। তার পেছনে তিনটি গাড়ি আসছে গুলি করতে করতে। ওই সঙ্কীর্ণ জায়গাটাতে নিজেরাই ঠোকাঠুকি করে ফেলল। ঘটে গেল বড় দুর্ঘটনা। জ্বলে উঠলো লেলিহান আগুন। গায়ে ছ্যাকা লাগতে লাগল আমাদের। মুহূর্তে আগুন নিভে গেল। গাড়িগুলি অক্ষত দাঁড়িয়ে। দরজা খুলে বেরিয়ে আসে চালকরা হাসতে হাসতে। সব দেখা যাচ্ছে ঐ দেয়াল পর্দায়। উল্লাসে ফেটে পড়ে গ্যালারিতে বসা হাজার দশেক দর্শক। তার মধ্যে আছি আগরতলার দুজন ও সালেমের তামিলভাষী ওয়াই আর পৃথ্বীরাজ এবং তার পত্নী কৃষ্ণা চন্দ্রমুখী শ্রীমতী যমুনা।

দুর থেকে আবার গুলির শব্দ। পুলিশ আসছে ডাকাত দলকে তাড়া করে। ওরা ওই উঁচু জায়গাটার উপর থেকে গাড়ি নিয়ে লাফিয়ে ফলের দোকানের উপর দিয়ে যেন উড়ে চলে গেল। ফলের দোকান অক্ষত। কারো কিছু হয়নি। পুলিশের গাড়ি অমন করে লাফিয়ে

ওদের পেছনে যেতে পারল না। অবিশ্রান্ত গুলি করল কিন্তু গুলি তাদের গায়ে লাগলো না। সারা পৃথিবী থেকে আসা এই বিপুল দর্শক এতক্ষণ এসব দেখলাম। সিনেমায় এসব দৃশ্য হয়। দর্শকরা ভয়ে চোখ বোজেন। এখানে স্টান্টম্যানগণ সব করে দেখালেন। সবই ফাঁকি। এত আগুন, কিছু জ্বলে না; এত বৃষ্টি কিছু ভেজে না; কেউ মরে না; এত দুর্ঘটনা, কারও কোনো ক্ষতি হয় না ; সব মেকি, সব মায়া, এসব কিছুই না।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যে ভয়ংকর সব অস্ত্রের প্রয়োগ হয়েছিল, যে অস্ত্রের ও শস্ত্রের প্রয়োগে ভারতবর্ষ বীরশূন্য হয়ে পড়েছিলেন, রাজ্যে রাজ্যে রাজধানীতে রাজধানীতে সংখ্যাহীন নারীর সিঁথির সিঁদুর মুছে গিয়েছিল, ভারতবর্ষময় আকাশ বাতাস বিধবার কান্নার শব্দে ভারী হয়ে উঠেছিল, যুদ্ধের অনেক আগে কৌরব ও পাণ্ডব ভ্রাতাগণের অস্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত হবার অব্যবহিত পরে হস্তিনাপুরে আয়োজিত রঙ্গশালায় রণশিক্ষার্থী স্নাতকগণও সেই অস্ত্রেরই প্রয়োগ দেখিয়েছিলেন সমবেত সকল দর্শনার্থীদেরকে। সেখানে ভীষ্ম দ্রোণাদি সকলে মুগ্ধ হয়েছিলেন তরুণদের রণচাতুর্য দেখে, অস্ত্রের ক্ষমতা উপলব্ধি করে অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিষণ্ণ হয়েছিলেন পাণ্ডব ভ্রাতা পঞ্চের পক্ষে জয়ধ্বনি শুনে। কিন্তু রঙ্গশালায় ব্যবহৃত অস্ত্র ও শস্ত্র সমূহ ছিল নিষ্ফল। ওরা তাদের ক্ষমতাদ্বারা কিছু ধ্বংস করেনি। কেউ মরেনি সেখানে। মুমূর্ষুর চিৎকার, আহতের গোঙানী, রক্তের বয়ে যাওয়া সেখানে অনুপস্থিত ছিল। আশঙ্কিত কুন্তী ও ধৃতরাষ্ট্র ছাড়া সকলেই ছিলেন উচ্ছ্বসিত, উদ্ধত, অহঙ্কৃত। ডিজনিল্যান্ডে আজ স্টান্টম্যানদের এই দেড়ঘন্টাব্যাপী অ্যাকশিওঁ বা অ্যাকশান ও রঙ্গশালার প্রদর্শনী। গুলিগোলা, দুর্ঘটনা, আক্রমণ, আগুন, জল, কত কিছু। তবে কেউ মরেনি কেউ আহত হয়নি। সিনেমায় এই সব মায়াকেই আসল বলে দেখানো হয়। সংসারও তেমনি। আসলে নকলে মাখামাখি। শুভঙ্করের ফাঁকি, বাহান্ন থেকে তিনশ' গেলে কত থাকে বাকি। অথবা শঙ্করাচার্য অর্ধশ্লোকে বলি আমি যা বলছে কোটি গ্রন্থে। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, জীবই ব্রহ্ম বলে দিই অন্তে।

সারাদিন সব দেখছি আর কুটুর কুটুর খাচ্ছি। থেপলা, খাখড়া, চিনা বাদাম, কাজু বাদাম, বিস্কুট, এসব। আমি তো ডায়াবেটিক। শর্করা বারণ। বেলা সহভক্ষিণী। আমার আগরতলার বাজারের থলেতে আলু, মুলা, ইত্যাদির প্রবেশ নিষেধ। এখানেও তাই। আমার সঙ্গে আমার মতোই খাচ্ছে। মাঝে মাঝে জলের বোতল খালি হচ্ছে। আমার আরও দোষ আছে। আমি বোতলপায়ী নই। আমার মা নাকি আমাকে ঝিনুক দিয়ে ছাগলের দুধ খাওয়াতেন। ফলে আমার গায়ে পাঁঠার বোটকা গন্ধ হয়ে পড়েছিল। তবে তাতে ঘন ঘন কফলাগা, কাশি হওয়া সেরে গিয়েছিল। যৌবনেও বোতল-সংস্কৃতির বাইরে মেতে আছি, অভিজাত হতে পারিনি। আমার ললাট-লিখন আমাকে যদি বা অ্যারিস্টটল দেখিয়েছে, অ্যারিস্টক্রেটদের থেকে দূরে রেখেছে। সুতরাং, আমি বোতল থেকে জল খেতে পারি না। ছেলে বাড়ি থেকে ক'টা ইউজ্ এন্ থ্রো গ্লাস দিয়ে দিয়েছে। তাই ব্যবহার করছি। আজকে আর কোথাও বসে ভোজন হল না। সময় কোথায়? আরও কত দেখার!

ওই বড় ঘরটার নাম অ্যানিমেশান কোর্টইয়ার্ড। ওদিকে দেখানো হবে কেমন করে ডিজনিল্যান্ডের আর্টিস্টরা ডোনাল্ড ডাক, মিকি মাউস, ইত্যাদি চরিত্রকে রূপায়িত করেন। ওদিকটার নাম অ্যানিম্যাজিক এখানে অ্যানিমেশন করা দেখানো হয়। এক ইন্দ্রজালের জগৎ।

বিশ্বাস না হলেও সত্য। জগৎ যেমন বিশ্বাস হলেও অসত্য। *নির্বোধেরা বিশ্বাস* করে এই জগৎ কোন শক্তি দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। *বুদ্ধিমানেরা* ভাবে সব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র *জিনিসও সৃষ্টি* করতে হয় , কিন্তু এই বিশাল বিশ্ব কেউ সৃষ্টি করেনি এমনি হয়ে গেছে, এমনি চলছে, এমনি চলবে।

কেমন করে জানি এত লোক কোথায় চলে গেল। ওই সুন্দরী মাইক হাতে নিয়ে বলছে, বন্ধ হয়ে গেছে স্টুডিও আপনারা বেরিয়ে যান, সিলভুপ্লে (প্লীজ)। গেটে গেলাম। ডান হাতের পিঠে একটা মোহর লাগাল, বলল, তোমাদের ইচ্ছে হলে এবার পার্কেও যেতে পার। টিকিট লাগবে না। এই সিলটা দেখালেই হবে। খুশি হলাম পার্কেও যাওয়া যাবে শুনে। অবাক হলাম হাতে কোনো দাগ পড়েনি দেখে। মনে পড়লো যে গত বছর বালটিমোরে হাতের পিঠে এমন সীল মেরেছিল লঞ্চে ওঠার আগে। তবে ওতে হাতের পিঠে উজ্জল ময়ূরপঙ্খী রঙের ছাপ পড়েছিল, দেখা যাচ্ছিল। এখানে তো মোটে কোন চিহ্ন নেই। দেবে তো যেতে?

হেঁটে মাঠ পার হয়ে গেলাম পার্কের গেটে। মেটাল ডিটেক্টারের মতো যন্ত্রটি দ্বাররক্ষী আমাদের হাতের উপর ধরতেই ফুটে উঠলো অদৃশ্য ছাপ সুন্দর সোনালি সবুজ রং-এ। ঢুকে গেলাম। চেয়ে নিলাম পার্ক-এর ম্যাপ একটা করে। এই সেই পার্ক যেখানে সঙ্গী ছেচল্লিশ জন এসেছেন। এবার বোধ হয় তাদের সঙ্গে দেখা হবে। কোথায় দেখা হবে কত বড় জায়গা। হেটে হেটে দেখছি। ময়দানব সৃষ্ট ইন্দ্রপ্রস্থ বোধহয় এমনই ছিল হাঁটছি তো হাঁটছিই কত জিনিস এখানে। এখানে এটি তো ওখানে ওটি। রেলগাড়ি চড়ি। ছোট রেলগাড়ি একটু পর পর স্টেশান। কোথাও নদীর উপরের ব্রিজ পার হয়ে, কোথাও পাহাড়ের তলার সুড়ঙ্গ দিয়ে কোথাও ঘন জঙ্গল শ্বাপদসঙ্কুল, কোথাও মরুভূমি পার হয়ে চলছে ট্রেন এক জায়গায় এক মহিলা উঠলেন, সঙ্গে কন্যা। বসলেন মুখোমুখি। জিজ্ঞাসা করলাম, 'দেশ কোথায়?' বললেন, 'থাইল্যান্ড। আমি বছরে একবার প্যারিসে আসি। ব্যবসায়িক সম্পর্ক আছে। আমি ডিজনিল্যান্ড আগে দেখেছি। কন্যা দেখেনি, তাকে দেখাতে এনেছি ' আমাদের এক পাক হয়ে গেল। থাই কন্যাকে নমস্তে বলে নেমে পড়া গেল আরও কত দেখার আছে। তবে রাইডগুলোকে নমস্কার। ওরা আমাদের আউট অব রাউন্ড।

পৃথ্বীরাজ যমুনা বলছেন, 'আমরা একটু বিশ্রাম করি। আপনারাও বসুন অথবা এক পাক ঘুরে এখানেই আসুন। বিশ মিনিট ' ওখানে কি? চল একটা বোট রাইড। উঠে পড়ি। বাঃ। কী সুন্দর। নদী দিয়ে বোট চলছে দুপাশে সারা পৃথিবীর দৃশ্য নাচছে গাইছে রঙিন পুতুলেরা। 'ইটস্ আ স্মল ওয়ার্ল্ড। দৃশ্য দেখে বোঝা যায় এটা গ্রিনল্যান্ড ওই ইংল্যান্ড এই ইন্ডিয়া ওই পার্শিয়া, এটা জাপান তো ওই আবাকান, ওই অস্ট্রেলিয়া এই কেনিয়া। গান ও তাল সমানে চলছে। এত ভাল লাগলো এত ছেলেমানুষ হয়ে গেলাম যে আমরা দু'জনে একবার এবং ওদের সঙ্গে আরও দুবার, মোট তিনবার গিয়ে নিলাম এই বোট রাইড, শুনলাম এই সুন্দর 'ইটস আ স্মল ওয়ার্ল্ড' গান। বড় ভাল লাগল।

টাইআর্ড। বড়ই ক্লান্ত আমরা বসি। শেষ দেখা এখানে। ফ্যান্টিলিউশন ডিজনি ফেয়ারিল্যান্ড প্যারেড। অধীর আগ্রহে ক্লান্ত শরীরে বসে আছি সিমেন্ট কংক্রিট এর এই বেঞ্চগুলোতে সকলে। মাইকে বলছে 'পনেরো মিনিটের মধ্যে আরম্ভ হবে অবিস্মরণীয়

ফ্যান্টিলিউশন প্যারেড। আর দশ মিনিট। পাঁচ মিনিট বাকি আছে। এক্ষুণি আসছে, তাকাও.. সব ডাইনে।' হ্যাঁ আসছে দুর্গা মূর্তির বিসর্জনের মিছিল বা শান্তিপাড়ার সমস্ত আলোকসজ্জা চলমান হয়ে। নয়ন সার্থক। নাহ্। কারো সাথেই তুলনা হয় না এর। সার্থক নাম Fantillusion একের পর এক চলছে আলোকময় বৃহৎ যান। দেখা যাচ্ছে আলোকময় ডোনাল্ড ডাক, মিকি মাউস, নীল দানব, নিদ্রিত নিদ্রিতা কন্যা, স্বপনপুরের রানি, বিউটি অ্যান্ড দ্য বিস্ট, কত কী! শেষ। চলো। দৌড়াও এগারোটা বিশে বাস ছাড়বে। সঙ্গের ছেচল্লিশ জনের কাউকে দেখিনি। দৌড়াও। ওই যে গেইল আসছে। গর্বের সঙ্গে বলি, কেউ এসেছে না আমরাই প্রথম?' গেইল বলে, 'সবাই এসে গেছে, তোমরাই শেষ।' বাসে ঢুকে বলি 'ধন্যবাদ, যদি আমাদের জন্য চিন্তা করে থাকো। আবার নভোতেল। রাত সাড়ে বারোটা ছেলের ফোন। কথা বলে শয্যা।

ভার্সাই

আজ ২০০৩ তিন সালের জুলাই মাসের ২৯ তারিখ; আজ আমাদের ফ্রান্স দেখা শেষ। আজ রাতে আমাদেরকে লন্ডন শহরে বার্কিং রোডের সেই জায়গাটিতে নামিয়ে দেবে বাস থেকে, ঠিক যে জায়গাটিতে ক'দিন আগে সকালবেলা আমরা পঞ্চাশটি বিভিন্ন দেশবাসী মানব-মানবী এসে দাঁড়িয়েছিলাম বাসে উঠবো বলে। সেদিন সকলে অপরিচিত ছিলাম। এই ক'দিনে অল্প-স্বল্প পরিচয় হয়েছে। আবার হয়ত পৃথিবীর অন্য কোথাও, অন্য কোন স্থানে দেখা হয়ে যেতে পারে। তখন মুচকি হেসে 'হাই' বলব। আজকালকার জগতে এরকম ভাবাটা মোটেই অপরিণত বুদ্ধির কথা নয়। পরশুদিন প্যারিসের ডিজনিল্যান্ডে তিন তিন বার যে বোট রাইড নিয়েছি শিশুদের দুনিয়ায়, এবং সেখানে যে গানটি শুনে মন-প্রাণ শীতল হয়েছে, সেটি হল 'It's a small world'. নিঃসন্দেহে এই পৃথিবীটা ছোটই বটে। সুতরাং, আবার দেখা হয়ে যাওয়া আমস্টারডামে, বুখারেস্টে, এথেন্সে, মস্কোয়, তোকিওতে বোরে'বোদুরে, অকল্যান্ডে, ব্রাসিলিয়ায় বা আগরতলায়, অসম্ভব নয়। হয়েও যেতে পারে।

গত বছর, ২০০২ সালের তেসরা জুলাই পুত্রের ব্যবস্থায় সহধর্মিণীকে সঙ্গে নিয়ে 'ওপেন টপ' বাসে চড়ে লন্ডন শহর দেখছিলাম। আগের দিন আমার আবাল্য স্বপ্নের শহর ও তীর্থস্থান কবি উইলিয়াম শেক্সপীয়ারের জন্মস্থান স্ট্রাটফোর্ড আপন আভন এবং চার্লস ল্যামের 'অক্সফোর্ড ইন দ্য ভেকেশান' এর বিশ্বদ্যালয়ে শহর দেখেছি এবং ল্যামের মতোই দরিদ্র সন্তান আমিও মনে মনে ভেকেশানের অক্সফোর্ডের ক্লাশে ক্লাশে প্রাণভরে পাঠ নিয়েছি। সেসব কথা আমার 'উলট পুরাণের দেশ—আমেরিকার কথা'য় লিখেছি। কেউ কেউ পড়ে থাকবেন। লন্ডন দর্শন শেষ করে বলেছিলাম, 'বিদায় লন্ডন! হয়ত আবার দেখা হবে, হয়ত হবে না। কাল বাড়ির পথে পাড়ি দেব।' অথচ এক বৎসর যেতে-না-যেতেই আবার ইংল্যান্ডে এসে গেছি। সুতরাং, যাঁদের সঙ্গে ফ্রান্স ভ্রমণ করলাম তাঁদের সঙ্গে আবার কোথাও দেখা হয়ে যেতে পারে আশা অসম্ভব কিছু আশা করা নয়। কি করে কী হয়ে যায়, বলা যায়?

তবে আজ ফ্রান্স দর্শনের শেষ দিন হলেও আজ আমাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম আছে। আজ আমরা ভার্সাই দেখতে যাব। ভার্সাই। অনেকে উচ্চারণ করেন ভার্সেইলিস। 'ভার্সাই' কথাটি উচ্চারণ করা মাত্রই ইতিহাসের ছাত্ররা স্থানটির কথা মনে করতে পারবে। আমার চোখের সামনে এখনই অধ্যপক শ্রীমান করুণাময় দাস-এর মুখখানা ভেসে উঠছে। অধ্যাপক মেজর করুণাময় দাস। তাঁর কাছে কোনও কথা জানতে চাইলে সোৎসাহে সবিনয়ে সব বলে। তক্ষুণি ক্লাস থাকলে, ক্লাস থেকে এসে বলে। কখনো বাড়ি থেকে ফোনে জানায়। আমি যেন করুণাময়কে ভার্সাই এর কথা বলতে দেখতে পাচ্ছি। অধ্যাপকরা ভার্সাই এর কথা বললে বলেন ভার্সাই এর সন্ধির কথা। ১৯১৯ সালের আটাশে জুন এই ভার্সাইএ পরাজিত জার্মানি (আগের প্রুশিয়া)র সঙ্গে বিজয়ী মিত্রপক্ষের বত্রিশটি দেশের সন্ধি হয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যবনিকা পতন ঘটে। বিজয়ী মিত্রপক্ষে ছিলেন ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও জাপানসহ বত্রিশটি দেশ। চীন ঐ সন্ধিতে স্বাক্ষর করেনি। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সেনেট এই সন্ধি অনুমোদন করেনি। তাই যুক্তরাষ্ট্র জার্মানীর সঙ্গে নতুন করে

সন্ধি করেছিল ১৯২১ সালে। ইতিহাস বলে যে ভার্সাই সন্ধি এক সঙ্গে প্রথম মহাযুদ্ধের ইতি টানে ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বীজ বপন করে। ভার্সাই সন্ধির শর্তগুলি জার্মানীর পক্ষে এতই অপমানজনক ও অন্যায় হয়েছিল যে হিটলারের মতো একজন দুর্দান্ত মেগালোমেনিয়াক ডিক্টেটারের উত্থান অপরিহার্য ছিল। যাক সে-কথা। আমরা তো আর ভার্সাই সন্ধির বিশ্লেষণ করতে বসিনি। আর এখন তা অবান্তরও বটে।

ভার্সাই একটি শহব। প্যারিস থেকে তার দূরত্ব এগারো মাইল বা আঠারো কিলোমিটার। ফরাসি দেশের উপযুক্ত সুন্দর ছিমছাম শহব। শহরের অদূরে বিশাল জঙ্গল আর জলাভূমি। শিকাব করার আদর্শ জায়গা। সুতবাং, সম্রাটের একটা ছোট বাড়ি সেখানে থাকা দরকার। শিকার সেরে নিশি যাপনের প্রয়োজন তো হয়। হতোও। তাই ১৬২৪ সালে ফবাসী সম্রাট ত্রয়োদশ লুই এখানে একটা শিকার-বাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন। তবে রাজারাজড়াদের তো 'বাড়ি' হয় না, তাদের হয় প্রাসাদ। প্রজার হয় বাড়ি। গরিবের হয় কুড়ে। জন গল্‌স্‌ওয়ার্দির নাটক 'জাস্টিস' এর কেন্দ্রীয় চরিত্র উইলিয়াম ফল্ডাব তার বাসস্থানকে বলেছিলেন হোল'— অর্থাৎ গর্ত। গরীব আর শিয়াল-কুকুরে তফাত কি? শিয়াল কুকুব যদি গর্তে থাকে তবে গরিবও সেখানেই থাকে। কিন্তু ত্রয়োদশ লুইতো সম্রাট ছিলেন। তাই শিকার সেরে তার যদি ভার্সাইএ রাত কাটাবার প্রয়োজন হয় সেই কারণে ভার্সাইয়ে তৈরি হল ছোটখাট একটি প্রাসাদ। বলাই বাহুল্য, ব্যবস্থা রইল নাচের, গানের, সুবার ও সুন্দবী সাকির।

কিন্তু ত্রয়োদশের পুত্র চতুর্দশ লুই যে এই ছোট্ট প্রাসাদ নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না। তা ছাড়া প্যারিসের ওই জনতার কোলাহলের মধ্যে বাস করতে তাঁব ভালও লাগছিল না। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েই তিনি স্থির করলেন সম্রাটের বাস হবে ভার্সাইতে। প্রাসাদ হবে ওখানে। তিনি এমত স্থির করতেই পাবেন। মুহম্মদ বিন-তুগলক মনে করেছিলেন রাজধানী হবে দেবগিরি; সবাইকে যেতে হবে দিল্লী ছেড়ে ওখানে। রাজাদেশ মান্য কবতে পাবল না এক অশক্ত বৃদ্ধা। কিন্তু সৈন্যেরা মানবে কেন? এক সৈনিকেব ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে নিল বৃদ্ধাকে। পুরো বৃদ্ধাটা অবশ্য পৌঁছাতে পারল না দেবগিরি' একখানা পা পৌঁছেছিল সেখানে। সম্রাট আকবরও রাজধানী সরিয়েছিলেন ফতেপুর সিক্রিতে। মহাভারতের পাণ্ডবগণ জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে খাণ্ডবপ্রস্থের উষর ভূমিতে চিফ এঞ্জিনিয়র ময়দানবের তত্ত্বাবধানে নতুন রাজধানী গড়ে তোলেন। নাম হয় ইন্দ্রপ্রস্থ আমাদের ত্রিপুবার রাজারাও ছিলেন চন্দ্রবংশীয়। তাই তাঁরাও রাজধানী সবিয়েছেন বারবাব—রাজনৈতিক সামাজিক বা অন্য কারণে। চতুর্দশ লুইও তাই করলেন, সম্রাটোচিত কাজ। রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গেলেন প্যারিস থেকে ভার্সাই-এ।

চতুর্দশ লুই-এর আমলে তৈরি ভার্সাই প্রাসাদ জগতের এক বিস্ময়। চারশো মিটাব লম্বা এই প্রাসাদে তেরো শ' কক্ষ আছে। প্রত্যেকটি কক্ষ দু'মিনিট করে দেখলেও তেতাল্লিশ ঘণ্টার দরকার। রোজ আট ঘণ্টা করে দেখলেও প্রায় এক সপ্তাহের ধাক্কা। আমরা কতটুকু আর দেখতে পেরেছি! তবু যা দেখেছি তাতেই ধন্যবাদ জানাই ঠাকুরকে। আমাদের দেশের ক'জন মানুষই দেখতে আসেন ফ্রান্স, ক'জনই বা দেখেছেন ভার্সাই প্রাসাদ? চতুর্দশ লুই এখানে রাজ-অধিষ্ঠান স্থাপন করার পর প্রায় একশ' বছর ধরে এখানেই ছিল সম্রাটদের বাস এবং প্রশাসনিক কার্যালয়। অদূরের ভার্সাই শহরও গড়ে উঠেছে তখনই।

সম্রাট কেবল প্রাসাদটি তৈরি করাননি। সঙ্গে তৈরি হয়ে উঠে একটি বিশাল উদ্যানও।

পৃথিবীতে এই উদ্যানের জুড়ি নেই। দিল্লীতে ভারতের রাষ্ট্রপতির ভবনে যে উদ্যান আছে তা সুন্দর, খুবই সুন্দর। কিন্তু সেই উদ্যানসহ সমগ্র রাষ্ট্রপতি ভবনের আয়তন সাতাত্তর একর। আর ভার্সাই প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যান? শুধু উদ্যানটিই ছ'শ পঞ্চাশ একর জায়গা জুড়ে আছে। যাঁরা উদ্যানে যান, তাঁরা যেমন ক্ষণে ক্ষণে প্রাসাদের দিকে বিমুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকেন, তেমনি প্রসাদের ভিতরের দর্শনার্থীরাও জানালায় জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরের 'হাতে আঁকা' বাগানের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। এক স্বর্গীয় সুষমা তাদেরকে যেন আচ্ছন্ন করে রাখে। আমার বাল্যকালের সমবয়সী ভোজন রসিক কৈলাশের মতো অবস্থা। স্কুলের মাঠে স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা সদ্য প্রয়াত সুরেন্দ্রচন্দ্র পালের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে স্কুলের ছাত্রদের খাওয়াবার ব্যবস্থা হয়েছিল। বিভিন্ন অন্ন, ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নাদি টেবিলে রেখে হাতা হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন সিনিয়ার দাদা ছাত্রগণ। আমাদের কাজ মাটির থালা হাতে নিয়ে এক এক জনের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো, খাদ্যবস্তু নেওয়া ও যেখানে খুশি বসে খাওয়া। যে-কোনো পদ যতবার খুশি নেওয়ার ঢালাও আদেশ ছিল। ষষ্ঠ শ্রেণীতে পাঠ কালেই আধমন আখ্যাপ্রাপ্ত কৈলাশ সেদিন কী পরিমাণ খেয়েছিল জানি না। তবে পরের তিন দিন সে স্কুলে আসেনি। চতুর্থ দিনে সে যখন এল তখন তাকে বেশ দুর্বল দেখাচ্ছিল। একজন সতীর্থ জিজ্ঞেস করল, "কৈলাশ, সেদিন ফাউন্ডারের শ্রাদ্ধের খাওয়ায় কোন পদটা তোর বেশি ভাল লেগেছিল?" কৈলাশ সত্যবাদী ছিল। মিথ্যা তার আসতোই না। নিন্দুকেরা বলতো যে মিথ্যাটা পেটে রাখতে খানিকটা জায়গা লাগে তো? তাই কৈলাশ মিথ্যাকে পেটে রেখে জায়গা নষ্ট করতো না। সেই জায়গাটাও খাদ্য দিয়েই ভরত। যাক গে। সেদিন কৈলাশ যা বলেছিল তা প্রণিধানযোগ্য। সে বলেছিল, "কি জানি ভাই বলতে পারব না। এত তাড়াতাড়ি এত জিনিস খেয়েছি যে কোনটার স্বাদ কেমন তা বুঝবার আগেই সেগুলি পেটে ঢুকে যাচ্ছিল।"

ভার্সাই প্রাসাদ ও উদ্যান দর্শনার্থী পর্যটকদেরও সেই অবস্থা। এত তাড়াতাড়ি ওরা এত জিনিস দেখেন যে অ্যাপ্রিশিয়েট করার সময় পান না। ওখানে ভালো তো সবই নিঃসন্দেহে। তবে কোন্‌টা বেশি ভাল বলা মুস্কিলও বটে। এখন ভার্সাই প্রাসাদ ও সংলগ্ন বাগান জাতীয় সংগ্রহশালা হিসাবে স্বীকৃত ও রক্ষিত। ১৬২৪ সাল থেকে এখানে ত্রয়োদশ লুই এর 'শিকার-বাড়ি' ছিল। ১৬৬১ সালে চতুর্দশ লুইএর আদেশে এখানে বড় প্রাসাদ নির্মাণ আরম্ভ হয়। সঙ্গে সঙ্গেই পাশের জঙ্গল ও জলাভূমিতে বাগান গড়ে তোলার ফরমানও জারি হয়। চল্লিশ বছর ধরে সেগুলি অতি নিপুণভাবে গড়ে ওঠে। ফ্রান্সের সেরা স্থপতি, বাস্তুকার, ভাস্কর ও চিত্রশিল্পীগণ তাঁদের সৃজনশীলতা ঢেলে দিয়ে গড়ে তুলেছেন এই সুদর্শন স্বর্গীয় মহাপ্রাসাদ ও পাশের নন্দনকানন সদৃশ উদ্যান। প্রতিদিন আসেন সারা পৃথিবীর শত শত পর্যটক এখানে, এসব দেখতে। আজ বাস থেকে নেমেই দেখলাম আরও অন্তত চল্লিশটি বাস দাঁড়িয়ে আছে— দর্শনার্থী নিয়ে এসেছে। লাইন করে আরও কত আসছে। ছোট গাড়ি কত অনুমান করে বলতে পারলাম না। হেঁটে প্রাসাদের নিকটে গিয়ে দেখি চারটে লম্বা লম্বা কিউ।

টিকিটের লাইন। সুন্দরী এক তন্বী শিখরীদশনা ললনা এগিয়ে এলেন, ভুবনমোহিনী শুচিস্মিতা হয়ে দুটি কথা বললেন (ইংরেজিতেই; ফরাসিতে বললে তো বুঝতামই না।) এবং আমাদেরকে 'এ' লাইনে দাঁড়াতে বললেন। তাই করলাম। টিকিটের মূল্য মাথাপিছু সাড়ে এগারো ইউরো। (ফ্রান্সের টাকার নাম ফ্রাঙ্ক। তবে এখন ইউরোপের ক'টি দেশ মিলে ইউরোপীয়ান

ইউনিয়ন করেছে। সেই ইউনিয়নের টাকার নাম ইউরো। ফ্রান্সে এখন দু'টোই বৈধ। তবে একাধিক দেশে চলে বলে বিদেশীরা ইউরো নিয়েই আসেন।) আমাদের দুজনের জন্য তেইশ ইউরো বা তেরোশ টাকার মতো লাগলো। ঢুকলাম প্রাসাদে। এটি অনেক ভাগে ভাগ করা। একটা দেখেই মনে হল প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে হয়। জিজ্ঞেস করে জানলাম 'তয়লেত্' ওদিকে। লম্বা লাইন। কাছে গিয়ে দেখি দক্ষিণা লাগবে। ছোট কাজের জন্য প্রত্যেকের চল্লিশ সেন্ট। এখানে মেয়ে মদ্দর পৃথক লাইন। আমার পেছনে দাঁড়ানো লোকটিও দেখতে পেলেন দক্ষিণা লাগবে। সামনে ঝুঁকে আমাকে বললেন, "আমার কাছে তো পয়সা নেই। সব আমার স্ত্রীর কাছে। তুমি আমার পয়সাটাও দেবে?" (পয়সা তো স্ত্রীর কাছে থাকাই উচিত। সারা দুনিয়াই তা করে। সুতরাং আমার পেছনের মঙ্গোলীয় দর্শন মহাশয়ও ঠিক কাজই করেছেন। যাঁরা স্ত্রীর কাছে পয়সা রাখবেন না স্থির করেন, তাদের বিয়েই করা উচিত নয়। আমার কথায় যাদের প্রত্যয় না-হয় তাঁরা জগন্মাতা অন্নপূর্ণার সামনে তার ভিক্ষুক হাজব্যান্ড বাবা ভোলানাথকে স্মরণ করুন। বুঝতে পারবেন।) বললাম, 'হ্যাঁ, দেব।' 'তয়লেতে' ছোট কাজের জন্য (তিন জনের) এক ইউরো বিশ সেন্ট, অর্থাৎ তেষট্টি টাকা দিলাম যারা বিদেশে আসবেন তাঁরা এসবের জন্য তৈরি হয়েই আসবেন। একটা কথা পাঠককে জানাতে হয়। শ্রীযুক্ত ইন্দুমতী চরণচারণ চক্রবর্তী মঙ্গোল মহাশয় মিনিট পাঁচেক পরেই চল্লিশ সেন্ট নিয়ে এসেছিলেন আমাকে দিতে, তার ঋণ শোধ করতে। বিনীতভাবে বলেছি দিতে হবে না। জিজ্ঞেস করেছি কোথা থেকে এসেছেন। তিনি কোরিয়ান তবে আমেরিকারই নাগরিক। থাকেন টেক্সাস-এ। সেখান থেকেই এসেছেন। চল্লিশ সেন্ট না নেওয়াতে অনেকবার পাশ্চাত্য মতে 'থ্যাঙ্কয়্যু' বললেন, তিনবার প্রাচ্য মতে অভিবাদন জানালেন করজোড়ে। মুচকি হেসে চলে গেলেন।

আমাদের দেশের এক রাজার গল্পের কথা মনে পড়ল। তিনি স্থির করেছিলেন দুধের এক পুকুর বানাবেন। রাজা তো, মন্ত্রী তো নন, সুতরাং তেমন ধড়িবাজ ছিলেন না তিনি। বিষয়টা তলিয়ে দেখলেন না। ভাবলেন না যে দুধের পুকুর করা সম্ভব নয়। করলেও সেটা পরদিনই দইয়ের পুকুর এবং তার পরদিন দুর্গন্ধের পুকুর হয়ে উঠবে। সেই কথা সেই কাজ। ঢেরা পিটিয়ে জানিয়ে দিলেন, 'অমুক দিন সকালে সকল গাভীর মালিক দুহিত দুগ্ধ নৃপতির পুকুরে ফেলিবে। রাজার দুধের পুকুর হইবে।' প্রজাগণ জনে জনে মনে করল সবাই তো দুধই দেবে, আমি জল ফেলব। কেউ ধরতে পারবে না।' এই করল। রাজার দুধের পুকুর জলের পুকুর হয়ে গেল। ভাগ্যিস হয়েছিল। নইলে দুধের ঐ পুকুরের দুর্গন্ধ দূর করা সহজ হত না।

ফ্রান্সের সম্রাট চতুর্দশ লুই তেমন নরপতি ছিলেন না। ভার্সাই প্রাসাদ ও উদ্যানের প্রতিটি কাজ তিনি নিজে তত্ত্বাবধান করতেন। প্রতিটি পরিকল্পনার নীল নক্সা ও তার রূপায়ণের প্রতিটা ধাপ তিনি নিজে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন। প্রতিদিন তিনি এসব দেখার জন্য বের হতেন, অন্যের উপর নির্ভর করে থাকতেন না। সেইজন্য এই প্রাসাদ ও সংলগ্ন উদ্যান এত বিশাল হয়েও এত সুন্দর ও মহিমাময় হয়ে উঠতে পেরেছে। দুধের পুকুর জলের হয়ে যায়নি।

ভার্সাই প্রাসাদ দেখতে কেমন সে বর্ণনা দেওয়া কঠিন। বলতে পারি প্রতিটি দেয়াল সমকালীন শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদের দ্বারা অঙ্কিত ক্যানভাসে ঢাকা, প্রতিটি দরজা ও জানলার কারুকার্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ বস্তু হওয়ার যোগ্য। প্রতিটি ভাস্কর্য ইউরোপের শ্রেষ্ঠ ভাস্করদের শ্রেষ্ঠ কর্ম। এখানে সামান্য কিছু বিবরণ দিচ্ছি উৎসুক পাঠকের জন্য।

সম্রাটের রাষ্ট্রীয় আবাসটি অনেকবার অদল-বদলের পর বর্তমান রূপ পেয়েছে ১৬৭১-৮১ সালের মধ্যে। সাজিয়েছেন চার্লস লা ব্রু। কক্ষগুলি সূর্য দেবতা অ্যাপলো ও তার গ্রহদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। সূর্যই ছিলেন চতুর্দশ লুইয়ের প্রতীক। ভারতীয় আমরা। সূর্যবংশ ও চন্দ্রবংশের কথা আমাদের মতো আর কে জানে? সাতটি অতুলনীয় সুন্দর কক্ষ। প্রত্যেকটির ব্যবহার নির্দিষ্ট—নৃত্য, ক্রীড়া, ভোজন, বিলিয়ার্ড, সভাসদদের আপ্যায়ন, ইত্যাদি। রাজগ্রন্থমালা, শয়নকক্ষ, সব এখানে। নীচে মর্মরখচিত ভ্রমণ স্থান (উঠান)।

দর্পণ কক্ষ বা হল অব মিরারস্‌টিকে ওঅর ড্রয়িং রুমও বলা হয়। এর দৈর্ঘ্য তিয়াত্তর মিটার, প্রস্থ সাড়ে দশ মিটার এবং উচ্চতা সাড়ে বারো মিটার। পাশেই পিস ড্রয়িং রুম। জানালা দিয়ে দেখা যায় সুন্দর বাগান। যেমন সুন্দর দেয়াল, ছাদ, ঝাড়লণ্ঠন তেমনি সারি সারি ভাস্কর্য। ১৬৭৮ থেকে ১৬৮৬ সালের মধ্যে স্থপতি জুলে হাঁর্দুমানসাঁ ও চিত্রশিল্পী শার্ল লা ব্রু এই কক্ষগুলি সাজিয়েছেন। ছাদের চিত্রগুলিতে চতুর্দশ লুই-এর কীর্তিসমূহ চিত্রিত। সম্রাট লুই চতুর্দশ প্রতিদিন এই হল অব মিরারের ভিতরে দিয়ে প্রাসাদের প্রার্থনা কক্ষে যেতেন। এই হলে তিনি বড় মানুষদের সঙ্গে দেখা করতেন, রাজ পরিবারের বিবাহাদি এখানে হত, এখানে সিংহাসনে বসে সম্রাট বিদেশী রাজদূতদের সঙ্গে দেখাও করতেন।

মহারানির নিজস্ব এলাকাটিও একই সময়ে তৈরী হয়েছিল। এখানে চারটি কক্ষ। পর্যায়ক্রমে সম্রাজ্ঞীরা এখানে বাস করেছেন। শেষ সম্রাজ্ঞী ছিলেন মারি আঁতোনিয়েঁত্। অনেক রাজকন্যাও এখানে বাস করেছেন। অনেকের ইচ্ছায় কক্ষগুলিতে অনেক পরিবর্তনও করা হয়েছে। শার্ল লা ব্রু ও অন্যান্য চিত্রশিল্পীগণ রাষ্ট্রীয় কক্ষগুলির সিলিং-এ সুন্দর চিত্র অঙ্কন করে রেখে গেছেন। প্রথম কক্ষটির নাম 'প্রাচুর্যের কক্ষ'। পরেরটি প্রেমের দেবী ভেনাসের কক্ষ। এটির সিলিং এঁকেছেন রেনে অ্যাতোয়াঁ হুসা। তার পরের কক্ষটি শিকারের দেরি ডায়ানার; এঁকেছেন গ্যারিয়েল ব্লাশা, ক্লদ অদ্রাঁ ও শার্ল দ্য লা ফশ। যুদ্ধের দেবতা মার্সের নামে পরের কক্ষটি। এটিতে এঁকেছেন ক্লদ অদ্রাঁ, জাঁ বাপ্তিস্তা জুবেনা এবং রেনে আঁতোয়াঁ হুসা। দেবতাদের দূত মার্কারির নামের কক্ষটির সিলিং এঁকেছেন শাল দ্যলা ফুশ এবং গ্যাব্রিয়েল ব্লাশা। রানির খাস কক্ষের সঙ্গে আছে আরো ক'টি কক্ষ। আগেই বলেছি যে এই কক্ষগুলির সর্বশেষ অধিকারিণী ছিলেন মহারানি মারি আঁতোনিয়েত। ইনিই প্রাসাদের সামনে সমবেত বুভুক্ষুদের সম্পর্কে বলেছিলেন যে রুটি না-জোটাতে পারলে তাদের কেক খাওয়া উচিত।

একটি কক্ষের নাম 'হল অব ব্যাট্‌ল্‌স্'। ১৮৩৭ সালে রাজা লুই ফিলিপ এটি উদ্‌ঘাটন করেন। এই জায়গাটিতে আগে রাজকুমারদের বিশ্রাম-কক্ষ ছিল। একশ বিশ মিটার লম্বা। তেরো মিটার পাশ ও বারো মিটার উঁচু এই কক্ষটি। ল্যুভর মিউজিয়ামের অনুকরণে গড়া এই কক্ষটিতে ফ্রান্সের বিভিন্ন বিজয়ের ইতিহাস চিত্রিত আছে। তেত্রিশটি বিশাল চিত্রে ৪৯৬ খ্রিঃ তেলেরিয়াক যুদ্ধে ফ্রান্সের বিজয় থেকে শুরু করে ১৮০৯ খ্রিঃ ওয়াগ্রাঁয় ফ্রান্সের বিজয় পর্যন্ত যুদ্ধ চিত্রিত আছে। বিরাশিটি আবক্ষ মূর্তি আছে বিখ্যাত সামরিক বীরদের। ষোলটি ব্রোঞ্জের প্লেইক (plaque) আছে সেই বীরদের নামে উৎসর্গীকৃত যাঁরা ফ্রান্সের জন্য প্রাণত্যাগ করেছেন। যাত্রা শেষ হয় ১৮৩০ সালের ঘরে সেখানে দেখি জুলাই বিপ্লব দমনের পর বুর্বোঁ বংশের ছোট শাখার উত্তরাধিকারী রাজা লুই ফিলিপ দ্য অর্লিয়ঁ সবিক্রমে ভার্সাই প্রবেশ করছেন। হায়রে ইতিহাস! কোথায় সেই বিক্রম!

বাইরে আছে সেই উদ্যান—জগদ্বিখ্যাত, অতুলনীয়, ভার্সাই উদ্যান। সাড়ে ছ'শো একরের এক বিশাল উদ্যান। সাড়ে ছশ একর মানে এক বর্গমাইল বা আড়াই বর্গ কিলোমিটারেরও বেশি।

চতুর্দশ লুই প্রাসাদ ভালবাসতেন। প্রাসাদকে ফরাসি ভাষায় বলে 'শ্যাতু' (Chateau). কিন্তু শ্যাতুর চেয়েও বেশি ভালবাসতেন বাগান। কিন্তু শুধু ভালবাসতেন বললেই সব বলা হয় না। কত কি ভালবাসতেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সৃষ্টি 'নন্দলাল' এবং 'হতে পাত্তেম' এর বক্তা। সম্রাট লুই তেমন ছিলেন না। তিনি করিৎকর্মা ছিলেন। মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত তিনি তাঁর উদ্যান ও প্রাসাদ নির্মাণের তদারকি করে গেছেন নিরলসভাবে; হেঁটে বেড়িয়েছেন কাজের জায়গায়, যে কাজটাই শেষ হয়েছে সেখানেই উৎসব করে সকলকে তা দেখিয়েছেন, নিমন্ত্রণ করে এনেছেন সম্মানীয় প্রজাবর্গকে ও বিদেশী রাষ্ট্রদূতদেরকে। গ্রিক ও রোমান শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে তুলে এনে বসিয়েছেন সেই চরিত্র সকলকে তাঁর উদ্যানে, মর্মর, অ্যালাবেস্টার ও কষ্টিপাথরে তাঁর নন্দন কাননে। কত নগ্না কত অর্ধনগ্না, কত স্খলিতবসনা দেবী ও কত অশ্বারোহী, পক্ষধারী, অস্ত্রসজ্জিতা দেবী, দেবতা, মানবী ও মানব মূর্তি যে ভার্সাই উদ্যানে বসে, দাঁড়িয়ে বা হাঁটতে আছেন তাঁর আর হিসেব নেই।

১৬৬১ সালে চতুর্দশ লুই খ্যাতনামা স্থপতি লুই নতর্‌কে উদ্যান নির্মাণের ভার দেন। প্রাসাদের সঙ্গে সঙ্গে উদ্যান নির্মাণও চলে চল্লিশ বছর ধরে। আঁদ্রে লুই নতর্‌ একা এই কাজ সামলাননি। সঙ্গে নিলেন বিখ্যাত ক'জনকে। তাঁরা হলেন জাঁ বাপ্তিস্ত কোল্‌বা, শার্ল, লাব্রু, জুলে হার্দু মাসা ও লুই লা ভাউ। প্রতিটি প্ল্যান সম্রাটের কাছে দিতে হত। তিনি সব খুঁটিনাটি দেখতেন। বাগান তৈরির মত এত বড় কাজ ফ্রান্সে আগে আর কোন দিন হয়নি। আগে এখানে ছিল জঙ্গল, মাঠ, টিলা ও জলাভূমি। সেখানে গড়ে উঠেছে ল্যান্ডস্কেপ, কমলা বাগান, খাল, ঝরনা আর ফোয়ারা। কত মাটি আনতে হয়েছে, কত সরাতে হয়েছে, তার হিসাব কে রাখে? গাড়ি করে মাটি যেমন এনেছে, তেমনি ফ্রান্সের সমস্ত অঞ্চল থেকে এনেছে নানা গাছের চারা। হাজার হাজার শ্রমিক, কখনো কখনো বা সেনাবাহিনীর পুরো রেজিমেন্টকে কাজে লাগাতে হয়েছে। কত খরচ, তার হিসাব কে রাখে। এই ঠেলা সামলাতে ভারতে দুপ্লে সাহেব ওই ক্লাইভ ওয়ারেন হেস্টিংসদের সঙ্গে পেরে ওঠেননি অর্ধ শতাব্দী পরেও। ঠিক মতো অর্থের যোগান পাননি যে। তবে তার জবাব দিয়েছে ফ্রেঞ্চরা ইংরেজের বিরুদ্ধে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করে। 'ইটস্ অ স্মল ওয়ার্ল্ড' বটে।

বিশাল এই উদ্যানের কতটুকুই বা বলি, কতটুকুই বা বলবার ক্ষমতা ধরি! ওই ফোয়ারটির নাম দ্য ফাউন্টেইন অব্ অ্যাপলো'। পূর্বমুখী প্রস্রবণ। চারটি তেজস্বী অশ্ববাহিত রথে উপবিষ্ট সূর্যদেব গভীর গহন থেকে উঠে আসছেন—উদয় হচ্ছেন তাঁর দৈনিক পরিক্রমার জন্য। ট্রাইটনরা সকলে শঙ্খধ্বনি করছে। আপনি কি হিন্দু? প্রণাম করুন উদীয়মান বিবস্বানকে, বলুন, 'জবাকুসুমসংকাশং কাশ্যপেয়ং......'

এটি কমলা বাগান। এটির স্রষ্টা লুই লা ভাউ। একশ সিঁড়ির এই উত্থান মঞ্চ, ওইদিকের ওই বেষ্টনী, এসব ঊনবিংশ শতাব্দীতে বদলে ফেলা হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীতে সংস্কার করা হয়েছে এবং লা নতর্ এর মূল প্ল্যানকে আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এমনটি বিশ্বে আর কোথাও নেই। দর্শকগণ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন এখানে।

ওদিকেরটি অ্যাপলোর স্নানাগার। সূর্যদেবকেও স্নান করায় পাশ্চাত্যের স্বপ্নবিলাসী মানুষ। সারাদিন ধরে আকাশ বিহার করে ক্লান্ত তপনদেব রাতে বিশ্রাম করতে যাওয়ার আগে স্নান করবেন। কী চেহারা এই সূর্যদেবের আর কী দুর্দম এই অশ্ব চতুষ্টয়! এই স্নানাগারের পরিকল্পনাকার হার্বের রুবের। এদের ভাস্কর ছিলেন গুয়েরিও গিরার্দো। লাবণ্য ও তেজস্বিতার অনবদ্য সমন্বয় সব মূর্তি।

এখানে আছে ফাউন্টেইন অব নেপচুন। সমুদ্র-দেবতার শক্তি এর মধ্যে রূপায়িত। এটির পরিকল্পনা হার্দু মাঁশার এর। এটি চতুর্দশ লুইয়ের আমলে শুরু হলেও তাঁর আমলে শেষ হয়নি। এটির অসমাপ্ত কাজ শেষ করার জন্য পঞ্চদশ লুই আদেশ দেন এবং ১৭৩৮ থেকে ১৭৪১ সাল পর্যন্ত কাজ করে শেষ করেন অ্যাডামলেময় ও বোশাবর্দো।

ফাউন্টেইন অব লা তুনা একটি বড় আকর্ষণ এখানে। এই বিশাল ফাউন্টেনটি লা তুনার প্রাচীন কিংবদন্তি নিয়ে গড়া। দেবরাজ জুপিটারের মানবী প্রেমিকা লাতুনার কাহিনী। দেবরাজ তো প্রেমিকার জন্য আইক্লানের গ্রাম্য কৃষকদেরকে কূর্ম আর মণ্ডূক করে দিলেন। সেই কাহিনী এখানে প্রস্তরে রূপায়িত।

ফাউন্টেইন্ অব্ বাক্কাস। মদিরা ও নেশার দেবতা বাক্কাস। সবুজ গালিচা এই শষ্পাবৃত ভূমি। চারদিকে চারটি ফোয়ারা চারটি ঋতুর প্রতীক। এখানে ঋতু চারটিই—গ্রীষ্ম, শরৎ, শীত, আর বসন্ত। মদিরা ও নেশার দেবতা বাক্কাসের ঋতু শরৎ। উপবিষ্ট বাক্কাস স্যাতুর (satyr)-দের দ্বারা পরিবেষ্টিত। স্যাতুরেরা কেউ আঙুর খাচ্ছে। আর কেউ নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন, বাহ্যদশা লুপ্ত, বিস্রস্ত।

ভার্সাই উদ্যানের এদিকে সেদিকে কত পথ ঢুকে গেছে জঙ্গলে। সেখানে বিটপী আর লতায় তৈরি হয়েছে কুঞ্জ। বাইরে থেকে বোঝাই যায় না কিছু আছে ভিতরে। কিন্তু ভিতরে প্রমোদকক্ষ আছে, বিলাস-ব্যসনের ব্যবস্থা আছে এবং সুরা ও সাকী আছে। সৌন্দর্য-দর্শন-শ্রান্ত অতিথিগণ ওই কুঞ্জে চলে যেতেন, পানভোজন করতেন ও সঙ্গীত নৃত্যাদি বিনোদনের পরে জানু ও কৃশানুর উষ্ণতায় নিদ্রা যেতেন।

শেষ। আবার বাস। বধূমাতা মুদিতার সযতনে সাজিয়ে দেওয়া থেপলা, খক্কার, বিস্কুট, চীনা ও কাজুবাদাম, সব শেষ। সুতরাং তিনটার সময় বাস এক জায়গায় থামলে নেমে রেস্তঁরায় উদরপূরণ করতে হল। নিরামিষ প্রায় কিছুই নেই। এক প্লেট পাস্তা, এক গ্লাস অরেঞ্জ জুস ও এক বোতল কোক-সাঁস সুকর (চিনি নেই)-এর সদ্ব্যবহার করা হল। এসব খেয়ে কোক-এর বোতল যখন শেষ হল তখন ফেরি জাহাজ ডোভার এসে গেছে। আবার বাস। এবার বাস ছাড়বে। বাস থেকে নেমে বাইরে গিয়ে সঠিক জায়গায় খালি বোতল ফেলে ভিতরে এসে সীটে বসে হেসে ফেললাম। প্রত্যেক সীটের পাশেই ঝুলছে পলিপ্যাক, এসব ফেলার জন্য। মনে ছিল না।

আবার লন্ডনের বার্কিং রোড। ছেলে বউমা এসেছে। মুদিতা খিচুড়ি ও ভাজা নিয়ে এসেছে। এখনো গরম। আমরা আমিষ খাই না বলে এদেরও বাড়তি পরিশ্রম। নব্বই মাইল (প্রায় দেড়শ কিলোমিটার) স্পিডে গাড়ি চলছে ইপ্সউয়িচের দিকে। আমরা আরও বেশি স্পিডে খিচুড়ি ও ভাজা মধ্যপ্রদেশে চালান করে দিলাম।

"জয় রামকৃষ্ণ"

কেমব্রিজ

'আফনেরা বাঙালি?' বিদেশে এমন জিজ্ঞাসা শুনতে বড় ভাল লাগে। আজ ত্রিশে আগস্ট ২০০৩ বিকেল সাড়ে সাতটায় ক্যাম নদীর কাছাকাছি রাস্তায় হাটতে হাটতে এই জিজ্ঞাসা শুনে আমাদেও খুব ভাল লাগলো। একটু আগেও নদীব তীরে কিসাইড (Quayside) রেস্তরাঁয় বিশাল প্রাঙ্গণে বড় ছাতার তলায় বসে পানীয়ের গ্লাসে আয়েসে চুমুক দিতে দিতে দীর্ঘক্ষণ হাঁটার ক্লান্তি দূর করছিলাম। পিতা ও পুত্রের হাতে বড় স্টারবাক কফির আব শাশুড়ি বেলা ও বউমা মুদিতার হাতে সমান বড় গ্লাসে শীতল পানীয় ফ্রাপোচিনো। প্রায় আধঘণ্টা বসে পানীয় শেষ করে, কাগজের কাপ-টিসু ইত্যাদি নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলে, তবে উঠে এসেছি। আস্তে আস্তে হাঁটছি, একটু দূরে ওই কিংস কলেজেরও পরে দক্ষিণা দিয়ে গাড়ি রেখে আসা হয়েছে। সেখানে গিয়ে গাড়িতে বসে ফেরা হবে বাড়িতে। তখনই আবদুস সামাদ ভাইয়ের প্রশ্ন, 'আফনেরা বাঙালি?' কিন্তু সেই গোলমাল হয়ে গেল। মাঝখান থেকে গল্প শুরু করলে কেউ বুঝতে পারে? কিন্তু আমার যে মনে থাকে না। প্রথম থেকে সব গুছিয়ে সুধাবঞ্জন ভট্টাচার্যের মতো সুন্দর করে আমি কিছুতেই শুরু থেকে শুরু করতে পারি না। শ্রোতা বা পাঠকের বিস্মিত দৃষ্টি চোখে বা মনে পড়লে তবে আবার গুছিয়ে বলতে যাই। এবাব সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে দ্বিতীয়বার আরম্ভ করছি।

ছেলের বাড়িতে এসেছি। ইংল্যান্ডের ঈস্ট অ্যাঙলিয়া অঞ্চলের ইপ্সটইচে আছি। প্রায় প্রতিদিন ছেলে বউমা এখানে ওখানে নিয়ে যাচ্ছে। বেরি সেন্ট এডমান্ডস, ওরওয়েল হেইভেন, লোয়েসটফট, ইত্যাদি কত জায়গাই দেখা হল। গিয়েছিলাম ওই বাকিংহামশায়ারে রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেন্টারেও। জন্মাষ্টমী উৎসবে। সেখানই 'শ্যাম নাম' শুনলাম। কাণ্ড বটে। রামকৃষ্ণ আশ্রমে প্রতি একাদশীতে 'রামনাম' হয়। কিন্তু ঠিক একই রকম 'শ্যামনাম' ও আছে, গীতও হয়। আমরা জানি না। অনেকেই নিশ্চয় জানেন। আমরা শুনলাম ও জানলাম ইংল্যান্ডেব বাকিংহামশায়ারে, রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেন্টারে জন্মাষ্টমী উৎসবে যোগদান করে। সেদিন ছিল ২০০৩এর ১৭ই আগস্ট, রবিবার। না, কেউ পঞ্জিকা খুলে তারিখ মেলাবেন না। মিলবে না। বিদেশে পঞ্জিকা মিলিয়ে উৎসব করা যায় না। গত বছর আমেরিকায়ও দেখলাম। উৎসব হয় উইক-এন্ডে। পঞ্জিকায় উল্লেখিত দিনের কাছাকাছি কোন শনি রবিবারে। বিদেশে মানুষ ঘড়িদাস, সময়ানুবর্তী, কর্তব্যপবায়ণ। তা ছাড়া তাঁরা উৎসব স্থানে আসেন বহু দূর থেকে। আমরাই তো গিয়েছিলাম ১১২ মাইল বা ১৭০ কিমি দূর থেকে। কিন্তু মন আমার পাগলা ঘোড়া, দিশাহীন তার ঘোরাফেরা, কোথা থেকে কোথায় নিয়া যায়। আবার বেলাইন করে ফেলল। আবার ভুলে গেলাম গোড়ার কথা বলতে!

এসেছি কেমব্রিজ শহরে, বিশ্ববিদ্যালয় শহর কেমব্রিজে। ছোট শহর তো। আবার দ্রষ্টব্য বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলটি যে জায়গায় কেন্দ্রীভূত সেটি আরও ছোট। গাড়ি পার্কিং এলাকায় রেখে পায়ে হেঁটেই সব দেখতে হয়। বয়সও হয়েছে আর আমরা তো আর জটাবাবা শ্রীমৎ বৃন্দাবনবিহারী দাসজী নই যে চলাতেই আনন্দ। আমরা দু' আড়াই ঘণ্টা হাঁটলেই ক্লান্ত হয়ে

পড়ি। তাই কিংস কলেজ, কুইন্স্ কলেজ, ট্রিনিটি কলেজ, কর্পাস ক্রিস্টি, ডিপার্টমেন্ট অব ল্যান্ড ইকনমি, থিয়োলজি দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে কিসাইড রেস্তরাঁয় বসে গিয়েছিলাম। এখানে জিনিসের দাম শুনলে মাথা ঘুরে যায়। এক গেলাস কফি ১.৫০ পাউন্ড বা ১১৭ টাকা আর এক গেলাস ফ্রাপোচিনো ২.৫০ পাউন্ড বা ১৯৫ টাকা। ইদানিং অবশ্য ক্রমাগত পাউন্ডকে টাকায় রূপান্তরণ করার অভ্যাস ছেড়েছি। ছেলে হাসে, বকা দেয়। তবু অভ্যাস কি সহজে যায়? এই যে ক্যাম নদীতে আয়তাকার ছোট নৌকায় লোকে নৌকাবিহার করছে এরই খরচ কত! নদীতে জল কম, সবাই লগি দিয়ে নৌকা চালাচ্ছে, বৈঠা বা দাঁড় নেই। এই নৌকা ভাড়া করে নিজে চালাতে পার-- ভাড়া ঘণ্টায় বিশ পাউন্ড বা ১৫৬০ টাকা। আর ওরা চালালে ঘণ্টায় মাথাপিছু দশ পাউন্ড বা ৭৮০ টাকা। লগি ঠেলে নৌকা চালানোকে বলে পান্টিং। বাল্যকাল কাটিয়েছি কিশোরগঞ্জে, আমার কাছে পান্টিং নতুন নয়। আর ঠান্ডাও বেশ। টি. ভি. বলছে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস, তাই গেলাম না।

১২০৯ খ্রিস্টাব্দে রাজা জনের শাসনকালে একদল বিদ্রোহী ছাত্র অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে যায়। তাদের নিয়েই কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু। কিন্তু কেমব্রিজ ক্রমে স্বনামে খ্যাত হয়ে জগৎবিখ্যাত হয়। সারা বিশ্বে ব্রিটেনের যে বিদ্যার খ্যাতি তার মূলে অক্সব্রিজের দানই অধিক। কিন্তু বাগদেবীর অধিষ্ঠানে লক্ষ্মীদেবীর বদান্যতা বিশেষ প্রয়োজন। কেমব্রিজে লক্ষ্মীদেবী তার দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করেছেন যাঁর মাধ্যমে তাকে কেমব্রিজ বড় শ্রদ্ধায় স্মরণ করে, বড় সহৃদয়তার সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। তাঁর নাম লেডি মার্গারেট বিউফোর্ত। এক অসাধারণ মহিলা ছিলেন লেডি মার্গারেট। বারো বছরে তার বিয়ে হয়েছিল, তেরো বছরেই বিধবা হন। পেটে তার সন্তান। সেই সন্তানই টিউডর বংশের প্রথম রাজা হেনরি টিউডর। লেডি মার্গারেট টিউডর বংশের জন্মদাত্রী। কেবল পুত্রকেই রাজা হতে দেখেননি, পৌত্র অষ্টম হেনরির রাজ্যাভিষেকও দেখে গেছেন। কিন্তু কত কষ্ট না সইতে হয়েছে তাকে। অসহায়া কিশোরী মাতা কেবল পুত্রটিকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আরও দুবার বিয়েতে রাজি হয়েছেন। তাকে বিশ্বাসঘাতক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, তাঁর সম্পত্তি ছিনিয়ে নিয়েছে, তাঁর বংশপদবী কেড়ে নিয়েছে ওরা। তবু তিনি পুত্রের সিংহাসন প্রাপ্তি লাভে কৃতকার্য হয়েছেন। কেবল টিউডর বংশের প্রতিষ্ঠাই নয় বহু সৎকর্ম করে গেছেন তিনি। শ্রদ্ধা, নিরহঙ্কার, বিদ্যোৎসাহিতা, ইত্যাদি নানা গুণ ছিল তাঁর। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর নাম সবার উপরে।

তখনকার দিনের বিখ্যাত বিশপ জন ফিশার ও লেডি মার্গারেটের পরিচয় ও সাধনার কথা পড়লে বারম্বার আমাদের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও রানিমা রাসমণির কথা মনে পড়ে' কেমব্রিজে সেন্ট জন কলেজের প্রধান দরজার দুপাশে বিশপ জন ফিশার ও লেডি মার্গারেটের জীবন্তপ্রায় মর্মরমূর্তি দাঁড়ানো আছে। সেখানে বিশপের পায়ের তলায় পাপ ও লেডির পায়ের তলায় অজ্ঞান মর্দিত হচ্ছে। যিনি এই মূর্তি তৈরি করেছেন তাঁর কল্পনাকে শ্রদ্ধা জানাই। এমন সুন্দর ও সঠিক কল্পনা খুব কম মানুষেরই থাকে। শুনেছিলাম যে এক শিল্পী বিদ্যাসাগর ও মধুসূদন দত্তের একটি ছবি এঁকেছিলেন। তাতে বিদ্যাসাগর ছিলেন কোট প্যান্ট পরা এবং দত্তকবি ছিলেন ধুতি চাদরে। সুন্দর ও সঠিক চরিত্র চিত্রায়ণ ছিল সেটি। এই কেমব্রিজে মর্মর মূর্তিদুটির ভাস্করও তেমনি সুন্দর ও সঠিক কল্পনা করেছিলেন। 'কেমব্রিজ খ্রিস্টিয়ান হেরিটেজ'

নামের সুন্দর রঙিন পুস্তিকাটিতে আছে যে, 'লেডি মার্গারেট বিউফোর্ত (১৪৪৩-১৫০৯) ছিলেন এই কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বড় পৃষ্ঠপোষক।' তিনি অক্সফোর্ড এবং কেমব্রিজ বিদ্যালয়ের অর্থ দান করে ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করেন। কেমব্রিজে লেডি মার্গারেট প্রফেসর অব ডিভিনিটি নামক এই পদে প্রথম বৃত হন জন ফিশার। যাঁরা ইংল্যান্ডে ও ইউরোপে খ্রিস্টধর্মের ইতিহাস জানেন, তাঁরাই নাম জানেন ডাচ মানবতাবাদী ও পণ্ডিত ইরাসমাসের। এই বিখ্যাত পণ্ডিত ফিশারের পরে আসেন কেমব্রিজে। তিনি প্রথমে প্রফেসর অব ডিভিনিটি ও পরে প্রফেসর অব গ্রিক হয়ে অধ্যাপনা করেন এখানে। লেডি মার্গারেট কেমব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজও প্রতিষ্ঠা করেন। কুইনস্ কলেজটিও তার বদান্যতায় হয়েছে।

এখানে একটি কৌতুকপ্রদ ও প্রণিধানযোগ্য কথা জানানো দরকার। লেডি মার্গারেটের দানশীলতা বিশেষভাবে দুটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল—বিদ্যার প্রসার ও খ্রিস্ট ধর্মের প্রচার। দু'টি ক্ষেত্রেই দাক্ষিণ্য অকুণ্ঠভাবে তিনি ঢেলে দিয়েছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে উপকৃতদেরকে তিনি দায়বদ্ধ করে গেছেন। তাদের দায় লেডি মার্গারেট ও তার পরিবারের সদস্যদের আত্মিক উন্নতি ও উদ্ধারের জন্য দৈনিক প্রার্থনা করা। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। দানশীল ব্যক্তিগণ সদাই বিদ্যায়তনে, ধর্মপ্রচারে এবং সহায়সম্বলহীন মানুষের আশ্রয়স্থলে (Alms Houses) দান করে এসেছেন। এদের অনেকে যেমন ছিলেন রাজপরিবারের সদস্য, তেমনি অনেকে ছিলেন সাধারণ ধনাঢ্য ব্যক্তিও। কিন্তু তাদের দান কখনো অকুণ্ঠভাবে কেবল মানব হিতৈষণার জন্য হত না। সর্বদাই তারা দান করে নিজেদের উদ্ধারের বা অন্য কোনো ইচ্ছপূরণের প্রার্থনা জানান। সুতরাং, লেডি মার্গারেটের উপকৃতদের তাঁর নামে প্রার্থনা করার দায়বদ্ধতার কথা শুনে, কেউ অবাক হবেন না। আমাদের নিজেদের কথা মনে রাখবেন। দুর্গাপূজায় শ্রীশ্রী চণ্ডীর অর্গলা স্তোত্র মনে করবেন। 'রূপং দেহি জয়ং দেহি, যশো দেহি দ্বিশো জহি, বলেই শেষ হয় না, 'ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি' পর্যন্ত বলা হয়। আশ্রমে ক'টি মুদ্রা দিয়েই ছোট্ট এক টুকরো কাগজে নাম ও গোত্র লিখে দেওয়া হয়। মায়ের (কালীর) বাড়িতে মাটির হাঁড়িতে প্যাড়া পূজা দেবার সময়ও হাঁড়ির গায়ে নাম গোত্র লেখা হয় একই কারণে। বহু শত বৎসর চলে গেছে লেডি মার্গারেটের পরে, এখন আর প্রতিদিন তাঁর নাম প্রার্থনায় আসে না। তবে এখনো বছরে একদিন সকলে সমবেত হয়ে প্রার্থনা করেন লেডি মার্গারেটের নামে। রাজা হেনরি টিউডর বা অন্য অনেকে যে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি এত দাক্ষিণ্য দেখিয়েছেন তার মূলেও যে লেডি মার্গারেটের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা বলাই বাহুল্য।

ভারতের আদর্শ তার ঐতিহ্যে বিধৃত। আজকাল 'ইকুয়ালিটি বিফোর ল' কথাটি খুব জনপ্রিয়, কিন্তু এটা কথার কথা। প্রথমত, লোকসভায় এবং বিধানসভায় বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করে জনগণের বিভিন্ন অংশকে বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে বেশি সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হচ্ছে এবং অন্য অংশকে আনুপাতিকভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে। সুতরাং, দেখাই যাচ্ছে যে মুখে 'আইনের চোখে সকলেই সমান' বললেও আইন দ্বারাই মানুষকে সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। অন্যদিকে আইনের ঘর আদালতে বিচার পেতে হলে পয়সা থাকতে হয়। পয়সা আছে বলে প্রকাশ্যে অপরাধ করেও বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায় অপরাধী। রাজনীতির লোক হলে তো কথাই নেই। আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে চলে। অন্যদিকে গরিব হলে, কালো কোটের

ইন্দ্রজালে অপরাধ না করেও জেলে যেতে হয়। 'সবার উপরে' সিনেমার কাহিনীটি কেবলই কাহিনী নয়। প্রাচীন ভারতে এমন ছিল না। আজকাল প্রগতিশীল রাজনীতির কল্যাণে সকলেই 'মনু সংহিতা'র নাম জানেন। সকলেই মনে করেন যে এটি একটি ঘৃণার্হ বুর্জোয়া স্বার্থ রক্ষাকারী আইনী বই। প্রায় কেউই জানেন না যে 'মনুসংহিতা'য় কেমন বিধি আছে। এখানে সেসব বলার কথা নয়। তবু একটি কথা বলি। ওই সংহিতায় আছে যে অপরাধীর প্রাপ্ত শাস্তি তার জাত অনুসারে কম বেশি হয়। একই অপরাধে শূদ্রের যা শাস্তি হবে, বৈশ্যের আরও বেশি হবে, ক্ষত্রিয়ের তারো বেশি এবং ব্রাহ্মণের সবচেয়ে বেশি হবে। কারণ যে জেনেশুনে অপরাধ করে তার শাস্তি অজ্ঞজনেব চাইতে বেশি হবে। অবশ্যই 'মনুসংহিতা'য় অন্য রকম কথাও আছে যা পরিতাজ্য। কিন্তু বেগুনের বোঁটা সিদ্ধ হয় না বলে পুরো বেগুনটাই ফেলে দিচ্ছেন রাজনীতির পণ্ডিতেরা ; অজ্ঞতার জন্য নয়, ধূর্ততার কারণে।

বলেছি যে রাজপুরুষেরা বা ধনাঢ্যেরা ভারতেও দান করে আসছেন ও প্রতিদান চেয়েছেন। কিন্তু একথা সর্বাংশে সত্য নয়। গীতায় আছে, তিন রকম দানের কথা—সাত্ত্বিক, রাজসিব ও তামসিক দান :

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীযতেহনুপকাবিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্।।
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পবিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসংস্মৃতম্।।
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীযতে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্।। (গীতা - ১৭ : ২০-২২)

দান করা কর্তব্য এই ভেবে যিনি দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করে অনুপকারী কোন মানুষকে দান করেন, তবে তার হয় সাত্ত্বিক দান বা শ্রেষ্ঠ দান। মনে কষ্ট রেখে, প্রত্যুপকারের আশায় বা ফলের দিকে লক্ষ্য করে যে দান করা হয় তাকে রাজসিক দান বলা হয়। (বেশিরভাগ দানই এই রকম) যে দানে কোনো সৎকার চিন্তা নেই, অবজ্ঞার সঙ্গে যা দেশ কাল পাত্র বিবেচনা না করেই দেওযা হয়, তা হল তামসিক দান।

মনে আছে ছোটবেলায় রশিদ চাচা বলতেন, 'খাঁটি মুসলমান দান করবে ডান হাতে, এমনভাবে, যে তাঁর বাম হাত জানবে না সে দানের কথা।' দান যদি প্রকাশ্যে, ঘোষণা করে বা কোনো কিছু পাওয়াব জন্য করা হয় তবে তাকে আর দান বলি কেমন করে? তা হয় যশ, খ্যাতি, হাততালি ইত্যাদি পাওয়াব মূল্য। ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য, পূজার প্যান্ডেলের দ্বারোদঘাটনের জন্য যে মোটা দান করা হয় তাও এই পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু মন্দির, মসজিদ, গির্জায়, হাসপাতালে রাখা দক্ষিণা বা দানপাত্রে, বা রেডক্রস বা টি বি সিলের কৌটায় যে দান দেওয়া হয় তাব কথাও মনে রাখতে হয়। ঐগুলি অপ্রকাশ্যেই দেওয়া হয়। এখানে নাম ঘোষণা হয় না। আসলে নিরাকার ঈশ্বরের ধারণা যেমন কঠিন, তেমনি গোপনে দান করাও কঠিন। দানের সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তেমন দাতা ছিলেন। প্রত্যাশাশূন্য দাতার তিনি ছিলেন মূর্ত প্রতীক।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর নাটক 'শাহজাহান'-এ একটি বড় খাঁটি সত্য কথা বলিয়েছেন

আওরঙজেবকে দিয়ে পুত্র মুহম্মদ যখন অস্বস্তিকর প্রশ্ন করে যাচ্ছেন তখন সরাসরি সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে পিতা মোগল বংশের সবচেয়ে বেশি স্বার্থপর কূটনীতিবিদ সম্রাট আওরঙজেব, পুত্রকে বলেছিলেন 'রাজনীতি বড় কূট। এ বয়সে তা বুঝবে না।' যে জন ফিশারের কথা একটু আগেই বলেছি, যিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এত কিছু করেছিলেন, তাঁর জীবনীও জানান দেয় যে 'রাজনীতি বড় কূট'। ফিশার বিশপ হয়েছিলেন রচেস্টারএ। তিনি চ্যান্সেলার ছিলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের। ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি অষ্টম হেনরির রোষানলে পড়েন এবং কাঠগড়ায় তাঁর শিরশ্ছেদ হয়। শুনতে অবাক লাগে কিন্তু ইতিহাসে লেখা আছে যে ষোড়শ শতাব্দীতে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচজন চ্যান্সেলারের শিরচ্ছেদ হয় যূপকাষ্ঠে জন ফিশার হয়েছিলেন প্রথম বলি। ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে বীরের মতো হেঁটে বলি হওয়ার জন্য তিনি যখন যূপকাষ্ঠের দিকে যাচ্ছিলেন তখন তিনি বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের জন খণ্ডের সপ্তদশ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকটি বলছিলেন 'এ জীবন অনন্ত, ওরা যেন জানে যে তুমিই একমাত্র সত্য ঈশ্বর, আর যিশুখ্রিস্টকে তুমিই পাঠিয়েছিলে।' ঠিক চারশো বছর পরে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ফিশারকে সেইন্ট করা হয়েছে। আমাদের সংস্কৃতিতে এমন করে সেইন্ট করার ব্যবস্থা নেই। তবে আমরা বড়কে এমনিতেই বড় বলে ফেলি। সুতরাং আমরা নিরীশ্বর বুদ্ধকে অবতার করে নিয়েছি, ঈশ্বরনিন্দুক চারবাক চার্বাককে ঋষি বলি আমরা। কিন্তু মহাতপস্বী গাধীরাজ নন্দন বিশ্বামিত্র অহঙ্কার ও শৌর্য বলে ব্রহ্মর্ষি হতে পারেননি ক্ষমাবলে হয়েছিলেন। আমাদের আদর্শ পৃথক। আমাদের বিশ্ববিলয়ের ক্ষমতাধারী ভগবান রুদ্র বৃষবাহন ভস্মাচ্ছাদিত ভিক্ষুক মাত্র। তাই বলি আমাদের আদর্শই পৃথক। আমাদের সন্ন্যাসী গুরু কৃতকার্য শিষ্যকে অভিনন্দন না জানিয়ে তিরস্কারবাক্যে বলেন 'যশ প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা মেখে এলে সারা গায়।'

বিদ্যার্জন কিসের জন্য? অবশ্যই ধর্ম প্রচারের জন্য। বাইবেলে যিশু বলেছেন, 'আমিই পথ, আমিই সত্য, আমিই জীবন, আমার মাধ্যম ব্যতিরেকে কেউ পিতার কাছে যেতে পারবে না।' (বাইবেল—জন-১৪ ৬) খ্রিস্টানদের মতে যারা খ্রিস্টের আগে সংসারে জন্ম নিয়েছেন ও মৃত হয়েছেন, যারা স্বাভাবিক কারণেই খ্রিস্টের শরণ গ্রহণ করতে পারেননি, তারা কেউ স্বর্গে যেতে পারবেন না। আলিঘেরী দান্তে তার রচিত মহাকাব্য 'ডিভাইন কমেডি'তে বলেছেন যে তাঁর স্বপ্ন ভ্রমণ কালে স্বর্গে মহাকবি ভার্জিলকে দেখতে না পেয়ে তার পথপ্রদর্শককে সেই কথা জিজ্ঞেস করে উত্তর পেয়েছিলেন যে ভার্জিল খ্রিস্টপূর্বকালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং খ্রিস্টান হওয়ার সুযোগ পাননি। সুতরাং তার স্বর্গ গমন অসম্ভব। অর্থাৎ খ্রিস্ট জন্মের পূর্বে যে স্বয়ং আদম ও কোটি কোটি আদম সন্তান জন্মেছেন এবং মরেছেন এবং খ্রিস্ট জন্মের পরে যত জন্মেছেন ও জন্মাবেন এবং খ্রিস্টান না-হয়ে মরেছেন এবং মরবেন, তাদের সকলের কাছে স্বর্গের দরজা বন্ধ। ঠিক একই কথা বলেন ইহুদিও মুসলমানগণ, ইহুদি বা মুসলমান ছাড়া কেউ স্বর্গে যাবে না। অন্যেরা বলবে, 'How monstrous! কী ভয়ঙ্কর কথা।' ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমানগণ তাদের নিজের নিজের ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্মকে ধর্ম বলেই গণ্য করেন না। এসব কথা আমাদের মাথায় ঢুকেই না। আমাদের সহস্র মত ও পথ, গন্তব্য এক। আমাদের পরমগুরু শ্রীরামকৃষ্ণের মতে 'যত মত। তত পথ'। মন্দির, গির্জা, মসজিদ, সিনাগগ প্যাগোডা, সর্বত্রই আমরা মাথা নোয়াই, সকল মতের সাধকই এক ঈশ্বরের করুণা মাগছেন বলে আমাদের বিশ্বাস। যাক গে।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও খ্রিস্টধর্ম প্রচারে বিদ্যার্জনের সমান বা আরও বেশি গুরুত্ব দিয়ে আসা হয়েছে। বড় বড় প্রচারক (মিশনারি) এখান থেকে দিকে দিকে গিয়েছেন। (এখন অবশ্য পতনের যুগ। প্রতিদিন আমেরিকায় ও অন্যত্র খ্রিস্টান পুরোহিত ও প্রচারকদের ঘৃণ্য, ক্লেদাক্ত জীবনকাহিনী প্রকাশ হয়ে পড়ছে এবং সর্বত্র সৎ মানুষ কানে হাত দিয়ে বলে উঠছে, 'হে ঈশ্বর।') কেমব্রিজ থেকে যাঁরা প্রচারক হিসেবে কাজ করেছেন বা দেশে বিদেশে গিয়েছেন তাঁরা অনেক। কত জনের নাম আমি করব? সামান্য দু'এক জনের নাম উল্লেখ করি।

চার্লস সিমিয়ন (১৭৫৯-১৮৩৬) এমন একটি নাম। কিংস কলেজের ফেলো ছিলেন তিনি। ১৭৭১ সালে যাঁরা চার্চ মিশনারি সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন তিনি তাদের অন্যতম। ব্রিটিশ ও বিদেশী বাইবেল সোসাইটি প্রতিষ্ঠায়ও তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সিমিয়নের কবরে স্মৃতিফলকে লেখা আছে : আমি স্থির করেছিলাম যে যিশুখ্রিস্ট ও তাঁর ক্রুশবিদ্ধ হওয়া ছাড়া আর কিছু জানার প্রয়োজন নাই। (১ করিন্থিযান ২ : ২)

হেনরি মার্টিন (১৭৮১—১৮১২) ছিলেন সিমিয়নের একজন ছাত্র। ১৮০১ সালে তিনি সেন্ট জন থেকে স্নাতক হন ও পরের বছরই ফেলো হন। ১৮০৫ সালে চ্যাপলিন হয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাজ করতে ভারতে চলে যান। তিনি নিজে নিজেই বেশ ক'টি ভাষা শিখে ফেলেন এবং বাইবেলের নতুন নিয়মটি উর্দু, ফার্সি ও আরবীতে অনুবাদ করেন। পারস্যের শাহ তার ফারসি অনুবাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁর ফারসি অনুবাদটি সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে ১৮১৫ সালে প্রকাশিত হয়। সেই প্রথম সংস্করণের একটি কপি হলি ট্রিনিটি চার্চে তাঁর প্রতিকৃতির নীচে সংরক্ষিত আছে। ***(প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে বাইবেলের বঙ্গানুবাদটি তেমন সুললিত হয়নি। অধিকারীদের কাছে অধীনের আবেদন তাঁরা কোনো যোগ্য মানুষকে দিয়ে এই কাজটি আবার করিয়ে নিন।)***

আরেকজনের নাম জন বার্টন (১৮৩০-১৯০৮)। ক্রাইস্ট কলেজের ছাত্র এই বার্টন ও সিমিয়নের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রচারকদের কাজে নেমে গিয়েছিলেন। ১৮৭৭ থেকে ১৮৯৪ পর্যন্ত তিনি হলি ট্রিনিটির ভাইকার ছিলেন। তিনি ও তাঁর স্ত্রী ভারতে প্রচারকের কাজ করেছেন। খ্রিস্টধর্ম প্রচারকগণের মধ্যে শ্রদ্ধা দয়া বিদ্যা প্রচার প্রবণতার সঙ্গে অহঙ্কার, নিষ্ঠুরতা পরমত-অহিষ্ণুতা সদাই সহাবস্থান করেছে। সুতরাং, খ্রিস্টের ধর্ম যেখানেই গেছে সেখানেই প্রাচীন ঐতিহ্য সংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলেছে। কিন্তু আজও অজ্ঞানেরা মনে করেন যে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেও তারা তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রক্ষা করতে পারবেন। সত্যিই বলেছেন ঐতিহাসিক টয়েনবি, 'ইতিহাস থেকে আমরা এই শিক্ষাই গ্রহণ করতে পারি যে ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না।'

ইংল্যান্ডের কেন, ইউরোপের সর্বত্রই অনেক গির্জা আছে এবং আছে তাদের ইতিহাস। দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজা প্রথম হেনরি কেমব্রিজকে বরো হিসেবে স্বীকৃতি দেন এবং কর ধার্য করা ও আদায়ের আজ্ঞা দেন। ১৩৮৮ সালে রাজা দ্বিতীয় রিচার্ড কেমব্রিজে পার্লামেন্টের একটি অধিবেশন করিয়ে স্থানটিকে একটি বিরল সম্মান দেন। ইংল্যান্ডের গৃহযুদ্ধের দুর্দিনে ওলিভার ক্রমওয়েল কেমব্রিজ কনস্টিটিউয়েন্সির প্রতিনিধি ছিলেন। কেমব্রিজ বরোটির আয়তন ৪১ বর্গ কিমি। অনেক চার্চ আছে কেমব্রিজে। ইউনিভার্সিটি চার্চটির নাম গ্রেট সেন্ট মেরিজ

চার্চ। এখানে সেন্ট বেনেডিক্টের নামে একটি চার্চও আছে। এখানকার লোকেরা নামটিকে একটু ছোটো করে নিয়েছে অবশ্য। ওরা বলেন সেন্ট বেনেটস চার্চ। কিন্তু এখানে একটি এমন চার্চ আছে যার কথা একটু বিশেষ করে বলতে হয়। সাধারণত চার্চের অট্টালিকার আকৃতি হয ক্রসেব। কিন্তু এই চার্চটি গোলাকার। এটির নাম চার্চ অব দ্য হলি সেপালকার।

আমরা সেদিন যখন চার্চটিতে গেলাম তখন ভাগ্যক্রমে চার্চটির অধ্যক্ষ মিস্টার ডোনাল্ড সেখানে ছিলেন। আমাদের সঙ্গে শাড়ি পরিহিতা শ্রীমতী বেলাদেবীও ছিলেন। আমাদেরকে দেখেই মি. ডোনাল্ড হাসিমুখে এগিয়ে এলেন ও জিজ্ঞাসা করলেন আমরা ভারতীয় কিনা। আমরা হ্যাঁ বললে তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন আমরা নর্থ ইন্ডিয়ার দেরাদুন চিনি কিনা। আমরা বললাম যে নাম জানি কিন্তু চিনি বলতে পারি না, আমরা সেখানে যাইনি কোন দিন। তিনি বললেন যে তাঁর জন্মস্থান দেবাদুন। তাঁর পিতা ওখানে একটা স্কুলের হেড টীচার ছিলেন। হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য সব জাতের শিশুদেরকে একসঙ্গে রেখে পড়িয়ে সহাবস্থানের শিক্ষা দিচ্ছিলেন তার পিতা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হল। বিষণ্ণ হাসি হেসে বললেন ডোনাল্ড, 'তোমরা তো জানই। ভারতে তখন ইংরেজের থাকা নিরাপদ নয়। মহিলা ও শিশুদেরকে ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। মায়ের সঙ্গে আমাকেও পাঠিয়ে দেওয়া হলো। আমি তখন বালকমাত্র। বাবাও পবে চলে এসেছিলেন। ভারত খণ্ডিত হল। সে কতদিন! আব যাওয়া হয়ে ওঠেনি ভারতে।'

তারপর চার্চটির কথা আবার বলতে শুরু করলেন। সে একাদশ শতকের কথা। এই কেমব্রিজের ওপব দিয়ে যাতায়াত করত কত দস্যুর দল। তাঁরা বড ভক্ত ছিল। (পাঠক, মুচকি হাসবেন না। আপনি বাংলা ভাষাভাষী, ডাকাত ও কালীভক্তির কথা আপনার অজানা নিশ্চয় নয়। ওখানে ডাকাতরা যেমন ভক্ত হতে পারেন, এখানে ডাকাতরাও তেমনি ভক্ত হতে পারেন বৈকি। তবে এসব অবান্তব কথা)।

তাদের জন্য একটি প্রার্থনাগার বড প্রয়োজন। ততদিনে ১০৬৬ এব যুদ্ধ জয় কবে নরমানরা ইংল্যান্ড দখল করে উপনিবেশ স্থাপন করেছেন। তাদেরই তত্ত্বাবধানে পত্তন হল এই গোলাকার প্রার্থনাঘরের। জেরুসালেমএ যীশুখ্রিস্টের খালি সমাধিস্থানের উপর সম্রাট কনস্তান্তিন মৃতের দেশ থেকে খ্রিস্টের পুনরুত্থানের উৎসব উপলক্ষে গোলাকৃতি চার্চ অব দ্য হলি সেপালকার নির্মাণ করিয়েছিলেন। সেই গোলাকৃতি চার্চের অনুকরণে এই কেমব্রিজের গোল চার্চ নির্মাণ করেন নরমানরা। বিশাল মোটা থামগুলি নরমান স্থাপত্য শিল্পের উৎকৃষ্ট নির্দশন। প্রথমে দস্যুদের জন্য তৈরি করানো হলেও ক্রমেই এটি সাধারণ মানুষের প্রার্থনাঘর হয়ে ওঠে। পঞ্চদশ শতকে ফাটল দেখা দেয়। তখন এটিতে ব্যাপক সংস্কার করা হয়। ১৮৪১ সালে আবার সংস্কার হয় এটির। ১৯৪২ সালে বোমায় পুবের জানালাটি ভেঙ্গে পড়ে। সেখানে নতুন বঙকরা কাচের বর্তমান জানালাটি লাগানো হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে মৃত্যুর উপর খ্রিস্টের জয়। ক্রসটি হয়ে উঠেছে জীবন্ত একটি বৃক্ষ। ডোনাল্ড বলেন ভাল। তাঁর বক্তৃতায় তাঁর জ্ঞান ও শ্রদ্ধা উপচে পড়ে। পাশে এসে দাঁড়ালেন দুজন মহিলা। মা ও মেয়ে হবেন মনে হয়। বক্তা ডোনাল্ড জিজ্ঞাসা করেন ওরা দুজন ইংরেজ কিনা। ওরা মাথা নেড়ে বলেন ওরা সুইড। ডোনাল্ড তখন সুইড ও সুইডেনের কথাও একটু বললেন। একটি কাচের বাক্সে রাখা একটি চিত্রায়িত হাতে

লেখা লাতিন বাইবেল দেখালেন। মাত্র চারটি গসপেল—মথি, মার্ক, ল্যুক ও জন — আছে এতে। পঞ্চম শতকে লেখা। এটি মূল নয়, কপি মাত্র। মূলটি আছে লন্ডনে। নতুন পোপ এটিতে হাত রেখে শপথ করেন। পনেরো শ' বছর ধরে এই নিয়ম চলছে।

কেমব্রিজ। এসেছি তো বিশ্ববিদ্যালয় শহর বলে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে যাঁরা বিখ্যাত হয়েছেন তাঁদের কথা তো কিছু বলতে হয়। সব কথা তো সম্ভব নয়। দু-একটি কথা বলি। নাম বেশি ট্রিনিটি কলেজেরই। প্রথম নাম আসে জন ডি (১৫২৭-১৬০৮), ইউক্লিড এর জ্যামিতির ইংরেজি অনুবাদে 'গাণিতিক ভূমিকা' লিখে তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন। জগদ্‌বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইজাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭) এই ট্রিনিটি কলেজের ছাত্র ছিলেন। নিউটন কেমব্রিজে লুকেশিয়ান প্রফেসার অব ম্যাথামেটিক্স্ ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই কথা যে স্টিফেন হকিঙ (১৯৬৬-) যিনি তার 'ব্ল্যাকহোল তত্ত্ব' ও সৃষ্টিতত্ত্বের জন্য জগদ্বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন, তিনি বর্তমানে সেই পদে আছেন। প্রাথমিক যান্ত্রিক কম্পিউটারের নির্মাতা চার্লস ব্যাবেজও এই কেমব্রিজের ছাত্র ছিলেন। ভারতের সঙ্গেও কেমব্রিজের এই বিষয়ে সম্পর্ক রয়েছে। শ্রীনিবাস রামানুজন (১৮৮৭-১৯২০) কেমব্রিজে পাঠ নিয়েছিলেন। আমাদের প্রথম প্রধান জহরলাল নেহেরু কেমব্রিজের স্নাতক। অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের কথা তো সকলেই জানেন। সুব্রহ্মন্যণ চন্দ্রশেখর (১৯১০-১৯৯৫) ও কেমব্রিজে কাজ করেন।

স্যার ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১ ১৬২৬), বার্ট্রান্ড রাসেল (১৮৭২-১৯৭০), ও লাডউইগ উইটজেনস্টাইনও কেমব্রিজের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। ট্রিনিটি কলেজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন কত কবি সাহিত্যিক। প্রধানগণের মধ্যে ছিলেন জর্জ হার্বার্ট (১৫৯৩-১৬৩৩), অ্যান্ড্রু মার্ভেল (১৬২১-১৬৭৮), জন ড্রাইডেন.(১৬৩১-১৭০০), লর্ড বাইরন (১৭৮৮-১৮২৪), অ্যালফ্রেড লর্ড টেনিসন (১৮০৯-১৮৯২), এই হাউসম্যান, (১৮৪৯-১৯৩৬) এই., মিলানে এবং (১৮৮২-১৯৫৬), ভ্লাডিমির নবোকভ (১৮৯৯-১৯৭৭)। কবি জন মিলটনের হাতে লেখা এখনো টিকে থাকা একমাত্র পাণ্ডুলিপিটি 'লিসিডাস' কবিতার। সেটি কেমব্রিজে রক্ষিত আছে। বলা বোধ হয় প্রাসঙ্গিক যে ট্রিনিটি কলেজ থেকে এ পর্যন্ত একত্রিশ জন নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

সেই কেমব্রিজ ঘুরে ঘুরে দেখালাম। গত বছর (২০০২) জুলাই মাসে যখন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কক্ষে কক্ষে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম আর সুশিক্ষিতা গাইড কেইটের (ক্যাথেরিন) বক্তৃতা শুনছিলাম, তখন বারম্বার চার্লস ল্যামের কথা মনে পড়েছিল। ল্যাম তার অননুকরণীয় ভাষায় 'অক্সফোর্ড ইন দ্য ভেকেশান' প্রবন্ধটিতে পৃথিবীর তাবৎ দরিদ্রের কথা লিখেছেন। এরা দরিদ্র সন্তান হওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারেননি। ছুটির দিনে অক্সফোর্ডে ঘুরে ঘুরে ল্যাম দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিয়েছেন। আমার দুঃখ গাঁথাও সেই রকম। দারিদ্র্যের জন্য কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া হয়নি। সেভাবেই ঘুরে ঘুরে আমিও বেড়িয়েছি অক্সফোর্ডে। আজ কেমব্রিজেও সে রকম বেড়ালাম। ক'জন আর ছেলের কাছে থাকার জন্য এক বছরে দুবার বিদেশে যান? যাঁরা যান তাদেরও ক'জনের আমার মতো অক্সফোর্ড কেমব্রিজে ঘুরে বেড়ানোর ভাগ্য হয়? আমি সেই বিরল ভাগ্যবানদের এক জন। হাসবো. না কাঁদব ঠিক করে উঠতে পারি না। ঈশ্বরের খেলার অন্ত নাই। চরম দুঃখ ও পরম আনন্দ সবই তাঁর দান। আমি শুধু প্রণাম জানাই, দুঃখে ও আনন্দে সদাই চোখের জলে।

কিন্তু আরম্ভটা আর শেষ করা হয় না। 'আফনেরা বাঙালি?' বলে এগিয়ে এসেছিলেন যে লোকটি তার কাছে দাঁড়াই। সাধারণ পোশাক পরা কাঁচা পাকা চুল দাঁড়ি, সাধারণ বাঙালি চেহারার লোকটির নাম আবদুস সামাদ। বাড়ি বাংলাদেশের সিলেট জেলায়। কিন্তু তাঁর কথা বলার আগেই বেলাদেবী বলে ওঠেন, 'হ্যাঁ। আপনার বাড়ী সিলেটে?' ইদানীং বেলা দেবীর ভাষাতাত্ত্বিক চেতনা বেশ বাড়ছে। সুতরাং 'আফনেরা বাঙালি?' বলাতেই তিনি সিলেট পর্যন্ত বলে দিতে পারলেন। কথা হল। অমায়িক হাসি হেসে সামাদ ভাই নিজের কথা জানালেন। ১৯৫৬ সালে হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়তে এসেছিলেন কেমব্রিজে। সেই সম্পর্ক বজায় আছে। এবার তাঁর ছোট মেয়ে আসিয়া A-Level পেয়ে স্কুলের পড়া শেষ করে সেই কেমব্রিজেই ভর্তি হয়েছে স্নাতক হতে। তার বিষয় সোসিওলজি, বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশান ও ইকনমিক একাউন্টেন্সি। নিজেব পড়া শেষ করার আগেই চাকরি হয়েছিল। তবে সামাদ ভাই বুঝেছিলেন চাকরি নয়, ব্যবসা করতে হবে। তাই করেছিলেন। আজ তিনি সফল ব্যবসায়ী। Curry নামক রেস্তরাঁ শৃঙ্খলের মালিক তিনি। তেরোটি রেস্তরাঁ ছিল ইংল্যান্ডেই। গুটিয়ে আনছেন। এখন ছ'টি ব্যবসা আছে। দু'মাসে একবার দেশে যেতে হয় সামাদ ভাইকে। হাঁটতে হাঁটতেই তার নিকটবর্তী Curry Restaurant-এ পৌঁছলাম। চা খেতে ডাকলেন। এইমাত্র কফি খেয়েছি' বলে সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান কবলাম আমন্ত্রণ। ধন্যবাদ দিয়ে যার যার পথ নিলাম।

হাঁটতে থাকলাম গাড়ির দিকে। দোকানের জানালায় সাজানো পসরা দেখছিলাম। কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেসের বইয়ের দোকান দেখলাম। একটি দোকানের জানালায় একটি স্যুটের দাম দেখলাম ৩৯০ পাউন্ড বা ত্রিশ হাজার টাকা। ওরে ব্বাপ। বেশ ঠান্ডা। টিভি বলেছে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস। 'জয় রামকৃষ্ণ' বলে গাড়িতে বসলাম। এবাব চল ইপ্সউয়িচ। বড় ভাল কাটল বিকালটি। বহুদিন স্মরণে থাকবে।

বাকিংহামশায়ার

বিদেশে যাব। শ্রী শঙ্কর সেন কলকাতার বেহালায় থাকেন। পঙ্কজ বাবুর কাছে থেকে ফোন নম্বর নিয়ে শঙ্কর বাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করি। তাঁকে বলি যে আমরা ইংল্যাণ্ডে যাব ছেলের সঙ্গে কটা দিন থাকতে। কিন্তু ছেলে বলেছে সে আমাদের জন্য ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ডে বেড়াবার ব্যবস্থাও করছে। তাই আমাদের ইউ. কে.; সুইজারল্যান্ড ও শেনিয়ান (Schen`Âen) ভিসা চাই। আমরা গত বছর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউ.কে.-র ভিসা করে সেই দুই দেশে বেড়িয়ে. এসেছি। আমাদের ভিসা পেতে বোধ হয় তেমন অসুবিধা হবেনা। শঙ্কর বাবু জানালেন যে ইউ. কে.-র ভিসা তো কলকাতাতেই হয়ে যাবে, কোন অসুবিধা হবে না; কিন্তু ফ্রান্স ও সুইজারল্যান্ডে যেতে ভিসা করতে হবে দিল্লী থেকে। তবে ওঁর পরিচিত এজেন্ট আছে দিল্লীতে, হয়ে যাবে, অসুবিধা হবে না। সুতরাং শ্রীমান অলকের (সাহা) মাধ্যমে দু-জনের পাশপোর্ট কলকাতা পাঠিয়ে দিলাম। শঙ্কর বাবু তাদের বাসা থেকে ওগুলো সংগ্রহ করলেন। ২৯ জুন আমরা কলকাতা এলাম। ৩০ তারিখেই স্বামী দিব্যানন্দজীকে ফোন করলাম, জানালাম আমরা বিদেশ যাচ্ছি, আমাদের ফ্লাইট বারোই জুলাই। গতবার যেমন একটা পরিচয় পত্র দিয়েছিলেন এবারো তেমন একটা দিলে ভাল হয়। লিখে যদি ডাকে পাঠিয়ে দেন তবে পেয়ে যাব। মহারাজ বললেন যে তিনি অমরনাথ যাচ্ছেন। তেসরা জুলাই বিকেল পাঁচটায় যোগোদ্যানে মঠে চলে এলে দেখা হয়ে যাবে। তিনি পরিচয় পত্র নিয়ে আসবেন। তিনি আমার 'সারদা মা' এর কথাও জিজ্ঞেস করলেন এবং হয়ে গেছে জেনে সেটাও নিয়ে যেতে বললেন।

বিদেশে গেলেও রামকৃষ্ণ আশ্রমে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা হয়। সঙ্গে দেশের কোন মহারাজের দেওয়া পরিচয় পত্র থাকলে ভাল হয়। গতবারও নিয়ে গিয়েছিলাম। গতবার গিয়েছিলাম আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড রাজ্যের সিলভার স্প্রিং নামক জায়গার রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেন্টারে। খুব ভাল লেগেছিল। গতবার সিলভার স্প্রিংএ সেদিন উপস্থিত ছিলেন স্বামী স্বাহানন্দজী মহারাজ। পরিচয় পত্র পেয়ে কত কথা জিজ্ঞাসা করলেন ত্রিপুরা ও দিব্যানন্দজী সম্পর্কে। মনে হয়েছিল যে তিনি একেবারে 'আজতক' খবর রাখেন ত্রিপুরার। সেইজন্যই পরিচয় পত্র নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা। তেসরা জুলাই বিকেল পাঁচটায় যোগোদ্যানে গিয়ে দেখি ছোট খাট একটি ভীড় হয়ে গেছে। কেমন করে জানি অনেকেই জেনে গেছেন মহারাজ অমরনাথ যাচ্ছেন, যোগোদ্যানে তাঁর সঙ্গে দেখা হতে পারে। প্রণাম করে পরিচয় পত্র নিলাম ও 'মা' এর ফাইল ওঁর হাতে দিলাম।

সারা গ্রেট ব্রিটেনের একমাত্র রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেন্টারটি বাকিংহাম শায়ারে, বোর্ন এন্ডে। আমরা থাকি ইপ্সাউইচে। সেখান থেকে বাকিংহাম শায়ার বেশ দূরে—১১২ মাইল। তবে ছেলে প্রসূনের বাবা-মাকে জায়গায় জায়গায় নিয়ে যাওয়ার আগ্রহ এবং গাড়ি চালাতে সদাই উৎসাহ থাকায় এই দূরত্ব কিছুই মনে হয় না। গতবার আমেরিকায়ও কোথায় কোথায় আটলান্টিক সিটি, নিউইয়র্ক ও নায়াগ্রায়ে নিয়ে গেছে আমাদেরকে। এবারও কত কত জায়গায় যাচ্ছি। সব ওই গাড়িতে করে। সুতরাং, বাকিংহাম শায়ারের বোর্নএন্ডও যাওয়া স্থির হল কারণ জানা গেল ওইদিন কেন্দ্রে জন্মাষ্টমী উৎসব পালন করা হবে।

অনেক বড়ো এলাকা নিয়ে আশ্রমটি। একদিকে আশ্রমের বাড়ি, অন্য দিকে বিস্তৃত খালি জায়গা। অনেক গাছগাছালি। কিন্তু নীচটি ঝকঝকে পরিষ্কার। এই দেশে রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রের আরম্ভ করেন স্বামী ঘনানন্দজি মহারাজ, ১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাসে, লন্ডনে। ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রের পরিচালনা, মঠ প্রতিষ্ঠা, বইপত্র প্রকাশ, আমন্ত্রিত হয়ে এই দেশের বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতাদি দেওয়া সব তিনিই করেছেন। ১৯৬৯ সালে স্বামী ঘনানন্দজি দেহরক্ষা করেন। তাঁর পরে কেন্দ্রেব প্রধান হন স্বামী ভব্যানন্দজি মহাবাজ। তিনি সমস্ত কাজই করতে থাকেন। ১৯৭৭ সালে কেন্দ্রটি বর্তমান ঠিকানায়, অর্থাৎ ব্লাইন্ড লেন, বোর্ণএন্ড, বাকিংহাম শায়ার, SL8, 5LG, ইংল্যান্ড এ, চলে আসে। বোর্ণএন্ড লন্ডন থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে। ১৯৯৩ সালে তাঁর দেহ রক্ষার সময় পর্যন্ত স্বামী ভব্যানন্দজিই এই কেন্দ্র পরিচলানা করে গেছেন। তারপর স্বামী দয়াত্মানন্দজি কেন্দ্রের ভার গ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ববর্তী স্বামীজিদের মত ইনিও বেদান্ত, যোগ, ভারতীয় দর্শন, মনোবিজ্ঞান, তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্র এবং এইসব সম্পর্কিত বিষয়ে প্রতি রবিবার বিকেলে বোর্ণএন্ডের কেন্দ্রে প্রবচন দিয়ে থাকেন। মাঝে মাঝে লণ্ডনের ভারতীয় বিদ্যাভবনেও তাঁর বক্তৃতা থাকে। একটুক্ষণ ধ্যান করার পর স্বামীজি ক'টি সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করেন। শ্লোকগুলির ইংরেজি অনুবাদ করেন, এবং তারপর প্রবচন শুরু করেন। মাঝে মাঝে বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রণ আসে ইউ. কে. ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থান থেকে। সম্ভব হলে স্বামীজী সেই আমন্ত্রণ রক্ষা করেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে সাক্ষাৎকার, শাস্ত্র বিষয়ক শিক্ষাদান, অধ্যাত্মবিষয়ক পত্রাদির উত্তর দেওয়া স্বামীজীর নিত্য কর্মের মধ্যে পড়ে।

এই কেন্দ্রে একটি উপাসনা কক্ষ আছে। ভক্তগণ এসে সেই কক্ষে ধ্যান উপাসনাদি করতে পারেন। সকাল সন্ধ্যা এখানে জপ-ধ্যান-আরতি-পূজা হয়। সাধু ও গৃহীভক্তগণ নিত্য সেবায় সাহায্য করেন। এখান থেকে বইপত্রও প্রকাশ হয়। একটি পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্রও আছে।

১৭ আগস্ট ২০০৩। সেদিন কেন্দ্রে জন্মাষ্টমী উৎসব উদযাপন হল। পঞ্জিকা দেখে মেলাবেন না। মিলতে নাও পারে। বিদেশে মানুষ পঞ্জিকাদাস হতে পারে না, সেখানে মানুষ ঘড়িদাস। সুতরাং পঞ্জিকা দেখে, ঘণ্টা মিনিট সেকেন্ড মিলিয়ে উৎসব উদযাপন করা যায় না। ভক্তগণ তাঁদের কাজ ফেলে উৎসবে আসতে পারেন না। তাই উৎসব হয় পঞ্জিকা নির্দেশিত তারিখের নিকটবর্তী উইক এন্ডে। আগেই জানানো হয়, ইন্টারনেটে প্রচারিত হয়, ভক্ত সমাবেশ হয়। উৎসব হয়। সেদিনও কেন্দ্রে বহু ভক্তের সমাবেশ হয়েছিল, সুন্দর পরিবেশে শ্রীকৃষ্ণ জন্মোৎসব পালন করা হল। আমরা অংশগ্রহণ করতে পেরে ধন্য হলাম। খুব ভাল লাগলো।

রামকৃষ্ণ আশ্রমে একাদশীর সন্ধ্যায় রামনাম হয়। এই রাম নামের ক্যাসেটও আছে। বহু বাড়িতে সেই ক্যাসেটও বাজে। কিন্তু ঠিক ওই রামনামের মত শ্যামনামও যে আছে এবং তাও গীত হয় শুনিনি আগে। আছে যে তাই জানতাম না। ইংল্যান্ডের রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেন্টারে বসে জন্মাষ্টমী পূজায় সেই শ্যাম নাম শুনলাম। স্বামীজী পূজা করলেন। অনেকে গান করলেন। ইস্কন তাদের লন্ডনে জন্মাষ্টমীতে গান করার জন্য এক মহিলাকে এনেছেন কলকাতা থেকে। তিনিও এসেছিলেন। তিনিও গান করলেন। মহিলার নাম শ্রীলেখা দাশগুপ্তা।

স্বামীজীর সঙ্গে আলাপ হলো। চৌঠা অক্টোবর এখানে দুর্গাপূজা হবে। স্বামীজী আমাদেরকে সেদিন আসতে বললেন। দেখা ও কথা হল শ্রীঅনুপ চৌধুরীর সঙ্গে। জার্মানীতে থাকেন, চাকরি করেন। ছেলেবেলা থেকেই জার্মানীতে আছেন। ওখানেই লেখাপড়াও করেছেন। ইনি রামকৃষ্ণপন্থী ব্রহ্মচারী। কলকাতায় শ্যামবাজারে বাড়ি আছে, মা থাকেন বাড়িতে। এখানে সব উৎসবেই চৌধুরী মশায় আসেন। এবারও এসেছেন।

একটি সুন্দর বহুবর্ণ নিমন্ত্রণ পত্র দেওয়া হল। আগামী সাতই সেপ্টেম্বর, রবিবার বিকেল চারটেয় লন্ডনের বিবেকানন্দ হিউম্যান সেন্টারের উদ্যোগে লন্ডনেরই ফিৎসরয় স্কোয়ারে, ওয়াই এম সি এর মহাত্মা গান্ধী হলে ২০০৩ সালের 'পার্লিয়ামেন্ট অব রিলিজিয়নস' অনুষ্ঠিত হবে। পৌরোহিত্য করবেন ভারতের মাননীয় হাই কমিশনার শ্রীযুক্ত রমেন্দ্র সেন। নাম দেওয়া হয়েছে তাঁদেরও যাঁরা বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, হিন্দু, ইসলাম ও শিখ ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করবেন। হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করবেন ইউ কে স্থিত রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্রের প্রেসিডেন্ট স্বামী দয়াত্মানন্দজী মহারাজ।

হাতে ফল প্রসাদ নিয়ে বিদায় নিলাম। বেশ রাত হয়ে গেল বাড়ি ফিরতে। কিন্তু বড় ভাল কাটলো দিনটি। ঠাকুরের কাছে সবিনয় নিবেদন জানাই, 'ছেলে বৌমাই তো সব দেখাচ্ছে। ওদের ভালো রেখো ঠাকুর।' মনে হলো, 'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি'

রোগের নাম ব্যক্তিপূজা

চৌদ্দই আগস্ট. ২০০৩ সকাল বেলা বি বি সি ওয়ান-এ একটি নতুন শনাক্তিকৃত ব্যারাম নিয়ে আলোচনা হল বেশ দীর্ঘসময় ধরে। সেদিনই লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায়ও এই সম্বন্ধে সংবাদ ও আলোচনা প্রকাশিত হল। রোগের নাম 'ব্যক্তিপূজা প্রবণতা' অথবা 'সেলিব্রিটি ওয়ারশিপ সিনড্রোম'। মন্তব্য করা হয়েছে যে এটি একটি নতুন রোগ, বলতে পারা যায় এটি ভয়ঙ্কর রোগ। এ রোগে যাদের ধরে তাঁরা যেন এক পিচ্ছিল ঢালু জাযগায় এসে দাঁড়ান এবং ক্রমাগত নীচে নেমে যেতে থাকেন। ফলে অবসাদগ্রস্থতা, উদ্বেগ, মনোবৈকল্য এবং সমাজ-বিচ্ছিন্নতা (Social dysfunction), ইত্যাদি নানাবিধ রোগের শিকার হয়ে পড়েন। আলোচনায় বোদ্ধাগণ এই রোগ বর্তমানে বেশ দ্রুত বেগে ছড়িয়ে পড়ছে বলে চিন্তা প্রকট করেছেন।

আমি বিদেশী-ভারতীয়। কিছুদিনের জন্য ইংল্যান্ডে এসেছি পুত্র পুত্রবধুর সান্নিধ্যে সুখ ও তাঁদের স্নেহসুধা ভোগ করার জন্য। এদের ব্যবস্থায় ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড ইত্যাদি দেশ দেখতে যাচ্ছি আর এদের সঙ্গে প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় এদিক ওদিক বেড়াচ্ছি। বেরি সেন্ট এডমান্ডস, লোয়েসটফ্‌ট, অরওয়েল হেইভেন নামক নদীবন্দর, দূরে বাকিংহাম শায়ারের বোর্ণএন্ডে (রামকৃষ্ণ) বেদান্ত সেন্টারে যাচ্ছি প্রাণ ভরে ভ্রমণানন্দ উপভোগ করছি! ইপ্সউয়িচ এ থাকি। বাড়ি থেকে পাঁচ মিনিটের পথ গেলে পাওয়া যায় 'সাফোক কাউন্ট কাউন্সিল লাইব্রেরি। রোজ সেখানে যাচ্ছি আর প্রাণ ভরে বইপত্র পত্রিকা পড়ছি। সকাল বেলা খুব টিভিও দেখছি। সেই সুবাদেই টিভি ও খবরের কাগজে সেলিব্রিটি ওয়ারশিপ সিনড্রোম নামক ব্যারামটির কথা আমাদের দৃষ্টি ও শ্রুতি আকর্ষণ করলো এবং আমার আরামে ব্যাঘাত সৃষ্টি করলো। তাই সেই কথা বলার অবতারণা।

ইংল্যান্ড ইংরজের দেশ। প্রায় দুশো বছর এরা আমাদের পদানত রেখেছে, আমাদেরকে শাসন ও শোষণ করেছে। বহু প্রাণের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু এদের শাসন কালে ইংরেজ জন্মসূত্রেই আমাদের চেয়ে বড় একথা আমার অনেক স্বদেশবাসী বিশ্বাস করতেন, এখনো অনেকে করেন। যাঁরা ইতিহাস পড়েছেন এবং ইতিহাসের কথা জানেন ও বিশ্বাস করেন তাঁরা জানেন যে ইংরেজরা খ্রিস্টিয় প্রথম শতাব্দীতেও অর্ধসভ্য ছিলেন এবং ভারতবর্ষ (বর্তমান প্রজন্মের অনেকে বোধ হয় জানেনই না যে আমাদের ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত, একদা ভারতবর্ষ নামে খ্যাত ছিল এবং রাজনৈতিক দুর্ভাগ্যবশত দেশটি যেমন খন্ডিত হয়ে আয়তনে ক্ষুদ্র হয়েছে তেমনি সাংস্কৃতিক দুর্ভাগ্য বশত নামটিও খন্ডিত ও হ্রস্ব হয়ে এখন ভারত হয়ে পড়েছে।) তখন সভ্যতার অতি উচ্চ স্থানে অবস্থান করছিল। আমাদের বেদ বেদান্ত রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদির নবীনতম অংশও তখনই অন্তত তিন হাজার বছরের বেশি দিনের পুরনো হয়ে পড়েছে। চিকিৎসাবিদ্যায়ও আমাদের চরক সুশ্রুতের নব নব দিগন্ত উন্মোচনকারী আবিষ্কার হয়ে পড়েছে এবং বহু রোগ সনাক্তীকৃত ও তাঁদের চিকিৎসা বিধিবদ্ধ হয়েছে।

সুতরাং 'প্রবাসে দৈবের বশে' এই 'সেলিব্রিটি ওয়ারশিপ সিনড্রোম' ব্যারামটির কথা জেনে

আমার আরামের ব্যঘাত ঘটলেও বিষয়টি আমাদের কাছে নতুন নয়। এই রোগ পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তির সময় থেকেই আছে বলে এই অধমের ধারণা। সেই ধারণা আলোচনা ও সমচিন্তকদের সঙ্গে তার অংশভাগী হওয়ার জন্যই এই প্রয়াস। 'চিকিৎসা ও রোগ নিয়ে আলোচনা করেন বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকেরা'। সাধারণের মধ্যে এই রকমের একটি ভ্রান্ত ধারণা থাকতে পারে। বর্তমান আলোচক যেহেতু বিজ্ঞানী বা চিকিৎসক কোনোটাই নহেন সুতরাং তিনি বর্তমান 'সেলিব্রিটি ওয়ারশিপ সিনড্রোম' নামক রোগ এবং তার চিকিৎসা বিষয়ে অধিকারী কিনা এমত জিজ্ঞাসা কারো মনে উঠেও যেতে পারে ভেবে সেই জিজ্ঞাসার উত্তর আগে পেয়ে সকলে যাতে ভ্রান্ত ধারণা ঝেড়ে ফেলে শান্ত মনে বিষয়টি অনুধাবন করতে পারেন তার প্রয়াস নেয়া হচ্ছে।

স্বনামখ্যাত নাট্যকার জর্জ বানার্ড শ' তরুণ বয়সে রোজগারের বিষয়ে বেশি সুবিধা করতে না পেরে একবার পত্রিকায় সঙ্গীত সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অর্বাচীনেরা তাঁর অধিকারের প্রশ্ন তুলতে পারে ভেবে তিনি তাঁর রচিত প্রথম সঙ্গীত সমালোচনাটির প্রথমেই অজিজ্ঞাসিত প্রশ্নটির উত্তর দিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর উত্তরটিই এখানে দিয়ে দিলে অধীনের লেখা সম্বন্ধে ও আর কেউ প্রশ্ন করবেন না বলেই মনে হয়। বার্নার্ড শ' লিখেছিলেন : 'যাঁরা ভাল গান গাইতে পারেন তাঁরা গান গাইতে যান। যাঁরা ভাল গাইতে পারেন না তাঁরা গান শেখান, অর্থাৎ গানের শিক্ষক হন। যাঁরা গান শেখাতেও পারেন না তাঁরা সঙ্গীত সমালোচক হন। আমি প্রথম দু'টিতে আপারগ বলে তৃতীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছি।' এই শ' কৃত ফর্মুলা যদি সঙ্গীতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে থাকে তবে তা রোগ ও তার নিরাময়ের ক্ষেত্রেও প্রযোয্য হবে। সুতরাং, 'সেলিব্রিটি ওয়ারশিপ সিনড্রোম' বা খ্যাতিমানের চরণ পূজন বিষয়ক আলোচনার অবতারণ, অনুসরণ, দীর্ঘিকরণ, প্রয়োজনে বিষয়ান্তর গমন ও সিদ্ধান্ত স্থাপন এ অধীনের অধিকার স্বতঃসিদ্ধ ও প্রশ্নাতীত।

ইংল্যান্ডে বি বি সি-র টিভিতে ও পত্রিকায় যাঁরা রোগটির বিষয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরা সেলিব্রিটি বা খ্যাতিমান খুঁজতে খেলার মাঠে, টিভির ঘরে এবং বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে গেছেন। তাঁরা দেখেছেন যে বর্তমান কালে তাঁরাই সেলিব্রিটি যাঁরা অধিক অর্থ উপার্জন করছেন। ফুটবলে, ক্রিকেটে, টেনিসে, গলফে এখন রোজগার লক্ষে নয়, কোটির হিসাবে হয়। বাস্কেটবল, কুস্তি, বক্সিং ইত্যাদিতে কমলার বদান্যতা আজ অবিশ্বাস্য। সঙ্গীতে, নৃত্যে টাকা উড়ছে। সকলে সেলিব্রিটি। সেদিন একজন গান গাইলেন আর ব্রিটেনের মত ছোট দেশেও সাড়ে তিন লক্ষ দর্শক/শ্রোতা জুটল। বহু জায়গায় যানজট হয়ে গেল, অনেকে পঞ্চাশ পাউন্ডের টিকিট হাতে নিয়ে গাড়ির ভীড়ে হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। একজন ফুটবলারকে দেখতে লক্ষ লোকের ভীড় হয়। এসবের নাম সেলিব্রিটি ওয়ারশিপ সিনড্রোম। আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়ের মত চুলকাটে আমার কলকাতাবাসী ভাই প্রীতম। সেটিও তাই। এসব নিয়ে চিন্তিত সকলে।

আমাদের প্রাচ্যে এসব নতুন নয়। বনে পশুরা দলে দলে মিলে থাকে। দলে দলে যুদ্ধ হয়। সবচেয়ে যে বলবান সে দলপতি হয়। তার বলের যখন উৎরাই আরম্ভ হয় তখন তরুণ একজন তাকে তাড়ায়, নিজে দলপতি পদে বৃত হয়, অন্যেরা বিনা বাক্য (?) ব্যয়ে

নতুন দলপতির পদাঙ্ক অনুসরণ করে। এর নাম সেলিব্রিটি ওয়ারশিপ সিনড্রোম সি. ডব্ল্যু এস। সিংহ মশায় মাংস খান। কিন্তু মাংস আহরণ কবেন সাধারণত তার বনিতারা। তিনি প্রথমে খান পরে তার স্ত্রীগণ ও সন্ততিরা প্রসাদ গ্রহণ করেন কেউ কোন আপত্তি তোলেন না, আগে খাবার চেষ্টা করেন না। সেই কথা-সি. ডব্ল্যু এস।

মনুষ্য সমাজে এই সিনড্রোমের প্রথম প্রকাশ পুরুষের বহু বিবাহে। কত বিবাহ একজন করতেন তার হিসাব অনেক সময় থাকতো না। ব্রাহ্মণ কুলিনেরা ব্যবস্থাটি পাকাপাকি করে ফেলেছিলেন। আমার এক পরিচিত বৃদ্ধা দিদি গল্প শোনাতেন। বিয়ে করে প্রাপ্য বস্ত্র সামগ্রী নিয়ে কুলীন চলে গেলেন পরদিন প্রাতে। ছ সাত বছর পরে যখন আবার এলেন তখন বাড়িটি ঠিক চিনতে পারছেন না। পুকুর থেকে জলের কলসী কাঁখে নিয়ে উঠছেন একজন। তাকে বল্লেন, 'ধু ধু করে মনে পড়ে তাল গাছ সারি সারি, কোন পথে যাব মাগো জগমোহন চক্কোর্তির বাড়ি?' মা-টি কলস সামলে কাপড় দিয়ে মাথাটি ঢেকে বলছেন, 'মা, মা, ছি, ছি, আমি গিয়ে কোথায় মরি, মা বলে ডাকিলে যারে, সে যে গো তোমাবি নারী।' পশ্চিম দেশে খৃস্টে ধর্ম এই বহুবিবাহে অনুমোদন কবেনি। তাই এরা একবারে একাধিক শয্যা সঙ্গী বা সঙ্গিনী রাখতে পারেননি। একে একে নিয়েছেন। সুতরাং, ইংলন্ডেশ্বর অষ্টম হেনরি আধা ডজন পত্নী গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। জেফ্রি চসারের রচিত ক্যান্টারবেরি টেলসের বিখ্যাতা সাধ্বী 'ওয়াইফ অব বাথ' পাঁচ জন পুরুষের সঙ্গে একে একে গির্জায় বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে 'যম যত দিন আলাদা না করে তত দিন স্ত্রী স্বামী থাকব' বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন ও ভাল লাগে না বলে আলাদা হয়েছেন; ইদানীং একা আছেন ও ষষ্ঠ পুরুষটির সন্ধানে আছেন; পেয়ে গেলেই তার কণ্ঠ লগ্না হয়ে গির্জায় প্রবেশ করবার আশায় তক্কে তক্কে আছেন। সবার সব জুটে যায়। রোগের নাম সি ডব্ল্যু এস।

কালে কালে, স্থানে স্থানে, সেলিব্রিটির বিভিন্নতা দেখা যায়। রাজনৈতিক সেলিব্রিটি, সৌন্দর্যের সেলিব্রিটি, ধর্মের সেলিব্রিটি কত কি দেখতে পাই। শেক্সপীয়রের মার্চেন্ট অব ভেনিসের নায়িকা এক সেলিব্রিটি ছিলেন। 'তোমাকে বিয়ে করতে না পারলে চিরজীবন কুমার থাকব' বলে কত জন এসেছেন ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছেন। ক্যালিডনের আটলান্টাও তেমনি। দৌড়ে হারাতে পারলে গলায় মালা নেবে, না পারলে চিরকুমার থাকবে। তবু এসেছে পতঙ্গ। হেরে ফিরে গেছেন। সীতা মাতা, দ্রৌপদী, এরাও সেলিব্রিটি হযে পড়েছিলেন ভাগ্যচক্রে। বহু বাবাজী ও মহারাজেরাও এইরকম যখন থাকেন তখন ভক্তের ঠেলায় কাছে যাওয়া যায় না। যখন থাকেন না তখন আশ্রমে প্রদীপ জ্বালাবার লোক পাওয়া যায় না। তবে রাজনৈতিক সেলিব্রিটির তুলনা হয় না। আলেকজান্ডার, অ্যাটিলা, তৈমুরলঙ, জোয়ান অব আর্ক, হিটলার, সাদ্দাম হোসেন, সবাই সেলিব্রিটি; সবারই অগণিত পূজক। বর্তমান কালেও রাজনৈতিক সেলিব্রিটিরই জয় জয়কার। এরা গণতান্ত্রিক সেলিব্রিটি, এদের সহস্র লক্ষ কোটি স্তাবক পূজক। স্তাবকেরা সবাই সি ডব্ল্যু-এস এর রোগী। আজ এই জনকে পূজা করছে তো কাল ওই জনকে। ইমার্জেন্সির আমলে এক সেলিব্রিটি হয়েছিলেন। নিজে কেউ না হলেও ক্ষমতার আলোকে আলোকিত হয়ে থাকতেন, ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলার চেয়ার ছেড়ে দিয়ে বসতে দিতেন। অত নাম কে করবে, অভাব নেই নামের।

সেলিব্রিটি ওয়ারশিপ সিনড্রোম। মন্ত্রী কাঁধে হাত দিয়ে হাটলে বুক ফুলে উঠে। তিনি নিমন্ত্রণ বাড়িতে ভোজন সেরে উঠে দাঁড়ালে অধ্যাপকেব লাইন লেগে যায তার হাত ধোওয়াব জল ঢেলে দিতে, তোয়ালে নিয়ে সেই ভিজা হাত মুছে দিত। পানের থালা এগিয়ে দিতে। একই বোগ। আমাদের দেশে এটা রোগ নয়, গুণ। এতে স্বজনের চাকরি জোটে; খারাপ জায়গায় বদলী বন্ধ হয় ; ও. এস. ডি হওয়া যায়; মিডডে মিলের তত্ত্বাবধায়ক, স্কুলের অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর বা কোন কমিশনে নিয়োগপত্র মিলে বয়স হয়ে গেলেও। সুতরাং আমাদের দেশে এই রোগ নিয়ে চিন্তা নেই।

লোয়েস্‌টফ্‌ট্‌

ছেলে বললো, আগামী রবিরার তাদের কোম্পানির বার্ষিক চড়ুইভাতি, সকাল আটটায় ইপ্সউয়িচ টাউন সেন্টার থেকে বাসে চড়ে সবাই যাবে একটি এন্টারটেনমেন্ট পার্কে। সেখানে সারাদিন কাটিয়ে ফেরা। ভালই কাটবে। দুই আড়াইশ লোক হবে। সবই তাদের কোম্পানির সহকর্মী। অনেকেই ভারতীয়। সোৎসাহে আশায় রইলাম রবিবার আসার জন্য। রবিবার তো আর কোন মানুষ নয়, কথার খেলাপ করেনি। ঠিক শনিবারের পরই সে এসে গেল। আমরা তৈরি হয়ে পাঁচ মিনিট হেঁটে পৌছে গেলাম ক্রাউন হাউস এর সামনে। চার চারটি বড় বড় বাস দাঁড়িয়ে আছে। ছেলে ও বধুমাতার পরিচিত অনেকে। হাই, হ্যালো, বাবা-মায়ের সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া ইত্যাদি সেরে বাসে বসা। কোথায় যাব ঠিক জানি না। তবে যেখানে যাব সেটা একটা এন্টারটেনমেন্ট পার্ক সেটা জানি। জয় রামকৃষ্ণ। এই বয়সে এতগুলি তরুণ তরুণীর সঙ্গে সারাদিন কাটানোর সুযোগ কদাচিৎ মেলে। ওরা আনন্দ সৃষ্টি করবে, ভোগ করবে। আমরা দর্শক হয়ে সে আনন্দের অংশ ভাগী হব।

বাস ছাড়তেই ব্রেকফাস্ট বিতরণ শুরু হল। স্যান্ডউইচের প্যাকেট, পটেটো চিপসের প্যাকেট আর ফ্রুট জুস বা কোলা। খাচ্ছি আর বাস চলছে, নানাবিধ দৃশ্য দেখছি। ঘণ্টাভর চলে বাস এসে থামলো আমাদের গন্তব্য এন্টারটেনমেন্ট পার্কে। নাম 'দ্য নিউ প্লেজারউড হিলস'। স্থানের নাম লোয়েসটফ্‌ট্‌। আমরা এখন ইপ্সউয়িচ বাসী। এই ইপ্সউয়িচ ইংল্যান্ডের ইস্ট অ্যাংলিয়া অঞ্চলের সাফোক কাউন্টিতে অবস্থিত। আমাদের ছোটো শহর ঈপ্সউইচ সাফোকের দক্ষিণ-পশ্চিমে আর লোয়েসটফ্‌ট্‌ সাফোকের একেবারে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে সাফোক হেরিটেজ কোস্টের তীরে, দূরত্ব বেশ। সবার সঙ্গে বাসে বসে কথা বলতে বলতে আসায় কোথা দিয়ে ঘণ্টা চলে গেছে টেরই পাওয়া যায়নি। বাসে এক ঘণ্টা, তা আশি কিলোমিটার হয়ে যেতে পারে।

সবাই নামা গেল। যাঁরা ব্যবস্থা করেছেন তারা সকলের হাতে লাল টুকটুকে একটি করে টিকিট ধরিয়ে দিলেন—পার্কের প্রবেশ পত্র। বললেন, 'আঙ্কল, সাবধানে রাখবে। হারিয়ে ফেললে ঢুকতে দেবে না। কিন্তু একটু পরেই 'সাবধানে রাখা' থেকে মুক্তি পাওয়া গেল। গেট রক্ষক টিকিটটি নিয়ে গেল, ডান হাতের পিঠে সুন্দর ছাপ মারলো, ছাঁপটি ইংরেজি সংখ্যা ছয়ও হতে পারে নয়ও হতে পারে। ঢুকে গেলাম। কিন্তু আমার সবই উল্টোপাল্টা হয়ে যায়। গত বছর লন্ডনে এসেছিলাম নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, আটলান্টিক সিটি দেখে আসার পরেই। ব্যাপারটা তেমন জমেনি। আমাদের চোখে লন্ডন যতটা আলোকোজ্জ্বল, বর্ণাঢ্য ও আশ্চর্য লাগার কথা ছিল, আমেরিকার স্থানগুলি সদ্য দেখে এসেছিলাম বলে লন্ডন তেমন লাগেনি। আজ লোয়েসটফ্‌ট্‌ এ নিউ প্লেজারউড হিলস্‌, লেজার পার্কএ এসেও সেই অবস্থা। সেদিন মাত্র প্যারিসে ডিজনিল্যান্ডে গিয়ে দেখে এলাম যেসব জিনিস এখানেও প্রায় সেইসব জিনিসই রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। স্বভাবতঃই সেই তুলনায় এদের ক্ষমতা কম। তবে যদি কেউ এন্টারটেনমেন্ট পার্কেই যান তবে মোটামুটি একই জিনিস দেখবেন তাতে আর সন্দেহ কি?

—05

লোয়েসটফ্‌ট্ এ বড় কথা অনেকগুলি ভারতীয় ছেলে মেয়ে একত্রিত হয়েছে; বেশ ক'জনে বাংলা কথা বলছে। এরা আমার দেশের ছেলে-মেয়ে, বিদেশে এসেছে ও এখানে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করছে। আসলেও ইট্‌স আ স্মল ওয়ার্ল্ড। আরো বড় কথা আমাদের ছেলেও বধূ আমাদের সঙ্গে ফ্রান্স যায়নি; প্যারিসে, ডিজনিল্যান্ডে আমরা দুজনে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল আমার এদেশে বেড়াতে আসার আগেই। ওরা নিজেরা আগে দেখেছে। আজ লোয়েসটফটে ওরাও আমাদের সঙ্গে এসেছে। তাই আজকের বেড়ানোর স্বাদই আলাদা। খুব আনন্দ লাগছে।

এন্টারটেনমেন্ট পার্কগুলোতে যা থাকে তার সিংহ ভাগই যৌবন থাকলে তবে ভোগ করা যায়। নইলে নয়। বড় লোকের দুর্গা পূজা ও পাঁঠা বলি যেমন। হঠাৎ পাঁঠা বলি বন্ধ হয়ে যায়। বাবুকে প্রশ্ন করলে জানতে পারবেন যে বাবুর দাঁত পড়ে গেছে তাই পাঁঠা বলি বন্ধ। অথবা বাঙালির গোঁফ। সুন্দর গোঁফ। গোঁফের জন্য ছোট কাঁচি ও ছোট চিরুনি। হঠাৎ ওকে দেখতে কেমন লাগছে। কি হ'ল? গোঁফ কোথায়? বলবে, না ছেটে ফেলেছি। বড় সময় লাগে। এখন প্রতিদিন সকালে তাড়াতাড়ি বেরুতে হয়। এতটা সময় গোঁফ ঠিক রাখতে দিতে পারি না।' কিচ্ছু না। অসত্য ভাষণ। বাঙালি প্রজন্মে প্রজন্মে এই অসত্য কথাটি বলেছে। আজ ইনি যা বল্লেন ক'বছর আগে এর পিতৃদেবও এমন কথা বলেছিলেন। আসল কথাটিও সকলে জানে। গোঁফে রূপোলী রেখা দিয়েছে দেখা। গীতার কথা, 'দেহিনোস্মিন যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা...। সবাই জানে যৌবন যাবে বার্ধক্য আসবে। কিন্তু সেই বার্ধক্য এসে একেবারে নিজের নাকের উপর বসে থাকবে ; নির্ভুলভাবে সকলকে বলবে, এই দেখ, এর যৌবন চলে যাচ্ছে, বার্ধক্য আসছে।' সহ্য হয় কারো? অতএব নির্মূল কর এই গোঁফ, কিছুদিন অন্তত গোপন থাকুক সেই বার্তা, 'বার্ধক্য আসছে। The process has begun.

প্রথমেই পাইরেটশিপ। দুরন্ত বেগে দুলছে জাহাজ, বসে আছে কত জন, বাচ্চাই বেশি। খিলখিল করে হাসছে। আমার গৃহিণীর সহকর্মী পঞ্চমা দিদিভাই রসিক মানুষ। একবার বলেছিলেন, 'বিলাতে সব চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হলো, একেবারে বাচ্চাগুলোও ইংরেজি বলে।' সত্যি কথা। আর বলেও কত সুন্দর। কিন্তু পঞ্চমা যা বলেননি তা হলো এই যে ইংল্যান্ডের বাচ্চাগুলো ইংরেজিতে হাসে না। এত সুন্দর সুন্দর সব বাচ্চা কিন্তু হাসে সেই খিল খিল ; যেমন হাসে বাচ্চারা বাংলা, হিন্দী, ককবরক, মণিপুরী বা চাকমাভাষী বাড়িতে। ভাষা ফোটার আগে বাচ্চারা ঈশ্বরভাষী থাকে; ঈশ্বরের ভাষা হাসি। বড় হলে বাবা মায়ের সঙ্গে ঈশ্বর মিত্র বা ঈশ্বর শত্রু হয়, বাবা মায়ের ভাষায় ঈশ্বর বন্দনা করে অথবা ঈশ্বরকে গালি পাড়ে। ওই ভাষায় পরস্পরের উৎসাদনে লেগে যায়। ঈশ্বর শুধুই হাসতে জানেন, হাসেন। প্রার্থনাতেও হাসেন, গালি শুনেও হাসেন। ছোট বেলায় যারা গলাগলি করেছে বড় হয়ে তারা গোলাগুলি ছুঁড়ছে দেখেও হাসেন। আমরা হাসতে ভুলে গেছি। জায়গায় জায়গায় লাফিং সেন্টার করে কৃত্রিম হাসি হাসছি। ক্রমশই ঈশ্বরের ওই হাসির ভাষা দুর্বোধ্য হয়ে যাচ্ছে। ভাগ্যের কথা, শিশুরা কোনো ভাষা শেখার আগে ঈশ্বরের ভাষায় হাসে।

ওপাশে ঐ স্তম্ভটি আরেকটি খেলা। চারদিকের চেয়ারে বসে নিজেকে বেঁধে ফেলো, ধীরে ধীরে লিফটের মত উপরে উঠবে, দশ সেকেন্ড ওখানে স্থিত থাকবে, আর তারপর

উপর থেকে পড়ে যাবে। না ঠিক পড়ে যাবে না। পড়ার মত নেমে আসবে, সামান্য উপরে থেমে যাবে ও ধীরে নামবে। এসব আমাদের জন্য নয়। প্রসূন মুদিতা গেল, উঠল, নামল; আমরা ওদিকে বসে তাকিয়ে দেখলাম। ওখানে একটা রাইড। ছোট মতন। চেয়ারে দুজন দুজন বসা, ধীরে ধীরে ওই উপরে উঠা ও পরে দ্রুত বেগে ঘুরে, কাত হয়ে, ওদিক দিয়ে নামা। ওরাই গেল। ফিরে এলো একটা চাবির রিঙ নিয়ে, ওতে দুজনের ফটো, দক্ষিণা তিন পাউন্ড। হেঁটে হেঁটে ঘুরে ঘুবে দেখতে দেখতে পৌনে বারোটা বাজে। চল, যাওয়া যাক্। ওখানে, ঐ তাবুর কাছটায় খাবার আসবে। লাঞ্চ হবে বারোটায়।

গেলাম। গাছেব নীচে টেবিলে বসে অপেক্ষা। বাবোটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে একজন এসে খবর দিল যে খাবাব আসতে আসতে দেড়টা হয়ে যাবে। বলাব কিছু নেই। ইংল্যান্ডে হলেও এখানে যারা এসেছি আজ, তাদের অধিকাংশই ভারতীয়, যাঁরা আজকের ব্যবস্থাপনায় আছেন তাঁরা ভারতীয়, শুনলাম যে ক্যাটারার এখানে আজ লাঞ্চ নিয়ে আসবেন লন্ডন থেকে, তাঁরাও ভারতীয়, সুতরাং আজ এখানে সব প্রোগ্রাম মত কাঁটায় কাঁটায় মিলিয়ে হয়ে গেলে আমাদের ঐতিহ্য বক্ষা হয়? সোয়া দুটোয খাবার এলো। খেয়ে হাত মুছে দেখলাম তিনটা প্রায় বাজে। জয়হিন্দ।

আবাব চলা যাক। এবার বোপওয়ে। এটাতে আমরাও যেতে পারি, গেলামও। আর কোনোদিন রোপওয়ে চড়িনি। ভাল লাগলো। ওরাও আবার একটা রাইড নিল। ম্যাজিক মাউস ও থ্রিল কোস্টাব। আমবা বসে দেখলাম। ভুলে গেছি। দুটো রাইড আগেই হয়েছে। আমরাও নিয়েছি। একটা ব্যাটল্ স্নেইক বোলার কোস্টার। চক্ষু বুজে ধাক্কা সামলেছি। উডিজ ড্রাইভিং স্কুলের গাড়িতেও চড়লাম। একটায় প্রসূন ও তার মা, আব আরেকটায় মুদিতার সঙ্গে আমি। ঠকাঠক গাডিতে গাড়িতে গুতোগুতি। সবাই হাসছে অ্যাকসিডেন্ট করে করে।

প্যাবট শো। বড় টিযা। আদেশ শুনে, পালন কবে। মিনিযেচার রেইলওয়েতে বেড়িয়ে এলাম। আমরা চাবজনে গাড়িতে বসলে ড্রাইভাব আমাদেব ছবি তুলে দিলেন। ফ্যানটাসি বোট রাইডে গিযে পাতালপুরি দেখে এলাম। অ্যানি ওক্‌লে বেইলওয়ের গাড়িতে চড়ে সারাটা প্লেজার উড হিল ঘুরে আসা গেল। দেখা হোল প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসরদের সঙ্গে প্রাগৈতিহাসিক মানবদের সঙ্গেও। মুদিতা ও প্রসূন গেল টাইডাল ওয়েভ ওয়াটার কোস্টার রাইডে। ওরা যখন নেমে আসছিল তখন আমাদের চোখ বন্ধ সব শেষে দেখা হল সীলায়ন শো। বড় ভাল ট্রেনিং দিয়েছে সীলায়নকে। দুটি বড়। একটি শিশু। অনেকক্ষণ ধরে তাদের কসরৎ দেখালো।

দিন শেষ। বাসে চড়। বাড়ি চল। বাসে দিয়ে গেল প্লাস্টিকেব বাক্সে করে টিফিন, বাড়ি। নৈশাহার নিদ্রা। একটি মনে রাখার মত রবিবার কাটলো। জয় রামকৃষ্ণ।।

সুইজারল্যান্ড

সুইজারল্যান্ড। ছোট বেলায় পড়েছি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য ছোট্ট এই দেশটিকে স্বর্গ বলা হয়। পড়া মাত্রই সার। কত জিনিসই তো পড়া হয় পড়ানো হয়। ওইগুলো শুধু পড়ার জন্য। ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব যেমন বলতেন, 'পাঁজিতে লেখা আছে বিশআড়া জল। তা পাঁজি টিপলে এক ফোঁটা জলও বেরোয় না।' আমাদের দেশের গ্রামের ছেলেমেয়েদের, বিশেষ করে গরিব গ্রামের ছেলেমেয়েদের ওই পাজি টেপা বিদ্যা। 'সদা সত্য কথা বলিবে' যেমন। ওই পড়া কোন কাজে লাগে না। তাই ওই পড়া মনে কোন দাগ কাটে না। মনেই থাকে না। তাই সুইজারল্যান্ড যতই সুন্দর হোক তাতে ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির কোন্ কিশোরগঞ্জের গ্রামের ছেলে আমি প্রভাস ধর, তাতে আমার কি আসে যায়? কিন্তু তাও এসে গেল। ছেলের কাছে ইংল্যান্ডে যাব ; ইউ. কে.-র ভিসা করবো। সে আমাকে একটি শেনিয়ান (schengen visa) ও একটি সুইস ভিসাও নিতে বললো। নিয়েই এসেছি। প্রথমে জুলাই (২০০৩) মাসের শেষ সপ্তাহে ফ্রান্সে যাওয়া, প্যারিস-ভার্সাই-ডিজনিল্যান্ড ইত্যাদি দেখা হয়ে গেছে। অগাস্টের শেষ সপ্তাহে আবার ফ্রান্স হয়ে জার্মানী ছুঁয়ে সুইজারল্যান্ড দেখা। সময় এসে গেল। সুতরাং পাড়ি দেওযা গেল সুইজারল্যান্ডেব দিকে। মনে উত্তেজনা, সুইজারল্যান্ড দেখতে যাচ্ছি।

সুইজারল্যান্ড ইউবোপের একটি ছোট্ট দেশ। সুন্দর দেশ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে যেমন অনন্য, মানবিক ও মানসিক সৌন্দর্যেও তেমনি অনন্য। আল্পস আর জুরা পর্বতমালায় দেশটির অর্ধেকেরও বেশি জায়গা জুড়ে ববফাচ্ছাদিত পর্বতচূড়া। অরণ্য আচ্ছাদিত পর্বতগাত্র, সুন্দব স্রোতস্বিনী, দিগন্ত ব্যাপ্ত নীল, সবুজ, কালো কত হ্রদ, সবে মিলে দেশটিকে এমন সুন্দব করেছে যে এটি ইউরোপেব অন্যতম পর্যটক আকর্ষণ হযে উঠেছে। সুইজারল্যান্ডেব মানুষের স্বাধীনতা প্রিয়তা ও কলহ-বর্জিত অতিথি পরায়ণ স্বভাবও দেশটিকে প্রিয় করে তুলেছে বিদেশীদের কাছে। বর্তমান কালে পৃথিবীতে এমন নিরাপদ দেশ খুব কম আছে। এটাও পর্যটকদের কাছে একটা বড় আকর্ষণ বৈকি। সুইজারল্যান্ডের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা তুলনাহীন। সেই জন্যে বহু দেশের বহু ধনকুবেব এ দেশের ব্যাঙ্কে তাদের ধনের একটা বড় অংশ রাখেন। তাঁরা বেড়াতে এবং নিরুদ্বেগে ক'টা দিন কাটাতে সুইজারল্যান্ডে আসেন। পর্যটন ব্যবসা রমরমা। বহু মানুষ পর্যটন ব্যবসার উপর নির্ভরশীল এদেশে।

সুইজারল্যান্ডের মধ্য এলাকাটি, অর্থাৎ একদিকে আল্পস পর্বতমালা ও অন্য দিকে জুরা পর্বতমালার মধ্যভাগটি একটি মালভূমি। দেশের অধিকাংশ মানুষই এই মালভূমিতে বাস করেন। শহরগুলি এবং কৃষি ক্ষেত্রগুলি এমনভাবে খাড়া পর্বত গাত্রে ছড়িয়ে আছে যে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত যে এমন ঢালু জমিও চাষ করা যায় এবং এত উঁচুতেও মানুষ বাড়ি তৈরি করে বাস করতে পারে। এমনভাবে তৈরি করা রাস্তা অবশ্য পাঠানকোট থেকে শ্রীনগর যেতে বা ঋষিকেশ থেকে বদ্রীনাথ যেতে দেখেছি। আমাদের হিমালয়ের সঙ্গে তো আর আল্পসের তুলনা হয় না। ছোট মাপের এমন রাস্তাও আমাদের আছে। আমার দেখার

মধ্যে মনে পড়ছে উদাগামন্ডলম্(উটি) এবং তিরুপতি মন্দিরে উঠার রাস্তার কথা। এরকম রাস্তা সর্বত্রই ভয়ঙ্কর ও সুন্দর। তবে সুইজারল্যান্ডে মনে হয় কম ভয়ঙ্কর ও বেশি সুন্দর। ছেলে মে মাসে টিকিট কেটেছিল আমাদের অগাস্ট মাসের শেষ সপ্তাহের ভ্রমণের জন্য। তাই বাসে আমাদের আসনের নম্বর তিন ও চার। সামনে বসে খুব ভাল করে প্রাণ ভরে সব দেখেছি। পথের দুধারে যেখানেই একটু বড় জায়গা সেখানেই চাষভূমি ও শিল্প কারখানা। এমনি ছিল কলকাতা থেকে নৈহাটি, ব্যান্ডেল, বনগাঁ, ক্যানিং, খড়গপুরের পথের দুপাশে। রাজনীতির বিষ বাষ্পে সব এখন ঝোপে ঝাড়ে ঢেকে গেছে। সর্বত্র স্তব্ধতা। এখানে সব ঝকঝকে তকতকে। সর্বত্র কাজ চলছে, উৎপাদন হচ্ছে ; মানুষ খাটছে, উপার্জন করছে, সুখে আছে। আমরা বেকার, শুধু চিৎকার, ঝগড়া!

একবিংশ শতাব্দী আরম্ভ হওয়াব সাতশো বছর আগে বর্তমান সুইজারল্যান্ডের কেন্দ্রভূমির অধিবাসীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে তাঁরা এক যোগে বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়বেন। ধীরে ধীরে আশপাশের অঞ্চলের মানুষও এসে তাদের সঙ্গে হাত মেলান এবং 'সুইস কনফেডারেশন' নামের একটি দেশ গড়ে তোলেন। বিভিন্ন অঞ্চলের লোক বিভিন্ন ভাষায় কথা বলেন। কুছ পরওয়া নেই। সব ভাষাই রাষ্ট্র ভাষা। সুতরাং বর্তমান সুইজারল্যান্ডে চারটি রাষ্ট্রভাষা—জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ইতালীয়ান ও রোমান্স। দেশটির দুটি নাম—সুইজারল্যান্ড এবং হেলভেশিয়া। যাঁরা ফিলাটেলি করেন, অর্থাৎ ডাকটিকিট জমানো যাঁদের হবি, তাঁরা হেলভেশিয়া লেখা টিকিট দেখে বেশ ফাঁপড়ে পড়ে যান, বুঝতেই পারেন না এগুলি কোন দেশের টিকিট। এই হেলভেশিয়ার অর্থ সুইজারল্যান্ড। এটি দেশটির লাতিন নাম।

দীর্ঘদিন ধরে স্বাধীন আছেন বলে সুইসগণ গর্বিত। হওয়ারই কথা। বারোশো বছর পরাধীন থাকার পব আমরা স্বাধীন হয়েছি ১৯৪৭ সালের পনেরোই অগাস্ট। তাও কি এমনি স্বাধীনতা মিলেছে আমাদের? না। বিদেশী শাসকবা দেশকে ধর্মের নামে খন্ডিত করে আমাদের চিরস্থায়ী দ্বন্দ্বের ব্যবস্থা করে তবে আমাদেরকে ছেড়ে এসেছে। তাই আমরা দেশের খাদ্য চিকিৎসা শিক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে পারছি না। সৈন্য পালন ও অস্ত্র খাতে আমাদের সম্পদের অধিকাংশ ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। অর্ধ শতাব্দী আগেও যারা এই দেশের অধিবাসী আমাদের ভাই ছিলেন তারা হঠাৎ করে কেবল হিংসা দেখিয়ে দেশের খন্ড পেয়ে স্বাধীন জাতি হয়েছেন, কেবল বিদ্বেষের রাজনীতি করে বেঁচে আছেন ও নিজের নাক কেটে ভারতের যাত্রা ভঙ্গ করে চলেছেন। নিজেদের উন্নতি ও শান্তির জন্য ওই প্রাক্তন ভারতীয়দের কিছুই করার নেই; ভারতের উন্নতি ব্যাহত ও অশান্তিতেই তাদের আনন্দ। সুইসরা আমাদের একবারে বিপরীত আদর্শে বিশ্বাসী। ওই দেশে কোন স্থায়ী সামরিক বাহিনী নেই। দেশের প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ নাগরিক সামরিক ট্রেনিং প্রাপ্ত। প্রতি বছর তাঁরা রিফ্রেশার্স কোর্স করেন, বাড়িতে থাকেন, ওয়ার্ডরোবে সামরিক পোশাকও থাকে। যাঁর যাঁর কাজে কর্মে আছেন। প্রয়োজন পড়লে, ইমার্জেন্সি লাগলে, ডাক আসে, তাঁরাও ইউনিফর্মটি পরে যুদ্ধক্ষেত্রে যান। যাচ্ছেন কত বারই। কিন্তু যুদ্ধ করতে হয়নি স্মরণ কালের মধ্যে। স্থানে স্থানে গোলন্দাজগিরির প্রতিযোগিতা হয়। এরা অংশ নেন, পুরস্কার নিয়ে ঘরে ফিরেন।

ছোট দেশ। আয়তন ৪১,২৮৪ বর্গ কিলোমিটার। ২০০২ সালে লোক সংখ্যা ৭৪,৪৫,০০০।

রাজধানী বার্ন নামক ছোট শহর। টাকার নাম সুইস ফ্রাঙ্ক। লোকসংখ্যার অর্ধেকের বেশি রোমান ক্যাথলিক, ৪৫ শতাংশ প্রোটেস্টান্ট। তাদের দুই ভাগ। আছেন ক্যালভিনিস্ট ও লুথেরান। আছেন কিছু অন্যান্যও। দেশটি ছাব্বিশটি প্রদেশে বিভক্ত। প্রদেশগুলিকে এরা ক্যান্টন বলেন। ছাব্বিশটি ক্যান্টনের মধ্যে তিনটি আবার নিজেদেরকে ভেঙ্গে দু' টুকরো করে নিয়েছেন। অর্থাৎ এখন তেইশটি ক্যান্টন ও ছ'টি হাফ ক্যান্টন আছে। প্রতিটি ক্যান্টনে ও হাফ ক্যান্টনে একটি করে নির্বাচিত প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট আছে। কেন্দ্রে দ্বিস্তরের পার্লামেন্ট। চার বছরের জন্য নির্বাচিত লোকসভা-সদস্য সংখ্যা দুইশো। প্রতি ক্যান্টন থেকে ও হাফ ক্যান্টন থেকে একজন করে নির্বাচিত সদস্য নিয়ে রাজ্যসভা। পার্লামেন্টের সদস্যগণ চার বছরের জন্য সাত সদস্যক মন্ত্রীসভা নির্বাচন করেন। কোন প্রধানমন্ত্রী নেই, সবাই সমান। সরকারের প্রধান রাষ্ট্রপতি। তিনিও পার্লামেন্টের সদস্যদের দ্বারা এক বছরের জন্য নির্বাচিত হন। পর পর একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে পারবেন না। রাষ্ট্রপতিটি নেহাৎই নৈবেদ্যের উপবের কলা। ওটি দিয়ে নৈবদ্য মাখলে মিষ্টি হয় না, সঙ্গে মন্ত্রীসভার গুড় দিলে মিষ্টি হয়।

১৫০০ খ্রিস্টীয় অব্দের কাছাকাছি সময়ে সুইসগন একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে সারা ইউরোপ জুড়ে যে দেশে দেশে যুদ্ধ চলছে তাতে তাঁবা কোন পক্ষ নেবেন না। আমাদেব মহান দেশে রাজারা পবস্পর যুদ্ধ করেই তাদেব যুদ্ধ তৃষ্ণা মিটাতে না পেরে মোহাদ ঘুরি, বাবর, ইত্যাদিকে ডেকে আনছিলেন তখন। এমন কি প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেব বিশ্বগ্রাসী দাবানলেও সুইজারল্যান্ড শান্তিব দ্বীপটি হযে থাকতে পেরেছে। মনে রাখবেন সকলে যে সুইজারল্যান্ডেব সঙ্গে সীমানা আছে ফ্রান্স, জার্মানী ও অস্ট্রিয়াব। চাবপাশের সমস্ত দেশ যখন সমরানলে জ্বলছে, ঝলসাচ্ছে তখন সুইজারল্যান্ড শান্তিতে আছে। হাজার হাজার শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে এই দেশ। আমাদের মনে হয় বেশ ক'টি কাবণে এই চমৎকার সম্ভব হয়েছে। প্রথমত চারশো বছর ধরে সুইজারল্যান্ড অন্যের ব্যাপারে নাক না গলিয়ে বাস করতে পারছিল। সুতরাং কোন প্রতিবেশীর সঙ্গে তার কোন শত্রুতা গড়ে উঠেনি। দ্বিতীয়ত সুইজারল্যান্ডের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা এমন যে সেখানে হিটলার বা মুসোলিনীর মত কোন মেগলোম্যানিয়াক নেতা জন্মানো সম্ভব ছিল না, আজও নেই। দেশটায় রাষ্ট্রপতি হয এক বছরের জন্য, প্রধানমন্ত্রী কেউ হয না, এমনকি একটা স্থাযী সেনাবাহিনী পর্যন্ত নেই। তৃতীয়ত সুইজারল্যান্ডে এমন কিছু নেই যার জন্য লোভাতুব বিদেশীরা সে দেশ জিতে নেওয়ার চেষ্টা করবে। ভারতের অভাবিত প্রাকৃতিক সম্পদ যুগে যুগে 'শক হুন দল, পাঠান মোগল' পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসি ও ইংবেজকে লোভাতুর আক্রমণকারী করে নিয়ে এসেছে। আলসেস লোরেন অঞ্চলেব খনিজ কয়লা ফ্রান্স ও জার্মানীকে যুদ্ধ করিয়েছে; মধ্যপ্রাচ্যের পেট্রল একদিকে ইউরোপ আমেরিকাকে লোভাতুর করেছে ও অন্যদিকে বিন লাদেন ও তার অনুসারীদেরকে সৃষ্টি করেছে। নারীব রূপ ও ঐশ্বর্য তার বিপদের কারণ। কুরূপা ও নির্ধন নিরুপদ্রবে বাস করতে পারে। সুইজারল্যান্ড এই ক্যাটাগরিতে পড়ে। তাই স্বতন্ত্র, স্বাধীন হয়ে থাকতে পেরেছে। চতুর্থত সুইজারল্যান্ডের ব্যাঙ্কের বিশ্বস্ততা ও সেই সব ব্যাঙ্কে সকল ধনপতির ধনের অবস্থিতি দেশটির শান্তির কারণ। পঞ্চমত বলি ঈশ্বরেচ্ছা। দেশের অধিবাসীদের দীর্ঘকাল শান্তিতে বাস করার পুরস্কার স্বরূপ ঈশ্বর তাদেরকে শান্তিতে বাস

করার ব্যবস্থা করেছেন। সুতরাং বলি সুইজারল্যান্ড কেবল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জনাই পৃথিবীর মাটিতে স্বর্গ হয়ে আছে তাই নয়, দেশটি শান্তির জন্যও স্বর্গ হয়ে আছে।

সুইজারল্যান্ডের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা অনন্য। কোথাও এর তুলনা নেই। এই ব্যাঙ্কগুলিতে টাকা রাখলে কোন মতেই সেই খবর অন্য কেউ জানতে পারবে না। দেশের আইন এই রক্ষা কবচ দিয়েছে। সুতরাং, অনুন্নত অঞ্চলেব বহু দেশের ভুঁইফোড় রাজনৈতিক নেতারা ও ডিক্টেটাররা দেশের সর্বনাশ করে সুইস ব্যাঙ্কে টাকা রাখেন। তাঁরা নিজেদের ক্ষমতায় থাকা সম্বন্ধে সন্দিহান থাকেন, 'কবে আছি কবে নেই' ভেবে অস্থিব থাকেন, সুইস ব্যাঙ্কে টাকা রাখেন এবং যখন আর ক্ষমতায় থাকা সম্ভব হয় না, তখন পালিয়ে যান ও সুইস ব্যাঙ্কে রাখা টাকায় বিলাসে দিন কাটান। এই তো সেদিন লাইবেরিয়ায় এই কান্ড ঘটলো। এই তো কদিন আগে উগান্ডার মহাত্রাস ইদি আমিন তেইশ বছর সৌদি আরবে বাস করে চক্ষু মুদেছেন।

একটা গল্প বলি। আমার পড়া গল্প। সুইস ব্যাঙ্কের বিশ্বস্ততার গল্প। খুব ছোট করে বলবো। প্রসঙ্গ উঠলো যখন বলেই ফেলি। এটি নেহাৎই একটি কাল্পনিক কাহিনী। কিন্তু সত্যটাও এমনি।

"আফ্রিকার একটি দেশ। ছোট দেশ। ভীষণ গবিব দেশ। দারিদ্র্যের আর তুলনা নেই। মানুষ তো নয় যেন কোন জন্তু। পোকাব মত জন্মাচ্ছে। পোকার মতই মরছে। মাঝে মাঝেই মবনোন্মুখ মানুষের ছবি ভেসে উঠে বিদেশের টেলিভিশনের পর্দায়। অনেকে সহ্য করতে পারে না এই মরণ মিছিলের দৃশ্য। কেউ চ্যানেল বদলায, কেউ বন্ধই করে দেয় টিভি। অথচ দেশে বনজ সম্পদ আছে। মাটির নীচে তেল আছে। কোথায় যায় সে সব? দেশের জনসংখ্যাও তেমন বেয়াড়া রকমের বেশি নয। মবছেও তো কত মানুষ রোগে, অনাহারে আর বছরের পর বছর ধরে চলা রাজনৈতিক কলহের অস্ত্রেব আঘাতে। আট বছরের মধ্যে নয় বার সরকার বদল হযেছে। বর্তমান সবকারটির বয়স পনেবো মাস। এটি আসার পর কিছু শান্তির আবহাওয়া দেখা যাচ্ছে। লোকে মনে করছে যে বর্তমান সবকারের তরুণ পূর্ত মন্ত্রীটিই এই স্থায়িত্ব ও শান্তিব কারণ। ছোকবা বয়স, লেখা পডা শিখেছে ফ্রান্সে। যেমন কথা বার্তায চৌকস, তেমনি চলাফেবায। তেমনি তাব সাহস। কটি তো মাস কাটলো। সে তো পূর্তমন্ত্রী মাত্র। এরই মধ্যে চারজন উচ্চস্তরের অফিসারকে ভ্রষ্টাচারের দায়ে জেলে পাঠিযেছে। সেনা বাহিনীকে বলে দিয়েছে যে ভ্রষ্টাচাবেব গল্প পেলে কাউকে সে রেয়াৎ করবে না। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট নাকি তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সে নাকি প্রেসিডেন্টকে বলেছে যে প্রয়োজনে মন্ত্রীদেরকে ধবার ক্ষমতা চাই তার। প্রীত প্রেসিডেন্ট তাকে ব্ল্যাঙ্ক চেক দিয়েছেন ক্ষমতার। প্রয়োজনে মন্ত্রী, এমনকি প্রেসিডেন্টকে গ্রেপ্তার করাবার ক্ষমতা রইল তার। তেমন অবস্থায় উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি প্রেসিডেন্ট পদে থাকবেন অস্থায়ীভাবে। আর কাজের প্রয়োজনে যতবার খুশি বিনা অনুমতিতে সে বিদেশ যেতে পারবে। খবর তো আর গোপন থাকে না। সকলে তটস্থ। দেশটিতে ভ্রষ্টাচার হঠাৎ যেন থেমে গেছে। তবে সাধারণ মানুষের ভাগ্যে লক্ষ্য করার মত তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। তারা আগে অনাহাবে হতাশায় মরতো, এখন তারা অনাহারে ও ক্ষীণ আশায় মরে।

আজ সকালে মন্ত্রী কেপটাউন যাচ্ছেন। শান্ত্রী নেই, সঙ্গী নেই, এমনকি মন্ত্রীর গাড়ি বা ড্রাইভারও নেই। দুটো স্যুটকেশ দুহাতে নিয়ে রাস্তায় এসে ট্যাক্সিতে বসে বললেন, 'এয়ার

পোর্ট; সেখান থেকে কেপটাউন। ওখানে দুই রাত দুই হোটেলে কাটিয়ে তিনি লিসবন ও জুরিখ হয়ে জেনেভায় এলেন। হোটেল থেকে ফোনে যোগাযোগ করলেন একটি সুইস ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সঙ্গে। নিজের পরিচয় দিয়ে দেখা করতে চাইলেন একা, তার সঙ্গে। ম্যানেজার জানালেন যে একা দেখা করা ব্যাঙ্কের সংবিধান বিরুদ্ধ। অন্তত আরেক জন সহকর্মী ম্যানেজার সঙ্গে রাখতেই হবে। সেই ব্যবস্থাই হলো।

তরুণ মন্ত্রীটি কম কথার মানুষ। পকেট থেকে একটি লম্বা তালিকা বার করলেন প্রাক্তন সরকারগুলির মন্ত্রীদের। এরা সব প্রতারক। দেশের অর্থ বেনামে এই ব্যাঙ্কে রেখেছে। ওই অর্থের সন্ধান চাই। ওরা বললেন, সম্ভব নয়। নিয়ম নেই। মন্ত্রী বললেন, তার দেশকে এই খবর দিলে বিনিময়ে তার সরকার দেশের সমস্ত ব্যাঙ্কিং এই ব্যাঙ্কের মাধ্যমে করবে বলে কথা দিচ্ছে। এতে ব্যাঙ্কের লাভ চারগুণ বেড়ে যাবে। ওরা বললেন, 'হবে না। নিয়ম নেই।' হঠাৎ করে মন্ত্রী রিভলবার বার করে ম্যানেজারের কানের পাশে ধরলেন, বললেন, আমি দশ গোনার সময় দিচ্ছি। রাজি হও বা মর। দশ, নয়, আট, করে গোনা চললো। ভয়ে ঘেমে নেয়ে গেলেন ম্যানেজার। কিন্তু হ্যাঁ বললেন না।

মন্ত্রী গুলি না করে উঠলেন। পুরনো সুটকেশটি খুলে দেখালেন দশ লক্ষ ডলার। বললেন, "তা হলে ম্যানেজার, আমি তোমার ব্যাঙ্কে আমার নামে গোপন অ্যাকাউন্টে এই টাকাগুলো রাখতে চাই।"

আমাদের সুইজারল্যান্ড ভ্রমন একটি ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে। বিশাল দু'টি বাস—একটি আবার দোতলা, ভর্তি করে একশ' বিশ জন ভ্রমণকারী নিয়ে চলছে তারা। আগেই চলে গেছে দু'টি মিনি বাসের মত গাড়ি। ওরা ক'দিন ধরেই আমাদের আগে আগে যাবে, চলতে চলতে রান্না-বাড়া করবে, নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে যাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করবে, ওরা পৌঁছালে পরে ওদেরকে খাওয়াবে আর ওরা যখন তাদের সাইট সিয়িং করবে ততক্ষণে আবার এগিয়ে যাবে। ওদের তো এই ব্যবসা। ওরকম তারা বারম্বার করছে। অভ্যস্ত, অভিজ্ঞ ও দক্ষকর্মী সব, সদা হাস্যমুখ উৎসাহ ব্যঞ্জক। ভোর বেলা উঠে পুত্র ও পুত্রবধু আমাদেরকে খাইয়ে ও নিজেরা কিছু না খেয়ে রওয়ানা হলো লন্ডনের পথে। হ্যাম্পস্টেড অঞ্চলে বার্কিং রোডের পোস্ট অফিস ও জব সেন্টার এর মধ্যখানে আমাদেরকে টমাস অব রোন্ডা লেখা বিশাল বাসে তুলে দিয়ে ওরা চলে গেল। মুদিতার ভাই মনীশ বা চিটু কাছেই থাকে, ওর কাছে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করে ফিরে যাবে ইপ্সউইচে। আমরা একেবারে সামনের আসনে—তিন ও চার নম্বরে বসে রওয়ানা দিলাম। ডোভারের দিকে। ওরা অনেক জায়গা থেকেই যাত্রীদেরকে উঠিয়ে নেয়। বার্কিং রোডই শেষ পয়েন্ট; ওখান থেকে সোজা ডোভার। এই পথ আমাদের চেনা। এই তো গত মাসেই এই পথ দিয়ে গেছি। তখন গিয়েছিলাম প্যারিসে। একই পথ। ডোভার থেকে ফেরি জাহাজে চড়ে ফ্রান্সের ক্যালে (calais) বন্দরে পৌঁছালাম। ক্যালেতেই অগ্রদূত রন্ধনশালা দাঁড়িয়ে আছে। সেখানেই আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজন পরিবেশিত হল। অহ্নের তখনো মধ্য হয়নি। ভোজন কিছু আগেই হয়ে গেল। ভোজন শেষে আবার বাসে বসা ও দুপাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে এগিয়ে চলা বা টিভিতে চালানো সিনেমা দেখা অথবা বসে বসে ঘুমানো।

আমাদের গন্তব্য জার্মানী ও সুইজারল্যান্ড। দীর্ঘপথ যেতে হবে ফ্রান্সের ভিতর দিয়ে। হাইওয়ে দিয়ে চলবে বাস, আসে পাশে লোকালয় পড়বে না, ট্রাফিক লাইটের বাধা থাকবে না, বাস শুধু চলতে থাকবে। দুজন ড্রাইভার। একজন যখন বাস চালাবে অন্য জন বিশ্রাম করবে। আমাদের বাসের কন্ডাক্টর গাইড শ্রীমতী ভক্তি। কলেজে পড়ে। ছুটির দিনে এই কাজও করবে। এবারের টুআরটি ভক্তির জন্যও খুব মনোরম। ভক্তির মা রাজশ্রীও যাচ্ছেন এবার। খুব সপ্রতিভ এই মহিলাও। কেনিয়ান ইন্ডিয়ান এরা। বিশ বছর ধরে লন্ডনেই আছেন। ভক্তির বাবা চাকরি করেন, ইনিও চাকরি করেন। একটা সোশাল সার্ভিস অর্গেনাইজেশানএ তার চাকরি। উনি বেড়াতে ভালবাসেন। সুযোগ পেয়েই গেলেন তাই এসেই পড়লেন। বেলা দেবীর সঙ্গে বেশ হৃদ্যতা হয়ে গেল শ্রীমতী রাজশ্রীর। ক'দিন এক সাথ চলা যাবে। বাসে বসার পর থেকেই পেছন থেকে বাংলা ভাষা ভেসে আসছিল বিশেষ করে একটি শিশু উপর্যুপরি প্রশ্ন করে যাচ্ছিল তার বাবা মাকে। শুনছিলাম আর ইচ্ছা হচ্ছিল শিশুটিকে দেখতে। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। ক্যালেতে খাবারের টেবিলের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়াবার সময়ই পরিচয় হয়ে যায় শ্রীমতী বৃষ্টির সঙ্গে। বছর পাঁচেকের বৃষ্টি একেবারে বৃষ্টির মতই সপ্রতিভ। যখন বাসে তখন তো আর কাছে আসার জো নেই। কিন্তু যখন আমরা বাইরে, খাবার জন্য, জায়গা দেখার জন্য, নৌকা বিহারেব জন্য বা অন্য কোন কাজে, তখনই বৃষ্টি চলে আসতো, হাত ধবে টান দিয়েই খল খল করে হাসি আর জিজ্ঞাসা, তোমরা এখানে? কি কচ্ছ? ইত্যাদি। ক'টা দিন বৃষ্টিও আমাদের আনন্দ বাডিয়েছে। বৃষ্টির মা মালবিকা এবং বাবা প্রতীক বি. টিব ও-টুতে কাজ করে ; থাকে লন্ডনের কাছে স্লাও নামক এক্টি জায়গাতে। এবারের ইংল্যান্ডে পরিচিত হয়েছি মহুয়া সোমজিতদের সঙ্গেও, সোমজিত ভট্টাচার্য আমাদের পুত্র প্রসূনের সঙ্গে একই কোম্পানিতে কাজ করে। সোমজিতদের বাড়ি হাওড়ায়, আর মহুয়ার বাপের বাড়ি উত্তর চব্বিশ পরগনার শ্যামনগরে। মহুয়া বলছিল যে তার বাবাও আমার মত বই পড়তে খুব ভালবাসেন এবং তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তাঁর খুব যোগাযোগ রয়েছে। শুনে খুব ভাল লাগলো। রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মভূমি জগৎ জোড়া হলেও প্রধান ক্ষেত্র তো পশ্চিমবঙ্গই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বেশি শিক্ষিত ও প্রগতিশীল হয়ে পড়ায় কর্ম ও ঈশ্বর বিমুখ হয়ে পড়েছেন। এই যখন অবস্থা তখন কেউ রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন জানলে আমাদের ভাল লাগে।

বাস যথা সম্ভব লোকালয় বর্জন করে চললেও রেইমস (Rheims) শহরের মধ্য দিয়েই গেল। রেইম্স্ একটি ঐতিহাসিক স্মৃতিজড়িত শহর। পাঁচশো বছব আগে ফ্রান্সেব বিস্তীর্ণ অঞ্চল ইংরেজ ব্যারনদের দখলে চলে যায়। রাজা তাদের হাতের পুতুল। তখন জোয়ান অব আর্ক অস্ত্র ধরেন। তাঁর নেতৃত্বে ফরাসিরা ওই ইংরেজদেবকে তাড়ায়। এই রেইমস-এ তখন প্রধান যুদ্ধ হয়, ইংরেজদের চূড়ান্ত পরাজয় হয়। এখনকার রেইমস ক্যাথিড্রালএ রাজমুকুট পরানো হয় ডফিনকে। বাস চলে, ভিতরে টিভিতে সিনেমা চলছে। বেশির ভাগ যাত্রীই ঘুমোচ্ছেন। কিছু জেগে বসে সিনেমা দেখছেন। দু'টি অতি সমৃদ্ধ প্রতিবেশী পরিবার। একটি হিন্দু পরিবার আর একটি ক্রিস্টান পরিবার। দুই পরিবারের প্রধান এখন প্রায় বৃদ্ধ ও পরস্পরের শত্রু, মুখ দেখাদেখি নেই দুই পরিবারে। কিন্তু সাতাশ বছর আগে তরুণ ছিলেন, বন্ধু ছিলেন।

তখন এক পরিবারের কন্যা আর এক পরিবারের পুত্র প্রেমের দেবতার ষড়যন্ত্রে একত্রে পালিয়ে যান। সেই থেকে দুই পরিবারের প্রীতি শত্রুতায় পরিণত হয়। এখনো তাই চলছে। এত বছর পর দুই পরিবারের হারিয়ে যাওয়া সৌহার্দ্য ফিরিয়ে দিতে এসেছেন এক তরুণ (অনিল কাপুর অভিনয় করছেন এই চরিত্রে।) চলছে সিনেমা। আমি প্রতি পাঁচ মিনিটের এক মিনিট সিনেমা দেখছি। এক মিনিট ঘুমাচ্ছি ও তিন মিনিট দ্রুত পিছনে চলে যাওয়া নিসর্গ দৃশ্য দেখছি। বিদেশে ছেলের কাছে এলে ছেলে গাড়ি করে আমাদেরকে নিয়ে জায়গা দেখায়। বধূমাতা বেল্ট বেঁধে সামনের সীটে বসে ম্যাপ হাতে নিয়ে নেভিগেট করে। আমরা পিছনের সীটে বসে বিস্কুট বাদাম কোলার সদ্ব্যবহার করি মাঝে মাঝে গল্পগাছাও করি। আজ বিশাল বাসে বসে আছি। এয়ার কন্ডিশনড বাস। কিন্তু নিঃশব্দ। ছেলে বৌমার অনুপস্থিতি অনুভব করি।

সাড়ে পাঁচটা নাগাদ রাস্তা ছেড়ে একটা সার্ভিস স্টেশনে গিয়ে থামলো আমাদের বাস। হাইওয়ে দিয়ে যখন গাড়ি চলে তখন একেবারে জনমানবহীন স্থান দিয়েই চলে। একটু পর পরই লেখা থাকে এই বাস্তা কোন দিকে চলেছে। ডাইনে বাঁযে তীর চিহ্ন দিয়ে দেখানো আছে কোথায় যেতে হলে কোন দিকে মোড় নিতে হবে। আর আছে মাঝে মাঝেই সার্ভিস স্টেশন। তীর চিহ্ন দেখাচ্ছে ওই দিকে গেলেই সার্ভিস স্টেশন। সাধারণত এক কিলোমিটারেরও কম দূরত্বে থাকে ওই সার্ভিস স্টেশন। সেখানে আছে পেট্রোল স্টেশন, বিশাল পার্ক কবার জায়গা, চা-কফি-কোলা আব কিছু কিছু খাবার একটি সুন্দব কেনাকাটার দোকান আর, সবচেয়ে বড় কথা, প্রকৃতিব ডাকে সাড়া দেবার জায়গা। কোন কোন সার্ভিস স্টেশনে থাকে একটা ছোট্ট চিলড্রেনস পার্কও। কোকাকোলাতো সর্বত্র! ১৮৮৫ সালে কোন এক ডাক্তার মাথাব্যথাব একটা ভাল ওষুধ তৈরি করার চেষ্টা করছিলেন তাঁর গবেষণা ঘরে বসে বসে। তখন তৈরি কবে ফেললেন একটি পানীয় তৈবিব ফর্মূলা। হয়ে গেল কোকাকোলা। মানবজাতির ইতিহাসে সবচেয়ে জনপ্রিয় শীতল পানীয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেই চলেছে বিশবছর ধবে। ১৯০৬ সালে কানাডা, কিউবা আর পানামায় কাবখানা তৈবি কোকাকোলা আন্তর্জাতিক বাজারে আসে। একশো বছরে সারা পৃথিবী দখল করে বসে আছে সে। প্রতি সেকেন্ডে তের হাজার কোকাকোলার বোতল খোলা হচ্ছে; চব্বিশ ঘণ্টা চলছে এই খোলা। কোম্পানীর ব্রান্ড নামের মধ্যে আছে কোকাকোলা, স্প্রাইট, ডক্টর পেপার, বাকার্ডি মিক্সার্স, নেসলে, নেস্‌কাফে, শুয়াপ্স ও ফান্টা। কোম্পানির আয়ের সত্তর শতাংশ আসে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থেকে। পাওয়া যায় তো সর্বত্র। কিন্তু ভারতের যত বড় বড় বিজ্ঞাপন দেখি, ইউরোপেব দেশে দেশে কিন্তু তেমন বিজ্ঞাপন দেখলাম না।

সার্ভিস ষ্টেশনে বাস থামতেই ভক্তি বাসেব পেট থেকে ড্রাম ভর্তি কফি ও কাগজের কাপ বার করলো। সবাই খুব খুশী। বৃষ্টি নেমেই হাঁত ধরে টান দিয়ে বলে, 'তুমি কফি খাবে?' আমি বললাম, খাব। তুমি খাবে? সে বলে, 'না আমি খাই না। বাবা বলে বাচ্চারা খায় না, তুমি কিচ্ছু জান না।' কফি খেয়ে, এদিক ওদিক একটু হেটে, দুটো পা একটু চালিয়ে আবার গিয়ে বাসে বসা গেল। আবার চলা। সূর্যদেবও ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তিনিও অস্ত যাওয়ার পথে। বাসের যাওয়ার আর শেষ নেই। দেখতে দেখতে চলা। জমি, গাছ, জঙ্গল সব বেগে পেছন দিকে চলছে। বাস অবশেষে ষ্ট্রসবুর্গে এসে পৌঁছল।

স্ট্রসবুর্গ। স্ট্রসবুর্গ একটি জার্মান শহর। নামটির অর্থ যুদ্ধ নগরী। জার্মান-প্রধান শহর হলেও এটি ফ্রান্সের অন্তর্গত। পূর্ব ফ্রান্সের আলসেস অঞ্চলে স্ট্রসবুর্গ অবস্থিত। আলসেস ও লোরেনের অঞ্চল খুব খনিজ সমৃদ্ধ। প্রধান খনিজ কয়লা। এই খনিজের জন্য আলসেসও লোরেনে দখল নিয়ে ফ্রান্স ও জার্মানীর (জার্মানীর আগের নাম প্রুশিয়া) মধ্যে অনেক যুদ্ধ হয়েছে, অনেক বার অঞ্চল দু'টি এর বা ওর দখলে গিয়েছে। এখন এটি ফ্রান্সের অন্তর্গত। এই স্ট্রসবুর্গ শহর আলসেস অঞ্চলে বার্নডিন প্রদেশের রাজধানীও বটে। আলসেস অন্য একটি কারণেও বিখ্যাত। এখানে একটি নতুন কুকুর প্রজাতির জন্ম হয়। আলসেসে জন্ম বলে কুকব প্রজাতিটির নাম অ্যালসেশিয়ান। কুকুরটির অন্য একটি নামও আছে, সেটি হল জার্মান শেফার্ড। খ্রিস্টপূর্ব যুগে স্ট্রসবুর্গ একটি কেলটিক গ্রাম মাত্র ছিল। সামরিক প্রয়োজন অনুভব করায় রোম সম্রাটগণ এখানে একটি স্থায়ী গ্যারিসন রাখতেন। রোমানগণ এই স্থানটির নাম দিয়েছিলো আর্জেন্টারোটাম। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে ফ্রাঙ্করা এটি দখল করে। তারা এটির নাম দেয় ষ্ট্রটেবুর্গস্। সেই নামই জার্মান বুলিতে একটু বদল হয়ে স্ট্রসবুর্গে পরিণত হয়েছে। পঞ্চদশ শতকের রিফর্মেশানের সময়ে এখানকার সব অধিবাসীই প্রোটেস্টান্ট হয়ে যান। কিন্তু এরা পরবর্তীকালে যুদ্ধ পরিহার করে থাকতে চেষ্টা করেন। তাই প্রোটেস্টান্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে যে ত্রিশ বছর স্থায়ী যুদ্ধ চলছিল তাতে স্ট্রসবুর্গ কোনপক্ষেই যোগ দেয়নি। ১৭৯২ সালে কবি রুখেলিল এখানে বসেই ফ্রান্সের জাতীয় সঙ্গীত 'লা মার্সাই' লিখেন। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে স্ট্রসবুর্গ জার্মান দখলে যায়। পরে আবার ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত হয়। একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতকে নির্মিত এখানকার নত্‌র দাম ক্যাথিড্রাল একবার ১৮৭০ সালে আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দু-বারই বহু ব্যয় করে গির্জাটির সংস্কার সাধন করা হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের স্যাতু দ্য রোহন একটি বড় প্রাসাদ। এখন ওটিতে তিনটি বড় মিউজিয়াম চলছে। ১৯১০ সালে এখানে স্থাপিত হয়েছে ষ্ট্রসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইউরোপীয়ান পার্লামেন্ট। শহর থেকে সামান্য দূরে পূর্ব দিকে রাইন নদী বন্দরটি রয়েছে। বন্দরের সুবিধার জন্য ওরা খাল কেটে বন্দরটির সঙ্গে মার্নে ও রোন নদীর সংযোগ সাধন করে নিয়েছেন। এখন তিনটি নদী দিয়েই আমদানি ও রপ্তানি পণ্য যায় ও আসে।

রাতে এসে স্ট্রসবুর্গ শহরের হোটেল লাফোরাম মার্কারির প্রাঙ্গনে বাস থামলো। দোতলা বাসটি এসে আগেই দাঁড়িয়ে আছে। আমরা নামলাম। বৃষ্টি এসে ছোট দুটি হাত দিয়ে ধাক্কা মেরে জিজ্ঞাসা করে, 'দাদু, এখানে আমরা আজ থাকবো? ঘুমাবো?' বললাম, হ্যাঁ। সবাই লাইন করে ঢুকছে। লাইনে দাঁড়িয়ে যাই। এগিয়ে যেতে যেতে একেবারে ডাইনিং হলে। রান্না বোধ হয় গাড়িতেই হয়েছে। খাবার ও রাতে শোবার জন্য এই হোটেলে ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদের ছোট দুই গাড়িতে আসা সুপকারগণ ভারতীয় পদ্ধতিতে নিরামিষ রান্না করবেন। এসব ইউরোপীয় হোটেলে করানো সহজ নয়। তাছাড়া নিজেরা ব্যবস্থা করলে খরচও কম পড়ে। তবে এসব হোটেলে থাকার ব্যবস্থা হলে ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থাও হয়ে যায় এক খরচেই। বিদেশে ব্রেকফাস্ট খুব চমৎকার। রুটি, মাখন চীজ জ্যাম, দুধ, কর্নফ্লেকস্, দই, মধু, চা, কফি, ইত্যাদি থরে থরে সাজানো। রুটিই কত রকমের। সাধারণ স্লাইসড় পাউরুটি তো আছেই। আরো আছে লম্বা, গোল ফুলের মত, কত রুটি। আছে ফ্রুট স্যালড। নিজের

হাতে নাও, যত পার খাও, যত বার খুশি নাও। দয়া করে ফেলবে না কিছু। রাতের খাওয়ার জন্য আট জনার এক টেবিলে বসলাম। সঙ্গের ছুজন লাহোরের। তবে থাকেন লন্ডনের উপকণ্ঠে। রফিকুল ও জয়নাবের চারটে সন্তানেরই জন্ম এদেশে। খাওয়ার পরে থার্মকলের থালা গেলাস নিজেই তুলে জায়গায় জায়গায় রাখা পলিথিনের বিরাট কালো ব্যাগে ফেলতে হয়। রফিকুল-জয়নাবের দ্বিতীয় মেয়ে রাহিনা তাদের নিজেদের গুলি নিয়ে জায়গায় ফেলে আমাদের গুলিও নিলো। বাবা-মায়ের আদেশ। আমরা কিছুতেই নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারলাম না। এর নাম ভব্যতা। আমাদের দেশ থেকে এসব হারিয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টি অদূরে বসে খাচ্ছিল আর মিষ্টি মিষ্টি আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসছিল।

খেয়ে দেয়ে নীচে নেমে এসে শুনলাম একটি বিপদ ঘটে গেছে। আমাদের দুটো বাসেই দুজন করে ড্রাইভার। আমাদের বাসে উইল ও রবার্ট ; দ্বিতীয় দোতলা বাসটিতে দুজন বাবা ও ছেলে, স্মিথ ও সাইমন। আজ হোটেল মার্কারিতে পৌঁছেই ওরা খবর পেয়েছে যে স্মিথের স্ত্রী অর্থাৎ সাইমনের মা হঠাৎ মারা গেছেন। ব্যবস্থা হয়েছে যে কাল ভোরের প্লেনেই স্মিথ ও সাইমন চলে যাবেন বাড়ি। তাই কাল থেকে এককেটি বাসে একজন করে ড্রাইভার থাকবে। রবার্ট চালাবে দোতলা বাসটি আর উইল চালাবে আমাদেরটি। ভক্তি আমাদেরকে অনুরোধ জানায়, আমরা যেন দয়া করে একটু সহ্য করে চলি। একজন ড্রাইভার সারাদিন বাস চালাবে। তাই প্রোগ্রাম মত সব জায়গায় সময়মত পৌঁছাতে না পারলে আমরা যেন রাগ না করি। আরো একটু গোলমাল। সকলের রাতে শোবার জায়গা হোটেল লা ফোরাম মার্কারিতে হলো না। আমাদের গাড়ির যাত্রীগণ কনটিনেন্টাল হোটেলে যাব। সকালে উঠে এখানে এসেই ব্রেকফাস্ট হবে। ওঠা সাতটায়, বাস সোয়া সাতটায়, ব্রেকফাস্ট সাড়ে সাতটায়, বেরিয়ে পড়া সাড়ে আটটায়। সব কাঁটায় কাঁটায়, ইন্ডিয়ান টাইম নয় কিন্তু। শ্রীমতী রাজশ্রী ভক্তির কথা শুনে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। আমরা লজ্জায় মাথা নোয়ালাম। কতবার আর ভারতীয়দের সময় চেতনার অভাবের এই ধিকৃত রসিকতা শুনব?

হোটেল লা ফোরাম মার্কারিতে প্রাতরাশ সেরে রওয়ানা। প্রথমে রোন নদী পার হওয়া। এখানে রোন নদীই ফ্রান্স ও জার্মানীর সীমানা নির্ধারণ করছে। পার হয়ে যাব সীমান্ত অফিসও। আমরা ট্যুরিস্ট বাসে যাচ্ছি বলে সীমান্ত অফিসগুলি আমাদেরকে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না। কাগজ পত্র দেখছে না। সীমান্ত আসার আগে ভক্তি বলে সবাই পাশপোর্ট হাতে রাখ ওরা দেখতে চাইতে পারেন। সীমান্তে বাস থামে, ভক্তি যায়, ফিরে এসে বলে, ইউ আর লাকি, দেরি হলো না, এরা কিছু দেখতে চাইলেন না। জার্মানীতে ঢুকেই আমরা ব্ল্যাক ফরেস্টে পড়লাম। বেশ উঁচু পাহাড় দু-দিকে। গোড়া থেকে চূড়া পর্যন্ত এক ধরনের বড় গাছে ঢাকা সেই পাহাড় গুলো। ঘন কালো, সবুজ পাতায় ঢাকা গাছ। তাই ফরেস্টের নাম ব্ল্যাক ফরেস্ট। গাছগুলোর নাম ওক, বীচ ও ফার। ওক ও বীচ নীচের দিকে ফার উপরে হয়। ফারই বেশি কালো দেখায়। বিশাল অরণ্য, তিন হাজার বর্গমাইলেরও বেশি। রাস্তা শহরের রাস্তার মতই মসৃণ। দুদিকে পাকা ড্রেন। তবে রাস্তা তত প্রশস্ত নয়। আমরা জার্মানীতে তত কিছু দেখব না। তবু স্পর্শ করা হলো। শান্ত ফ্রেইবুর্গ শহরের মধ্য দিয়ে বাস গেলে মনে হল শহরটি ব্ল্যাক ফরেস্টের মধ্যে কেউ বসিয়ে রেখেছে।

জার্মানী। কেবল যুদ্ধ আর যুদ্ধ এই দেশের ইতিহাস। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে এই দেশ দুভাগ হয়ে যায়। কমিউনিস্ট সোভিয়েত দেশের সৈন্যরা দেশের যতটা অঞ্চল দখল করে নিতে পারে সেটা হয় পূর্ব জার্মানী আর আমেরিকান সৈন্য যতটা দখল করে সেটা হয় পশ্চিম জার্মানী। পূর্ব জার্মানীর রাজধানী হয় বার্লিন আর পশ্চিম জার্মানীর রাজধানী হয় বন। বার্লিন পূর্ব জার্মানীর মধ্যে হলেও সমস্তটা শহর রুশ দেশের সোভিয়েত সৈন্যরা দখল করতে পারেনি। অনেকটা আমেবিকানদের কব্জায় চলে যায়। সেটা পশ্চিমের সাথেই থাকে। বিষম গোলমাল হয়ে পড়ে। কমিউনিস্ট পূর্ব জার্মানীব দেশের লোক পশ্চিম বার্লিনে পালিয়ে যেতে চায়। তখন তাবা পশ্চিম বার্লিনের চাব দিকে দেয়াল তুলে এই লোক পালানো বন্ধ করে। সেই সময় (বোধ হয় ১৯৭৫/৭৬ সালে) অধুনা লুপ্ত, লন্ডন থেকে প্রকাশিত Punch পত্রিকায় প্রকাশিত একটি ব্যঙ্গ চিত্রের কথা মনে পড়ে। বার্লিন শহর। একটা কাঁটা তারের বেড়া। এপাশে পশ্চিম আর ওপাশে পূর্ব বার্লিন। পূবের তাগড়া একটি কুকুর পশ্চিমে পালাবার চেষ্টা করছে। পশ্চিমে দাঁড়ানো একটি শীর্ণকায় জাতভাই মনযোগ দিয়ে ব্যাপারটা দেখছে। দেখে টেখে সে বলছে, 'তোকে দেখে তো মনে হয় ওবা খাওয়া টাওয়া দেয় ভালই। তুই পালিয়ে আসতে চাইছিস্ কেন?' সে উত্তর করে, 'হ্যাঁ খেতে দেয় খারাপ না। কিন্তু ঘেউ ঘেউ করতে দেয় না।' অলম অতি বিস্তরেণ। দুই জার্মানী দুই বার্লিন আর নেই। ওরা একত্র হয়ে গেছে। সকলেই জানেন। খন্ডিত ভারত একত্র হবে? কেউ বলতে পারেন? আমরা হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, ইত্যাদি অভিধা ভুলে কেবল ভারতীয় হয়ে এক সাথে সমান অধিকারে বাস কবতে পারবো আবার? পারবো। বোধ হয়। ক্যাথলিক আর প্রোটেস্টান্টরা শত শত বৎসর ধরে খুনো খুনি করেছে। এখন তো আর করছে না। কত যুদ্ধ হয়ে গেছে। একটু আধটু এখনো আছে। যেমন ওই আয়ারল্যান্ডে। তবে চলে যাবে। আমাদেরও যেন এসব বিভেদ চলে যায়। হে ভগবান।

বাস চলে। আমরা টি. টি. সীতে এসে পৌঁছলাম। টিটিসী একটি ছোট শহর। প্রায় চার দিকেই পাহাড আর একটি বেশ বড় হ্রদ। হ্রদের তিন পাশে পাহাড়, এক পাশে টি টি সী। সব পাহাড়ই কালো অরণ্যে ঢাকা। এটি 'কুক্কু ক্লক' বা কোকিল ডাকা ঘড়ির জন্ম স্থান। দুই বাসের যাত্রীরাই গাইডদের অনুসরণ করে Drubba Family-র Black Forest **Clock Center** এর দিকে চললাম। কিন্তু প্রথমে সেখানে না গিয়ে লেকে নৌকা বিহারে যাওয়া গেল। চারদিকে কালো বনে ঢাকা পাহাড, মধ্যে কালো জলের হ্রদ। মাইল তিনেক লম্বা ও মাইল দেড়-দুই পাশ। অনেক নৌকা। এক জনের, দুজনের চারজনের ও বড় নৌকা। একটা মাঝারি নৌকায় আমরা যাট জন উঠলাম। কিছু নীচে, কিছু উপরে। সবাই কালো জলের উপরে বসে ছবি তুলছে। বৃষ্টির বাবা প্রতীক রেগে যাচ্ছেন। মেয়েটা কিছুতেই দু-মিনিট স্থির হয়ে বসে বাবাকে ছবি তোলার ফুরসত দিচ্ছে না। বাপের রাগ দেখে বৃষ্টির মা মালবিকা ঝামটা দিয়ে একটি আধা মিথ্যা কথা বললেন। বললেন, 'অত রাগ করছ কেন? তুমিও এই রকমই ছিলে। প্রতীক যে এই রকম ছটফটেই ছিল তাতো মালবিকা আর দেখেন নি, তবু বললেন। সবাই খুব গল্প করছেন আর ছবি তুলছেন। আজকাল সাধারণ ছবি তোলার ক্যামেরার খুব উন্নতি হয়েছে। সবাই ছবি তুলতে পারে। ছবি নষ্ট প্রায় হয়ই না। কিন্তু তা

হলেও মানুষ আর স্থির চিত্র তুলেই সন্তুষ্ট থাকতে পারছে না। চলমান ছবি তুলতে চাইছে। অনেক ভিডিও ক্যামেরা হাতে হাতে। মুঠিব সাইজের ক্যামেরা। বেলা গুনলেন। আমাদের বাসের ষাট জনের মধ্যে এগারো জনেই ভিডিও ক্যামেরা এনেছেন। তাদের আবার স্টিল ক্যামেরাও আছে। এই তো মালবিকার হাতে ভিডিও ক্যামেরা আর প্রতীকের হাতে স্টিল ক্যামেরা। কত পরিবর্তন হল। আমার তো মনে পড়ে। এই সেদিনের কথা। কলেজের মুখপত্রের জন্য শিক্ষকগণ ও ছাত্র ইউনিয়নের সদস্যগণ সহ ছবি উঠবে। চেয়ার সাজিয়ে সকলকে বসিয়ে ক্যামেরাম্যান গলদ ঘর্ম। ট্রাইপডের উপর ক্যামেরা বসিয়ে বড় কালো কাপড়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। ফটোগ্রাফার সেই কালো কাপড়ের তলায় বারম্বার যাচ্ছেন ও বেরুচ্ছেন। যে অধ্যক্ষকে সকলে ভয কবি, ফটোগ্রাফাব তাঁর সামনে গিয়ে অকুতোভয়ে তাঁর মাথা দু-হাতে ধরে ডান বাঁ করছেন। একটু সোজা বা নত করছেন। অবশেষে কালো কাপড়ের তলায় গিয়ে দুই তক্তার মাঝে রাখা ফিল্ম বার কবে ক্যামেরায় দিয়ে 'সবাই রেডি' বলে সতর্ক করে দিয়ে ক্লিক করলেন। আমাদেরকে উঠাব চেষ্টা করায় বাবণ করলেন, একটা ফিল্ম খুলে আর একটা পরিয়ে আবাব সবার উপব চোখ বুলিয়ে, 'রেডি' বলে, ক্লিক করে ছুটি দিলেন। পাক্কা পঁয়তাল্লিশ মিনিট চলে যায় ছবি তুলতে। সেদিন ছাত্র ইউয়িনের সম্পাদক ছিলেন যিনি আজ মন্ত্রীসভার সভাপতি তিনি। নামবার সময় দেখি যে নৌকাটায় উঠেছিলাম সেটাতে নাম লেখা Gotz Von Berlichjngton. পাশে দাঁড়ানো প্রবীণ নাবিককে নামটা পড়তে বললাম। তিনি ইংবেজিতেই বললেন, "উচ্চারণ করতে পারবে না। এটা গটস্ ফন বিয়ারলিশিয়েন। একজন প্রাচীন কালেব নাইট (Knight) এর নাম। নেমে পড়ি। সবাই এগিযে গেছে। ওই যাচ্ছে। অচেনা জায়গা আবার হাবিয়ে গেলে কেলেঙ্কারি। মাথা পিছু চার ইউরোর (এক ইউরো সমান সাতান্ন টাকা) নৌকা বিহাব এক ঘণ্টায় শেষ।

এবার ঘডি ঘরে। কুক্কু ক্লকেব জন্মস্থানে। শীতেব জাযগা তিন সাডে তিন মাস এত শীত যে তখন কোন কাজ থাকে না। ১৬৪০ সালে সাবা শীতে একজন টুকটাক করতে কবতে এই টিটি সীতে বসে একটা কাঠের ঘডি তৈবি কবে ফেলেন। পুরোটাই কাঠের, আর কিছু নেই। যে গ্রামে বসে তিনি ঘড়িটি তৈবি করেছিলেন, সেটি টিটিসীব কাছেই। নাম—গ্লাস হফ্। সময় চলে আব ঘড়ি নির্মাতাব সংখ্যা বাড়ে। শীতেব সময কাজে লাগে। বিভিন্ন ধরনেব ঘড়ি তৈরি হতে হতে শেযে 'শিল্ডারুড়' তৈবি হয। ১৭০০ সাল নাগাদ ঘড়িতে মিনিটের কাঁটা আসে এবং ঢং ঢং শব্দ সংযোজিত হয়। ১৭৬০ সাল নাগাদ একজন ঘড়ির কারিগর ঢং ঢং এর পরিবর্তে কুক্কুরু-অর্থাৎ কোকিলের শব্দ যোজনা করতে সক্ষম হন। আজ যে কুক্কুরু ক্লকের চেহারা রেলের স্টেশন ঘরেব মত দেখা যায়, সেও কতদিন হল। ১৮৬০ সালে ব্ল্যাক ফরেস্টে রেলগাড়ি আসার পর থেকেই এরকম ঘড়ি তৈরি হয়ে আসছে। এখন ইলেকট্রনিক্সের যুগ। কোয়ার্জস ঘড়ি চলছে বাজারে। কিন্তু হাতে তৈরি এই ঘড়ির বিশ্বস্ততা ও বনেদিয়ানার তুলনা নেই। দাম একটু বেশি পড়ে যায়। শিল্পী কারিগরেরও তো সংসার চালাতে হয়। দোকানে হাতে তৈরি ঘড়ির সঙ্গে কারখানায় তৈরি ঘড়িও দেখলাম—Tissot, Omega, Citizen, ইত্যাদি। কাটগ্লাসের কত নয়ন লোভন সামগ্রী। কাট গ্লাসের একটি গোলাপ ফুলে চোখ আটকে গেল। দামটা দেখলাম। ভারতের টাকায় চব্বিশ হাজার টাকার মত।

ভক্তি ওখান থেকে হাত দিয়ে ডাকছে, আমাদের খাবার তৈরি। আগে আগে বৃষ্টি তার মা বাবার সঙ্গে এগিয়ে চলছে। আমাদেরকে দেখেনি। খাওয়ার জায়গায় গিয়ে খাওয়া সারা হল। দু-টোর সময় বাসে গিয়ে আসন গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করা হলো। আজ আমরা সুইজারল্যান্ডের এঙ্গেল বুর্গে গিয়ে রাত্রিবাস করবো। আসলে এঙ্গেল বুর্গে আমাদের দুই রাতই থাকা হবে। দু-টোর ক মিনিট আগেই বাসে উঠে বসলাম। সবাই একে একে উঠছেন, আমাদের দিকে স্মিত মুখে তাকিয়ে পেছন দিকে যাচ্ছেন। বৃষ্টি যাওয়ার আগে কল কল করে বলে গেল, তোমরা আগেই উঠে বসে আছ? আমরা এখন এলাম। দোকানে কত কিছু দেখলাম! তোমরা যাওনি কেন? আর ভাল লাগছে না? আমারও ঘুম পাচ্ছে। বিশ মিনিট যায়। একটি পরিবার আসছে না। সবাই বিরক্ত। এত বলার পরেও সময়ের দিকে কোনও লক্ষ নেই! এলেন তাঁরা। বাসে আসার জন্য রওয়ানা দেওয়ার সময়ই বাচ্চার রেস্ট রুম যাওয়ার তাগাদা। তাই দেরি হয়ে গেল। নইলে তাঁরাই সবার আগে এসে বাসে উঠে বসে থাকতে পারতেন! সিনাহ্ জোরি।

যাত্রা শুরু আবার। ব্ল্যাক ফরেস্ট শেষ হয়নি এখনো। আমরা সুইজারল্যান্ডে প্রবেশ করলাম। সীমান্ত কর্মীগণ এবারও পাশপোর্ট দেখতে আগ্রহী হলেন না। ফরেস্ট শেষ। কিন্তু দুদিকেই পাহাড়। এবার পাহাড়ের চেহারা অন্য রকম, আগাপাশতলা চাষ করা। পাহাড়গুলি সবুজ, হলুদ, বেগুনি, কমলা, কালো, চাদর গায়ে দিয়ে বসে বসে আমাদের যাওয়া দেখছে। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে ছোট ছোট একটা শহর। শহর তো নয়, কেউ যেন খেলনা বাড়ি বসিয়ে সাজিয়ে রেখেছে পাহাড়ের গায়ে। কি যে সুন্দর তা বলে বোঝাতে পারি না। কেবলই মনে হয় এত খাড়া পর্বত গাত্রে চাষ হয় কেমন করে? এত খাড়া পাহাড়ের এত উঁচুতে মানুষ থাকে? জল পায় কোথায়? যাতায়াত করে কেমন করে। এইজন্যই লোকে সুইজারল্যান্ডকে পৃথিবীর বুকে স্বর্গ বলে। এরা মিলিটারি পোষে না; এদের পুলিশের খরচও কম। আমরা দেশের ভাই বিদেশী হয়ে শত্রু হয়ে গেছে যারা তাদের রুখতে মিলিটারি রাখি, দেশের ভিতরে সন্ত্রাস রুখতে দেশের সম্পদ খরচ করে পুলিশ, বি এস এফ, সি আর পি এফ-র', কত কিছু রাখি; তবু ওরা তেলের পাইপ উড়িয়ে দেয়, রেলের গাড়ি গুড়িয়ে দেয়, বাজারে-তীর্থস্থানে-পথে-ঘাটে নিরপরাধ মানুষ মারে; পার্লামেন্ট আক্রমণ করে আমাদের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চায়। সুইজারল্যান্ডের মত আমরাও যদি মিলিটারি ও প্যারামিলিটারিতে দেশের লক্ষ লক্ষ স্বাস্থ্যবান যুবককে না ঢুকিয়ে উন্নতির কাজে লাগাতে পারতাম; হাজার হাজার কোটি টাকা অস্ত্র তৈরি, আমদানিতে খরচ না করে তা শিক্ষা দিতে, স্বাস্থ্য রক্ষা করতে ও নিরন্নের জন্য অন্নের ব্যবস্থা করতে লাগাতে পারতাম, তাহলে দশ বছরে কবির স্বপ্ন 'ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে' পুরণ হতো। কিন্তু দেশটায় বিভিন্ন ছদ্মবেশে এত জুডাস ইস্কারিয়ট বসে আছে। যে তা করা যাচ্ছে না। কবে করা যাবে কে জানে!

গাড়ি চলছে। আমরা এয়ার কন্ডিশনড্ বাসে বসে আছি বাইরে গরম। টিভিতে দেখেছিলাম যে এবার সুইজারল্যান্ডে আড়াইশ বছরের মধ্যে সব চেয়ে বেশি গরম পড়েছে। বাইরে এখন ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সুইজারল্যান্ড পাহাড়ি দেশ বলে এদেশের পথের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হলো টানেল। দশ, পনেরো, বিশ মিনিট পর পরই একটা পাহাড়ের পায়ের তলা দিয়ে গুড়ি

মেরে কত গাড়ি বাস ট্রাক চলে যাচ্ছে। বেশির ভাগ টানেলই ছোট, দু-মিনিটেই পার হয় যায় গাড়ি। কোন কোনটা এত লম্বা যে দশ মিনিট ধরে চলেও সেই সুড়ঙ্গ পথ আর শেষ হয় না। আছে ছোট ছোট ব্রীজ, ছোট বড় কত জলাশয় বা লেক। বেলা যতই পড়ে আসছে বাইরের পরিবেশ ততই বদলাচ্ছে। দূবের পাহাড়গুলো ততই কাছে চলে আসছে, কর্ষিত ভূমি ততই কমছে। এবার বাসের রাস্তা ও রেল গাড়ির রাস্তা প্রায় পাশাপাশি। উঁচু পাহাড দাঁড়িয়ে আমাদেরকে গার্ড অব অনার দিচ্ছে। বৃষ্টি নেমেছে। সামনের পীচের রাস্তা ভিজে গেছে। পাশের মিটার গেজ রেলের লাইন চিক চিক করছে। আমরা এগিয়ে যাই। এবার খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠা। পাশের রেল লাইন ন্যারো গেজ হয়ে গেছে। এবার ন্যারো গেজেও তিনটি লাইন, মাঝের লাইনটি খাঁজ কাটা, গিয়ার ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবে ট্রেন। খেলনা গাড়ি। এমন লাইন, খেলনা গাড়ি হাওড়া থেকেও একটা ছিল, উঠে গেছে। দার্জিলিং যেতে এই গাড়ি আছে। আছে উটিতেও। সেই গাড়ি আমরা চড়েছি। এদিকে নীচে সূর্যালোক নেই। পাহাড়ের মাথায় সিদুঁর তিলক সূর্যালোক এখনো আছে। বিকেল সাতটা চল্লিশ। বাস এসে থামলো এঙ্গেলবুর্গে। ভক্তি বললো, একটু অপেক্ষা করুন, আমি দু-মিনিটে আপনাদেব থাকার জায়গা দেখে আসছি। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে।

দু-মিনিটের মধ্যেই ভক্তি এসে গেল। পাশের বাড়িটিই হোটেল ইউবোপা বা Eropaischer Hof. এটাতেই আমাদের থাকাব জায়গা। গিয়ে দেখি কজন আগেই গিয়ে লাইন দিয়ে দাঁড়িযে পড়েছে; নাম লিখিয়ে ঘরেব চাবি নিযে যাচ্ছে। গিয়ে দাঁড়াতেই ভক্তি মিস্টার দার বলে একটা চাবি নিযে হাতটা আমাব দিকে বাড়িয়ে দিল। অর্থাৎ, মেয়ে আমার আসাব আগেই—কেউ আসার আগেই—আমাদেব ঘর দিয়ে দিয়েছে। লন্ডনে বার্কিং রোডে আমাদেবকে বাসে তুলে দেবার সময় প্রসূন-মুদিতা ভক্তিকে বলেছিল আমাদেরকে দেখতে। মেয়ে কেবল দেখছে না। মাঝে মাঝে বলছে, তোমার ছেলে ছেলের বৌ বলছিল তোমাদেরকে দেখতে, দেখছি তো? বলেই হাসছে। মুখে বলছে 314, মানে তিন তলায় চৌদ্দ নম্বব ঘব। আমার মুখখানা বোধ হয় বিমর্ষ দেখলো মেয়ে। আগেই বলে বেখেছিলাম আমাদেবকে যত নীচুতে ঘব দেয় ততই ভাল। হেসে ফেলে বলে, তিন তলায়ই তো; আর লিফট আছে। ওই তো লিফট্। আমার বিমর্ষতা কেটে গেল। উঠে গিয়ে দরজা খুলে ঘরে গেলাম। ঘর দেখে বেলা এত খুশি যে একেবারে নেচেই উঠে। হাঁটুতে ব্যথা কিনা, সে চেষ্টা করলো না। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠে, বাহ্ আমার স্বপ্নের ঘর। দরজা জানালা সব ক্রীম রঙের; টেবিল, চেয়ার, আলমারি বাদামি, আর বিছানা? দুগ্ধফেননিভ—বালিশ, চাদর, লেপ, সব। বিশাল জানালা খুলে বাইরে বারান্দা। সাদা দুটি চেয়ার, বসো। বাঁদিকে প্রায় হোটেলের গায়ে লেগে উঁচু পাহাড়, সামনে রামাদা ট্রিট (হোটেল), তার পেছনে পাহাড দেখা যায়, ডান দিকে এই হোটেল ইউরোপারই আরেকটি উইং, সেদিকে আর কিছু দেখা যায় না। পটাপট কটি জানালা খুলে যায়, আমাদের সহযাত্রী কজন বেরিয়ে আসেন। আনন্দিত মুখ সব। ঘর দেখে সকলের সারাদিনের ক্লান্তি কেটে গেছে। নাহ্, বড় ঠান্ডা, চল ঘরে। মুখ হাত ধুয়ে তৈরি হয়ে নীচে নামতে হবে। ভক্তি বলেছে সাড়ে আটটায় সবাইকে খাওয়ার জায়গায় নিয়ে যাবে। কিন্তু কে শোনে কার কথা? আমার ঠান্ডা লাগলেও ওর তো ঠান্ডা লাগছে না, ওর ভাল লাগছে। আমি ভেতরে

যাই। তৈরি হই। ওকে টেনে আনি, দেরি হয়ে যাবে বলি, ক্ষুধা লেগেছে, ঘুম পাচ্ছে বলে তৈরি হতে পাঠাই। ভক্তির সৈনাপত্যে সকলে মিনিট পাঁচেক হেঁটে হোটেল হোক্নেহোতে গেলাম। সেখানে আমাদের ডিনারের ব্যবস্থা। বৃষ্টি এসে জিজ্ঞেস করে, বসে গেছ?' ভক্তির মা রাজশ্রী আসেন, জিজ্ঞেস করেন, 'আর য়্যু ওক্কে?' মিসেস প্রসাদ বলেন, আপ আ গয়া? খুব ভাল খাবার। বলাই বাহুল্য, খাবার তৈরি করেছেন সঙ্গে আসা স্বজনবর্গ। হোটেল হোক্নেহো দিয়েছেন ডিনার হলটি। শেষ পদ ক্ষীরও দিলেন ওরা। সবাই তৃপ্ত। হোটেল ইউরোপার লাউঞ্জ থেকে কটি ব্রোশার তুলে নিয়ে ঘরে। নিদ্রা।

সকালে উঠে টিভি খুলেই খারাপ খবর। CNN জানাচ্ছে গতকাল বোম্বেতে বোমা বিস্ফোরণ, হতাহত ও রেলের লাইন থেকে ডিটোনেটর উদ্ধারের কথা। বিদেশে এলে একটা জিনিস খুবই খারাপ লাগে। টিভি দেখলে মনে হয় যে আমার দেশটা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। সেই দেশের কোন খবরই থাকে না। কেবল ভয়ঙ্কর কিছু ঘটলে তবেই এরা সেই খবরটা দেয়। সুইজারল্যান্ডে এঙ্গেলবুর্গে ঘুম থেকে উঠে হোটেল ইউরোপার ঘরে টিভি খুলে সি এন এন-এর কাছ থেকে আজ এই খবর শুনলাম। মনটা খারাপ হয়ে গেল। দুজন নীচে নামলাম। রাজকীয় ব্রেকফাস্ট থরে থরে সেজে বসে আছে। জনা দশ বারো নীচে নেমে প্লেটে খাবার নিতে শুরু করেছেন। আমরাও কিছু নিয়ে একটা টেবিলে বসে গেলাম। তাড়া নেই। যতবার খুশি আনা যাবে। আমি তো দু-কাপ কফি নিই। কাপও বেশ বড় বড়। মিসেস প্রসাদ, মিস্টার প্রসাদ ও তাদের বছর দশেকের ছেলে সানি এসে গুড মর্নিং বলে আমাদের টেবিলেই বসলেন। মিসেস প্রসাদ আমাদেরকে স্নেহ করতে শুরু করেছেন। আমি কফিতে চিনি নিইনি লক্ষ করে জিজ্ঞেস করায় জানালাম যে আমার চিনি নেওয়ার জো নেই, আমি ডায়াবেটিক। মিস্টার প্রসাদ উঠে গেলেন ও আসুক্কাব লেখা দুটি প্যাকেট এনে আমাকে দিলেন। মিস্টার প্রসাদ কথা বলেন কম, কাজ করেন যথাযথ। একটু হেসে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে কফির কাপে 'চিনি নয় কিন্তু মিষ্টি' সেই আসুক্কবের প্যাকেট ছিঁড়ে ঢেলে নিলাম। একটা অসুবিধা হল। মিষ্টি না খাওয়া জিভে মিষ্টি বড় বেশি লাগতে লাগলো।

ব্রেক ফাস্ট সেরে বাইরে আসা গেল। ঝকঝকে রোদ্দুর এবং বেশ ঠান্ডা। মিনিট সাত আট হেটে আমরা পাহাড়টার পাদদেশে রোপওয়ে স্টেশনে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমরা আজ টিটলিসে যাব। টিটলিস এখানকার পাহাড় চূড়াটির নাম। দশ হাজার ফুট তার উচ্চতা। রোপওয়ের চেয়ার কারে উঠবো, সেই চূড়ায়। তাকিয়ে দেখে কিন্তু এই চূড়াকে তত উঁচু মনে হয় না। আর রোপওয়েও আমাদের কাছে আর নতুন নয়। আমরা মাসখানেক আগে লোয়েসটফটের এন্টারটেনমেন্ট পার্কে রোপওয়েতে রিহার্সাল দিয়ে এসেছি। এখানেও টিকিট কাটতে হবে। তবে আমাদের এখানে পয়সা দিতে হবে না। এই টাকাটা আমাদের ভাড়ার মধ্যেই দেওয়া হয়ে গেছে। ভক্তি টিকিট কেটে নিয়ে এসে সবাইকে দিল। আমরা টিকিট দেখিয়ে একে একে ভিতরে গেলাম। রোপওয়ের চেয়ার কার একটা করে আসছে আর সবাই উঠে পড়ছি। প্রতিটি কারে ছ-জন করে বসার আসন—তিনজন করে মুখোমুখী বসবে। কিন্তু সবাই যার যার গ্রুপে বসতে চায়। তাই আমাদের কারটিতে আমরা দুজনেই মাত্র বসলাম। কার চলছে। এতো আর লোয়েসটফটের খেলনা রোপওয়ে নয়! এ হচ্ছে জগদ্বিখ্যাত, জগতের

সবচেয়ে প্রাচীন রোপওয়ে। এর বনেদিয়ানাই আলাদা। বাঁদিকে রোপ দিয়ে আমাদের কারগুলি উঠছে আর ডান দিকের রোপ দিয়ে একের পর এক কার নামছে। অনেকগুলো কারই খালি। এখনো বেশ সকাল। বেশি মানুষ এখনো শয্যার আরামে, পর্বতারোহণে এখনো আসে নি। ডাইনে বাঁয়ে এক আধটা গাছের মুখ, কাঁচের বাইরে থেকে তারা জিজ্ঞেস করছে, 'কিগো, কেমন লাগছে এমন অনায়াস পর্বতারোহণ? এতো ফলের বদলে বোতলে ভরা জুস খাওয়া; আসল পর্বতারোহণ তো নিজের হাত পা ব্যবহার করে; সে এক অ্যাডভেঞ্চার; একবার সেই ভেঞ্চার নিও, খুব মজা।" জোড় হাতে প্রণাম করে জানাই, 'পারলাম আর কই? এ জীবনে আর সাহস করা হলো না। পরের বার এসে দেখি। অনেকে পারে। আমাদের সহকর্মী মেজর শ্যামাপ্রসাদ তো ক'বারই মাউন্টেনিয়ারিং এ গেছে। এসে তার অভিজ্ঞতা বলেছে। আমাদের বয়স থাকতেও সাহস কম ছিল। তাই যাওয়া হয়ে উঠেনি।' উঠছি, নীচে বহু নীচে, গাছ সব ছোট হয়ে যাচ্ছে। এমনই হয়। বহুদিন আগে, ষাটের দশকে ত্রিপুরায় জরিপ বিভাগে কাজ করতাম তখন পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেকে অস্থায়ীভাবে ডেপুটেশান পেয়ে ত্রিপুরার জরিপ বিভাগে কাজ করতে এসেছিলেন। সবাই উচ্চতর পদে কাজ কবছিলেন। আমাদের সঙ্গে কম্প্যুটেশান সেকশানে কাজ করতেন জনৈক যোগেশচন্দ্র ভদ্র। পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা সকলেই তাঁর পরিচিত ছিল। কিন্তু অনেকেই যোগেশ বাবুর সঙ্গে এমন ব্যবহার করতেন যেন চেনেনই না। তখন তিনি বলতেন, 'উপরে উঠলে, বুঝলে, নীচের মানুষ ছোট মনে হয়।' এখানে রোপওয়ের চেয়ারকারে বসে সেইসব কথা মনে কবতে কবতে আমরা চূড়ার ঘরে পৌঁছে গেলাম। নামলাম। মনে হল, বেশ তাডাতাড়িই পৌঁছে গেছি। কিন্তু ক্রমেই দেখি ওদিকে খাড়া পাহাড় বেয়ে রোপওয়ে বা Rotair চলছে। আমরা উঠবো ১০,০০০ ফুট বা ৩,০২০ মিটার। এখন যেখানে উঠেছি সেই জায়গাটার নাম ট্রাবসি। আর এই জায়গাটা মাত্র ১,৭৯৬ মিটার উঁচু। আরো উঠতে হবে। এখানে পাশে একটা লেক। শীতকালে এটাতে জল থাকে না, পাহাড়েব গায়ের বরফের সঙ্গে একাকার হয়ে যায় এই ববফ হয়ে যাওয়া হ্রদ। আবার রোপওয়ে। আবার উঠে যাওয়া। প্রায় একই রকম অভিজ্ঞতা। তবে এবার আর নীচে গাছ নেই, নগ্ন পাহাড়, সাদা ও প্রায় গৈরিক রঙের পাথর, মহাদেবের শবীর; ধ্যান মগ্ন, নিষ্কম্প পর্বতগাত্র, আমরা উঠে যাচ্ছি।

যাত্রা শেষ হয়। অথবা কে জানে, হয়ত শেষ হয়নি, আবো আছে। হ্যাঁ, আছে বৈকি। এটি দ্বিতীয় স্টেশন। এই জায়গাটির নাম স্ট্যান্ড, উচ্চতা ২,৬৭৮ মিটার। এটি থেকে একটি বিশাল লিফটে আমাদের উঠতে হবে বাকি পথটা। সম্পূর্ণ উচ্চতা ৩,০২০ মিটার। নামো নামো। এবার পরো সোয়েটার টুপি দস্তানা। ভিতরে দোকান; খাবার, পোশাক, ঘড়ি। ভাড়া পাওয়া যাবে জুতা ও কোট। বাইরে তুষারাচ্ছাদিত টিটলিস। মধ্য সুইজারল্যান্ডেব সর্বোচ্চ পর্বত। বহু বছর আগে তৈরি হয়েছে এই রোটএয়ার, পর্যটক আকর্ষণ স্থান। আমাদেব মত ভীতুরাও হাতে বরফ নিয়ে খেলা করতে পারলাম। তামিলনাড়ুর লক্ষ্মীআম্মাও এসেছেন, সঙ্গে স্বামী ও পুত্র। নামেই তামিলনাড়ু। মিস্টার রামচন্দ্রনাথন ১৯৫৬ সাল থেকে লন্ডনবাসী। বৃদ্ধ বটে, কিন্তু হেটে চলেই সুইজারল্যান্ড দেখছেন। তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মী আম্মা হাঁটতে পারেন না মোটে। হুইল চেয়ারে বসে বেড়াতে এসেছেন। পুত্র তাঁকে ঠেলে ঠেলে সুইজারল্যান্ড দেখাচ্ছেন, ক্ষণে ক্ষণে এটা ওটা খাওয়াচ্ছেন। তরুণ তাজা যুবক কৃষ্ণস্বামী ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন

লন্ডন থেকেই। ওকে দেখে আমাদেব পবম পিতৃমাতৃভক্ত শ্রবণকুমারের কথা মনে হল। হুইল চেয়ার না জুটলে সে হয়ত মাকে কাঁধে নিয়েই ভ্রমণ করাতো। আর লক্ষ্মী আম্মা? পায়ে জোর নেই, তো হুইল চেয়ার হী সহি, চলো। প্রণাম জানাই তাকে—মুকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙঘয়তে গিরিম্। যৎ কৃপা ত্বমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্।। সবাই বাইরে। অনেকেই এদিকে বেরিয়ে যাচ্ছেন বরফের মধ্যে। বাজশ্রী জিজ্ঞাসা করলেন, আর য়্যু ওকে?' বৃষ্টির আপাদ মস্তক গরম কাপড়ে ঢাকা। আজ আর কিছু বললো না। টুপির নীচ দিয়ে ছোট্ট মুখটি আর আরো ছোট দুটি আনন্দোজ্জ্বল চোখ দ্যুতি ছড়ালো। আমরা হেসে এগিয়ে যাবার ইঙ্গিত করলাম। এখানটায় সারি সারি বেঞ্চ টেবিল পাতা। ভিজা। ওই একজন মুছে দিচ্ছে, বসো। বসলাম আবার উঠে পড়লাম। বরফে গিয়ে একটু হেটে এলাম। গোড়ালি ঢাকা জুতো পরতে হয়। বেলা তো চটি পরা। এত বরফ হাতে নিতে গিয়ে ধপাস করে পড়লেন। তাড়াতাড়ি গিয়ে ধরে তুললাম। বয়স যতই হোক, নিজের স্ত্রীটিকে অন্যে হাত ধরে তুলবে সেটা কোন স্বামীরই সয় বলুন? তুললাম। তবে এখন বড় আফশোষ হয়। তখন উচিত ছিল একটি ছবি তোলাব। টিটিলিসএ তিনি বরফে খেলছেন মনে হতো। হলো না। আমার ভিতরের ফটোগ্রাফার উৎকণ্ঠিত স্বামীর কাছে হেরে গেল।

দলের পর দল মানুষ উঠে আসছে। সবাই আনন্দিত। 'আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে।' সবাই এখানে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে চলে যাচ্ছে ওই বরফে বিচরণ করতে। আমরা সেই সাহসটুকু করিনি। দেখছি প্রাণভরে। ভাবছি সংকেতকে যদি সঙ্গে আনতে পাবতাম তবে বড় ভাল হতো, বড় ভাল লাগতো তাব। ঢুকলাম দোকানে। ঘড়ির কি বাহার! কত রকম! দু-লাখ টাকার ঘড়ি দেখলাম। দশহাজার ফুট উপরে কত বড় দোকান খুলেছে। এসব জায়গায়ও বিক্রি হয়? মিসেস প্রসাদদেরকেও দেখলাম। খুব মনোযোগ দিয়ে জিনিস দেখছেন। বৃষ্টির একটু অসুবিধা হচ্ছে। জিনিসগুলো একটু উপরে সাজানো।

এবার চলো আইস গ্রটোতে। সব ঢাকা পথ বেয়ে চলো সেখানে, পায়ের নীচে, দু-পাশে এবং মাথার উপরে বরফ। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। যেন ফ্রিজারে ঢুকে গেছি। তোল ছবি সেখানেও। অন্ধকার? কুছ পরওয়া নেই, ক্যামেরায় আলো লাগানো আছে। বাপরে বাপ। কি ঠাণ্ডা। কিন্তু এখান থেকে ফিরবার উপায় নেই। এই পথেই এগিয়ে যেতে যেতে আবার ফিরে যাওয়া হবে। উপায় যখন নেই চল। তাই যেতে যেতে আলোর দেখা পাওয়া গেল, সহযাত্রীদের সঙ্গে দেখা হল, ফিরে যাবার জন্য মন প্রস্তুত হল।

টিটলিস থেকে ফিরে আসার সময় দেখলাম একটা গেটে লেখা আছে Farewell. অনেক ভাষায় লেখা কথাটা। আমাদের নাগরী অক্ষরেও লেখা আছে 'আলবিদা'। যাওয়ার সময় দেখিনি। এবাব ঘুরে গিয়ে দেখলাম ওপাশেও লেখা আছে 'স্বাগতম'। ভাল লাগলো। বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা বিশ্ব স্বীকৃতি পেয়েছে ইউনাইটেড ন্যাশনসএ। এখানে হয়ত বাংলা অক্ষরে লেখা হবে 'স্বাগতম্' ও 'বিদায়'। ভক্তি এগিয়ে আসছে। আমাদের লাঞ্চ তৈরি করে বসে আছেন ওরা। চল, খেয়ে নেয়া যাক্। কিন্তু ওই সজ্জন কুমার ও তার স্ত্রী লিন্ডা যে প্র্যামে করে ছেলেকে নিয়ে চলে যাচ্ছেন হোটেলে যাবেন বলে? শুনেই ভক্তি দৌড়ায়। এখন গেলে যে সব প্রোগ্রাম গোলমাল হয়ে যাবে। ভক্তি দৌড়ায় ওদেরকে ফিরিয়ে আনতে।

আমরা হাটি ওই খাবার জায়গার দিকে। আমরা ওখানে গিয়ে পৌঁছাতে পৌঁছাতে ভক্তি সজ্জন কুমার লিন্ডাও প্র্যামও এসে পৌঁছে গেল। মহাসমারোহে মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করে একটু চাও খেয়ে নিলাম। দুপুরে খাওয়ার পরে রোজ চা থাকে। কিন্তু আমি ভাল করে এই চা-টা খেতে পারি না। এতে চিনি দেওয়া থাকে। একটু খাই। ভাল লাগলেও খাওয়া যায় না। ডাক্তার শঙ্কর রায়ের মুখ খানা ভেসে উঠে। চোখে শাসনের দৃষ্টি।

আবার বাস, আবার যাত্রা। এবার যাব ইন্টারলেকেন। সুইজারল্যান্ডের অন্যতম দ্রষ্টব্য এই শহর ইন্টারলেকেন। দুটি বিশাল হ্রদের মধ্যবর্তী বলে এই শহরের এমন নাম। বাংলা করলে করা যায় 'হ্রদবর্তী'। ছবির মত শহর বললে ভুল বলা হবে। বলা যায় ছবি এই শহরের মত হয়। দুটি হ্রদই অন্তত যাট-সত্তর মাইল লম্বা, এক থেকে পাঁচ মাইল পাশ। পথের পাশে একেবারে গা ঘেষে উঁচু পাহাড় আর অন্য পাশে সবুজ জলেব লেক। দীর্ঘ যাত্রার পর ইন্টারলেকেনে পৌঁছান গেল। বাস দাঁড়ালো টাউন সেন্টারের কাছে। জায়গাটার পাশে অনেক হেলান দেওয়া লম্বা বেঞ্চ, পায়ের কাছে লেক, বাঁদিকে বড় রেস্তরাঁ, রেস্তঁরার পেছন দিক থেকে রেলওয়ে ব্রীজ লেক পার হয়ে ওপারে গেছে, ওপারে বেলের লাইন ও মোটরের বাস্তা পাশাপাশি চলছে, রাস্তা থেকেই উঠে গেছে পাহাড়, বেশ উঁচু। বাস থেকে নেমে ভক্তির পেছন পেছন তিন মিনিট হেটে টাউন সেন্টার এলাকায় গেলাম। ভক্তি আমাদেরকে দেড় ঘন্টা সময় দিয়ে হারিয়ে গেল। আমরা ইচ্ছে করেই আস্তে হেঁটে পেছনে পড়ে গেলাম। বেলাকে বললাম, দেখ এখানে পরিচিত জায়গা। বিস্মিত হয়ে চাবদিকে তাকালো, একটু পরে হেসে বললো, 'ও! বাটার জুতোর দোকান।' এগিয়ে যাচ্ছি। সামনে ইন্টারলেকেন রেলওয়ে স্টেশন। একটা ট্রেন এসে থামলো। আমরাও দাঁড়ালাম। তেষ্টা পেয়েছে। বোতল খালি। সামনে একটা দোকানঘরের সামনে একটা দ্বীপ, ফুলে ফুলে ভরা। একটা গোল ছোট জলাশয়। চার পাঁচটা সরু নল দিয়ে সুন্দব জল তাতে পড়ছে। দুজন সেখানে জল খেলেন। আমরাও তাদের অনুসবণ কবি, জল খাই, জল বোতলে ভরি। আবাব ঘুরতে শুরু করি। কিন্তু বাজার দোকান ঘুরতে আমাদেব তেমন ভালো লাগে না। আমাদের পকেটে শপিং করার মত পয়সা নেই। অপ্রয়োজনীয় নয়ন লোভন বস্তু সামগ্রী কেনার নাম শপিং। সেদিন বিবিসি ওয়ানএ কিলরয় এর প্রোগ্রামের বিষয় ছিল 'Can money buy happiness?' যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের দশ জনেব মধ্যে আট জনই পক্ষে মতামত দিচ্ছিলেন। দু-জন মহিলা বলছিলেন তাঁরা ঠিকই করেছিলেন পয়সাওয়ালা দেখে বিয়ে করবেন, যত ইচ্ছা শপিং করবেন। তাই করেছেন। সুখেই আছেন। আমার ছোট বেলাব পড়া একটা কবিতা মনে পড়লো। সাতটি মেয়ে একে একে বলছিল কেমন স্বামী চাই তাদের। সবাই এক এক স্তবকে তাদের ঈপ্সিত ভর্তার কথা বলে যাওয়ার পব শেষের স্তবকটি সকলে মিলে কোবাসে বলেছেন। সেটি হল—

After all is said and done,
It'll be a terrible fun,
To be the honey
Of a man with money

বিনা মন্তব্যে বলি যে ওইরকম 'man with money'র জায়ারা একটি hobby পোষেন।

সেটির নাম shopping. অনেকেই মনে করতে পারবেন ফিলিপ্পিন্সএর পদচ্যুত রাষ্ট্রপতি মার্কোস এর পত্নী এমেলিয়া মার্কোসের দেড় হাজার জোড়া জুতোর কথা। তাই বলি, অপ্রয়োজনীয় নয়নলোভন বস্তু সামগ্রী কেনার নাম শপিং। আমাদের পকেটে তেমন টাকা নেই। আমরা এসেছি ভারত থেকে, আমরা পৌঁছে গেছি জীবনের বাণপ্রস্থ্ আশ্রম স্টেজে, আমরা মনে রাখার চেষ্টা করি, 'মা গৃধ কস্যচিৎ ধনম্।' সুতরাং বাজার এলাকা ছেড়ে চলে যাই বাস যেখানে আছে সেখানে। বসে পড়ি একটা বেঞ্চে দেখি উত্তুঙ্গ পর্বতগাত্র, হ্রদের জল, সন্তরণশীল হংসকুল, ছুটে চলা ট্রেন, উড়ন্ত বলাকা শ্রেণি, ইত্যাদি।

এই ইন্টারলেকেনে বসে প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মানুষের কীর্তি দেখতে দেখতে সময় হল। সবাই চলে এলেন। আবার বাস আবার যাত্রা। ফিরে যাচ্ছি বুঝি? না। এবার যাব লুজার্ন। সুইজারল্যান্ডে কত যে দ্রষ্টব্য স্থান তার শেষ নেই। লুজার্ন শহরে এসে প্রথমেই চোখে পড়লো ট্রাম গাড়ি—আধা ট্রামও বলতে পারি এগুলিকে। লাল নীল ট্রাম-গাড়িগুলি সুন্দর ও ঝকঝকে উপরে হাত উঠে গেছে তার বিদ্যুতের তার ছুঁয়ে থাকতে। কিন্তু রাস্তায় ট্রাম লাইন নেই, গাড়িরও লোহার চাকা নেই কলকাতার মত। এদের চাকা বাসের মত, কালো মোটা টায়ার। তাই আধা ট্রাম মনে হয় আমাদের। লুজার্নে আমাদের প্রথম দ্রষ্টব্য Thorwaldsen's Lion. একটি ছোট জলাশয়ের ওপারে একটি পাহাড়। ওই পাহাড়ের শ্লেট রঙের পাথর কেটে থরওয়াল্ডসেন ফুটিয়ে তুলেছেন ক্রন্দনরত এক সিংহের মূর্তি। সবাই সিংহের দিকে পয়সা ছুড়ে মারছে, সব পয়সা। শুনলাম, ছোড়া পয়সা সিংহের গায়ে লেগে জলে পড়লে তবে মনষ্কামনা সিদ্ধ হয়। এমন মনস্কামনা সিদ্ধির জলাশয় well of wish দেখে এসেছি আমেরিকায় Luray Caverns এ। সেখানেও অনেক মুদ্রা পড়ে। এমন বহু জায়গায় ভারতেও মুদ্রা ফেলে লোকে, ইচ্ছাপূরণে। আমাদের দেশে এসব পড়লে আমাদের অর্ধশিক্ষিতেরা বলে কুসংস্কার, কারণ সাহেবরা বলে যে! সুইজারল্যান্ডে থরওয়াল্ডসেনের কাঁদুনে সিংহের সামনে বা আমেরিকায় ল্যুরে ক্যাভার্নসে ইচ্ছাপূরণ কুপে মুদ্রা ফেলে আমার দেশের সেই লোকেরাই; কারণ এগুলি কুসংস্কার নয়, সাহেবরা করে যে! কাছেই আছে গ্লেশিয়ার গার্ডেন। ১৮৭২ সালে আবিষ্কৃত এই গ্লেশিয়ার গার্ডেন ভূতত্ত্ববিদদের এক অনন্য আবিষ্কার। দুইকোটি বছর আগে প্রকৃতির খেয়ালে সৃষ্ট এই গ্লেশিয়ার গার্ডেন আবিষ্কারের পর প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ পর্যটক এসে দেখে গেছেন। এখানে আছে আলহাম্ব্রা, হাজার দর্পণের ঘর। লুজার্নে আমরা হেটে পার হলাম পৃথিবীর প্রাচীনতম কাঠের সেতুটি। ২২০ মিটার লম্বা এই সেতু দুপাশের কাঠের বেড়া ও দু-চালা কাঠের ছাদ নিয়ে একটি ২২০ মিটার ঘর। পৃথিবীর প্রাচীনতম এই কাঠের সেতু কি আর সেটিই আছে? ঠাকুরদাদার হুকার মত, এটিরও খোল নলচে ও কল্কি প্রত্যেকটিই বদলানো হয়েছে একাধিক বার। তবু হুকা তো ঠাকুরদারই। পঞ্চাশ মিটার দূরেই আধুনিক পাকা ব্রীজ। হুশ হুশ করে চলছে বাস, ট্রাক, গাড়ি তার উপর দিয়ে। এই বাঁকা কাঠের সেতু দিয়ে হেঁটে যান কেবল কৌতূহলী পর্যটকেরাই। নদীতে বিবাটকায় দুধ সাদা রাজহাঁস কত! সবাই আনন্দে সাঁতরাচ্ছে খাচ্ছে। দুটি কালো রাজহাঁসও দেখলাম। একেবারে কষ্টি পাথরের মত কালো। সেতু পার হয়ে হেটে বাজার এলাকা হয়ে বাস গুমটিতে গিয়ে বাসে উঠে বসলাম। 'আর য়্যু ওকে' বলে রাজশ্রী উঠে এলেন। ধীরে ধীরে সবাই আসছেন। বাস ছাড়তে ছাড়তে সন্ধ্যা হয় হয়। আবার এঙ্গেলবুর্গ এ ফিরে এলাম রাত কাটাতে ওই দুধের ফেনা বিছানায়।

হোটেল হোকেনহোতে ডিনার সেরে বিছানায়। কাল আরো সকালে উঠতে হবে। কাল যাব জেনেভায়। কাল হোটেল ছেড়ে দেব, সবাই সব মালপত্র নিয়ে নীচে নামবেন।

সকালে উঠে সেজেগুজে মালপত্র নিয়ে নীচে। প্রথমে চাবিটি রিসেপশনে দিয়ে ব্রেকফাস্টের ঘরে ঢুকে যাই। আজ খাওয়া আরো ভালো, আরো বিচিত্র। আমরা বৈচিত্র্যে বেশি যাই না। খেয়ে দু-কাপ কফি খেলাম পরপর। বেলা চা-কফি নেয় না। ফ্রুট স্যালাড ও ফ্রুট জুস খায়। মিসেস প্রসাদরা আজও আমাদের সঙ্গেই বসেছেন ও খেয়েছেন। তারপর একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। বেশ ঠান্ডা। বাস এলো, সবাই বাসে উঠে বসলাম। চলো জেনেভা। সবাই নাম জানি জেনেভার। সুইজারল্যান্ডের একটি বড় শহর। প্রথম মহাযুদ্ধের পর লিগ অব ন্যাশনস এখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে ছিল। ফলে অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা এখানে আছে। এখানে ইউনাইটেড ন্যাশানস্ এর দপ্তরও আছে। এর সদর দপ্তর এখন নিউইয়র্কে। গত বছর ছেলের সঙ্গে আমরা নিউ ইয়র্কেও গিয়েছিলাম। সেখানে কোনদিন যাব তা যেমন ভাবিনি, আজ যে জেনেভায় যাব তাও ভাবিনি। সব তাঁর ইচ্ছা। ভালও করান আবার দুঃখেও চুবিয়ে মারেন। বাস থামে। দোতলা বাসটি দেখি আগেই এসে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে বোধ হয় আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজন হবে। হ্যাঁ, তাই। সেই ভোজন। খাও পিও। পরে চা। পাশে একটি বাগান। সেখানে যাই অনেকে। বড় বড় গাছ, ঘাসে ঢাকা মাটি, এখানে ওখানে হেলান দেয়ার ব্যবস্থা সহ লম্বা লম্বা বেঞ্চ। নোংরা ফেলার জায়গা। সুন্দর জায়গা। বাতাস বইছে, ঠান্ডা নেই, রোদে গেলে গরম লাগে। একটু গল্প। আবার চল। বাস চলছে জেনেভার উদ্দেশ্যে।

জেনেভা। প্রথমেই বাস থামে ইউ এন এর বাড়িব সামনে। পৃথিবীর কত দেশের পতাকা উড়ছে। সবাই ফটো তুলছে। যেখানেই দাঁড়িয়ে ইউ এন দপ্তরের ছবি তোলা সেখানে দাঁড়িয়ে অ্যাবাউট টার্ন করলেই সামনে পড়ে দোতলা সমান উঁচু কাঠের একটি চেয়ার। একটি পা তার ভাঙা। মর্মন্তুদ এক স্মৃতির উদ্দেশ্যে তৈরি একটি ভাস্কর্য। এক মহিলা ল্যান্ড মাইনের বিরুদ্ধে দেশে দেশে জনমত গড়ে তুলছিলেন। কিন্তু প্রোথিত এক ল্যান্ড মাইন বিস্ফোরণেই তার একটি পা উড়ে যায় এবং তিনি মারা যান। তাঁর স্মৃতিতেই ভাস্কর তৈরি করেছেন এই এক পা উড়ে যাওয়া অনন্য মনুমেন্ট। অনেকে এরও ছবি নিলেন।

জেনেভা। সত্যিকারের আধুনিক একটি আন্তর্জাতিক নগরী। আন্তর্জাতিক ইতিহাসের ঘটনা যাঁরা জানেন তাঁরা মনে করবেন জেনেভা বোধ হয় লন্ডন, নিউইয়র্ক বা অন্তত কলকাতা বা টোকিওর মত কোনও বিশাল নগর। এলে দেখবেন মোটেই না, ছোট শহর এটি। জেনেভার অধিবাসীদের বর্ণনা শুনুন। আটত্রিশ শতাংশ মানুষ বিদেশী। আপনার মনে হবে রাস্তায় হাঁটলে হরদম বিদেশী মুখ দেখবেন। কিন্তু শহর দিয়ে হাঁটলে কদাচিৎ অশ্বেতকায় কোন মুখ চোখে পড়ে। মানুষ এখানে কথা বলছে শুনুন। আপনার কানে আসবে কেবল ফরাসি বা আমেরিকান উচ্চারণে ইংরেজি ভাষা। জেনেভার আকর্ষণ তার অবস্থানে। লেক জেনেভা (ফরাসিতে লাক লেমা, জার্মানে জেনফারসি) থেকে রোন নদী বেরিয়ে গেছে এখান থেকে। এখানেই জেনেভা। এদিকে জুরা পর্বত শ্রেণী আর ও দিকে স্যাভয় আল্পস্ এর মাথাগুলি দেখা যাচ্ছে। সুন্দর অবস্থান।

জেনেভার আধ্যাত্মিক গুরুদেব হচ্ছেন সংস্কারক জাঁ (অথবা জন) কেলভিন। তিনিই পিউরিটানইজম্ এবং প্রেসবিটিরিয়ানিজমের পশ্চাৎ শক্তি। ষোড়শ শতাব্দীতে জেনেভার নতুন

নাম হয়ে গিয়েছিল 'প্রোটেস্টান্ট রোম', যেন গৌড় বঙ্গের নবদ্বীপ, এখানে রোমান পোপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ওখানে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ; সময় প্রায় এক। কেলভিন এতই মিতব্যয়ী ছিলেন যে লোকে তাকে কৃপণ বলতো। জেনেভাবাসীরা আজও সেই স্বভাব ধরে রেখেছে। কিন্তু এমন ধনী শহর পৃথিবীতে কমই আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ১৫৫৯ সালে কেলভিনই জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপন করেন। জেনেভা সুইজারল্যান্ডের একটি ক্যান্টন। নামে মাত্র সে এই দেশে। জেনেভার ১১২ কিলোমিটার সীমানার ১০৮ কিলোমিটার ফ্রান্সের সঙ্গে আর মাত্র চার কিলোমিটার সুইজারল্যান্ডের সঙ্গে। জেনেভার লোক সংখ্যা তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার। ত্রিশ হাজার ফরাসি মানুষ প্রতিদিন সকালে জেনেভায় কাজ করতে আসে, রাতে ফ্রান্সে বাড়িতে ফিরে যায়। জেনেভায় বেতন বেশি, ফ্রান্সে বাড়িভাড়া জিনিসপত্র সস্তা। হাজার হাজার জেনেভার লোক ফ্রান্সে গিয়ে বাজার করে আনে। জেনেভার দামি সব দোকান রেস্তরাঁ অধিকাংশ জেনেভাবাসীদের কাছেই আউট অব বাউন্ড। অনেকে তত অর্থবান নন বলে যেতে পারেন না, অনেকে অর্থবান হলেও মিতব্যয়ী স্বভাবের জন্যও যান না। লেকের দু-পারে তো আসল জেনেভীয়দের কোন বাড়ি প্রায় নেই বললেই চলে।

রোন নদী জেনেভাকে দু-ভাগে ভাগ করে বইছে। একপারে পুরানো শহর-ঘিঞ্জি। অন্য পারে ঝকঝকে নতুন। পুরনো শহর ঘিঞ্জি বলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সেই কালে তো আর বড় বড় বাস ট্রাক ছিল না, বড় জোর ঘোড়া বা ঘোড়া জোড়া রথ বা গাড়ি। সুতরাং এত বড় বড় রাস্তার প্রয়োজনও ছিল না। তাই পুরনো শহর জেনেভাই হোক আর বারাণসীই হোক, দিল্লী রোম যাই হোক সেই শহর এখন ঘিঞ্জিই মনে হয়। জেনেভা পুরানো শহর। এর বয়স দু-হাজার বছরেরও বেশি। জুলিয়াস সিজার তাঁর দ্য বেলো গেলিকো'তে উল্লেখ করেছেন যে রোন নদীর উপরের কাঠের সেতুটিকে তিনি পুড়িয়ে দিয়েছেন হেলভেশিয়ানদের যাতায়াত বন্ধ করতে। সেটা খ্রিস্ট পূর্ব ৫৮ অব্দের কথা। পুরানো শহরে আছে দ্বাদশ শতাব্দীর সেন্ট পিয়েরের ক্যাথিড্রাল। পাশেই চ্যাপেল দ্য মাশাবী। আমরা জেনেভার বিখ্যাত ফ্লাওয়ার ক্লক দেখলাম। পাঁচ মিটার এই ঘড়ির ব্যাস। সেকেন্ডের কাঁটাটি দুই মিটার লম্বা। গেলাম লেকের পাড়ে ওই গোলাপ বাগানে। পটাপট ছবি তুললেন সকলে।

জেনেভা এখন বড় ব্যবসায়ীর শহর হয়ে উঠেছে। শান্ত, সমৃদ্ধ, রাজনৈতিক দ্বন্দ্বহীন একটি আদর্শ জায়গা। কত হোটেল, ব্যাঙ্ক, সুন্দর সুন্দর বাড়ি সর্বত্র। এখানে আছে ইউ এন এর ইউরোপীয়ান হেড কোয়ার্টার, আছে আন্তর্জাতিক রেড ক্রশের সদর দপ্তর। তবু বলা যায় যে জেনেভার তো ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত থাকার কথা, সুইজারল্যান্ডে এলো কেন? এই কেনর উত্তর ধর্ম। ফ্রান্সের রাজারা সকলেই রোমান ক্যাথলিক ধর্মের পক্ষে ও প্রোটেস্টান্ট ধর্মের বিপক্ষে ছিলেন। ইনকুইজিশান, ড্রাগুন ইত্যাদি এখন শব্দ মাত্র। কিন্তু ইনকুইজিশান নামক ভয়ঙ্কর ব্যবস্থা ও ড্রাগুন নামক ভয়ঙ্কর পুলিশ নির্বিচারে ফ্রান্সের হুগুয়েনোদেরকে হত্যা করেছে। হুগুয়েনো (huguenot) ছিল ফ্রান্সের প্রোটেস্টান্টদের নাম। মনে পড়ছে প্রাসঙ্গিক আর একটি কথা আমি এখন লিখছি আমার পুত্রের বাসায় বসে। ঠিকানা, ১৬ ফনেরো রোড, ইপ্সউইচ্ সাফোক, ইংল্যান্ড। এই ফনেরো নামটির একটি ইতিহাস আছে। ১৬৮৫ সালে ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই এক আদেশ জারি করে বলেন যে ফ্রান্সের হুগুয়েনোরা হয় রোমান ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করুন, নয় দেশ ছেড়ে

চলে যান। একটা তৃতীয় অলিখিত কথাও ছিল অবশ্যই—নইলে মেরে ফেলা হবে। অনেকেই মরেছে। হাজারে হাজারে মানুষ দেশ ছেড়ে চলে গেছে। তাদের মধ্যে ছিল এই ফনেরো পরিবারও। এখানে এসে এরা খুব উন্নতি করেন। এই পরিবারের উত্তর পুরুষ সুদবেরী ও অল্ডবরা থেকে নির্বাচিত হয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টেও বসেছেন। জেনেভার পক্ষে প্রোটেস্টান্ট থেকেও ফ্রান্সে থাকা সম্ভব ছিল না। তাই জেনেভা আজ সুইজাবল্যান্ডে।

পর্যটক দর্শকদের কাছে জেনেভার বড আকর্ষণ লেকটি। টল টলে নীল জলের এই লেকটি বিরাট। লম্বায় একশ মাইল পাশে সাড়ে আট মাইল পর্যন্ত আর গভীরতম স্থানে গভীরতা এক হাজার ফুটেরও বেশি। আয়তনে ২২৫ বর্গমাইল। বেশির ভাগটাই ফ্রান্সে পড়েছে। পর্যটকগণ সম্ভব হলে লেকে নৌকা বিহার করেন। আমরাও করলাম। শহরের প্রায় মাঝখানে লেক থেকে একটি ফোয়ারা উঠছে আর সেই জল লেকেই পড়ছে। ফোয়ারাটিতে ১৩৫০ অশ্বশক্তির পাম্পগুলি প্রতি সেকেন্ডে পাঁচ-শো লিটার জল এক-শো চল্লিশ মিটার (৪৫৯ফুট) উচ্চতায় ঠেলে তুলছে ঘন্টায় প্রায় দুশো কিলোমিটার গতিতে। বহু দূর থেকে এই জলস্তম্ভ দেখা যায়। ওই দেখা যায় লেকের দক্ষিণ পাড়ে দিওদাত্তি ভিলা। কলোগনী পাহাড়ের গায়ে ১৮১৬ সালে কবি লর্ড বায়রন বাস করে গেছেন এখানে। নীচের ছোট বাড়িটিতে কবি শেলী ও তাঁর স্ত্রী মেরী থেকে গেছেন। এই বাড়িতে থাকা কালেই মেরী তাঁর ফ্রাঙ্কেনস্টাইন গ্রন্থটি লিখছিলেন। প্রিন্স সদরুদ্দিন জেনভায় একটি পবিচিত নাম। ওই প্রাসাদটিব নাম স্যাতু দ্য বেলেরিভ। সপ্তদশ শতকে এটি একটি দুর্গ ছিল। সৈন্যবা থাকতো এতে। ওই দুটো গম্বুজে থাকতো লবণ ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য। বিংশ শতাব্দীতে এটি প্রিন্স সদরুদ্দিন কিনে নেন। তিনি আগে ইউ এন এর বাস্তুহারা বিষয়ক কমিশনার ছিলেন। দুর্গটি এখন বেলেরিভ ফাউন্ডেশানের প্রধান কার্যালয়। পাশেব বিলাসবহুল প্রাসাদটিতে প্রিন্স সদরুদ্দিন বাস করেন। এই প্রিন্সের কথা উঠতেই গত প্রিন্স আগাখানের কথা মনে পড়ে। তিনি খুব রসিক ছিলেন। কথা আছে সেই আগা খান একবাব লন্ডনে বাকিংহাম প্যালেসে বাজা ও ভারত সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের সঙ্গে ডিনারেব নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছিলেন। সকলেই জানেন বোধ হয় যে আগা খানেবা ইসমাইলী সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু। খাবাব টেবিলে বসে কথা বার্তার সময় বাজা আগা খানকে জিজ্ঞাসা করেন তাঁর অনুগামীরা তাঁকে সত্যিই ঈশ্বর মনে করেন কিনা। আগা খান নাকি বলেছিলেন যে এটা কোন প্রশ্নই নয়। ভারতের হিন্দুরা গোরুকে ভগবান মনে করে, তিনি তো আর গোরুর চাইতে খাবাপ নন? ওই যে বাড়িটি দেখা যায়, জানালাগুলি লাল? ওইটিতে বসে ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন রুশ বিপ্লবেব পরিকল্পনা করেন। ওই বাড়িটির নাম সশিউর ভবন। ১৭২৩ সালে ফরাসী স্থপতি ফ্রাঙ্কয় ব্লঁদে তৈরি করেন। ১৭৬৫ থেকে বিখ্যাত পদার্থবিদ হোবেস বেনেডেক্টি দ্য সশিউর এই বাড়িটিতে বাস করতেন। ১৭৮৭ সালের তেসরা অগাস্ট তিনি তাব আঠাবো জন পথপ্রদর্শক ও গবেষণার সব যন্ত্রপাতি নিয়ে ইউরোপের উচ্চতম শৃঙ্গ মঁ ব্লাঁর চূড়ায় উঠেন গবেষণা করতে। ১৯৫৫ সালে এই বাড়িতে বাস করেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ডুয়াইট ডি আইজেন হাওযার। এই বাড়িতেই ১৯৮৫ সালে নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক করেন রোনাল্ড রেগান ও মিথাইল গরবাচেভ। ওই বাড়িটি ১৮৯০ সালে তৈরি, কলগেট টুথ পেস্টের আবিষ্কারকের বাড়ি। ওই বড় বাদামী রঙের বাড়িটিতে আগে ILO, GATT এবং HCR এর সদর দপ্তর ছিল। এখন এটি WTO এর প্রধান কার্যালয়। এত সব আছে লেকের পাড়ে।

আমরা সুইজারল্যান্ডে রাইন নদীর উৎসস্থল রাইন ফলস ও দেখলাম। সুন্দরই দেখতে। উচ্চতা অতি সামান্য-মাত্র তেইশ মিটার। তবে বেশ প্রশস্ত; 150 মিটার। আমরা দু-জন মাত্র এক বছর আগে নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখে এসেছি। আমাদের চোখে রাইন ফলস তেমন আকর্ষণীয় মনে হলো না। তবে সব মিলিয়ে সুইজারল্যান্ড আমাদেরকে তৃপ্ত করেছে। ছেলেকে ঈশ্বর এমনি তৃপ্ত রাখুন বলে প্রার্থনা জানাই।

জেনেভা ডোভার লন্ডন ইপ্সউইচ-১০০০ কিমি.-র উপর দূরত্ব। কিন্তু এই দূরত্ব আমরা একদিনেই পাড়ি দিলাম। ফেরার দিনে আর কোনো জায়গায় থেমে সাইট সীইং করা নেই। কিন্তু খাওয়ার জন্য থামা তো আছে। আর আছে দু-পাশে দ্রুত অপসৃয়মাণ নিসর্গ দৃশ্য ও মানুষ, জন্তু জানোয়ার, ইত্যাদি। আমার আর আশ মেটে না দেখে। কিন্তু আমারও তো এখন spirit is willing flesh is not. মন তো সদা সতেজ, তবে শরীর তো নয়। সে তো প্রায় সপ্তাহভর ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত। চোখ বুজে আসছে। মনকে বলি শোন শরীরটাকে একটু বুঝিয়ে দে তো। এই দৃশ্যাবলি চলে গেলে আর দেখতে পাবি? দেখে নে। যা পাচ্ছিস চেটেপুটে খা। Ulysses-এরমত বল, 'I'll drink life to the lees.' 'আর দেখতে পাবি' বলেই চমকে উঠি। এসব বললে ঈশ্বরের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে না? দেখলাম কী কম? দেখালেন কি তিনি কম? বিশাল আমার দেশ ভারত। রাজনৈতিক কারণে সে দেশ অনেক ছোট হয়ে গেছে বটে, কিন্তু এখনো সে দেশ বিশাল। তন্ন তন্ন করে সে দেশ বারম্বার দেখার সুযোগ দিয়েছেন তিনি। বত্রিশটি বছর কলেজে অধ্যাপনা; বত্রিশটি গ্রীষ্মাবকাশ, প্রতি বারেই বেরিয়ে পড়েছি। কষ্ট করে দেখেছি, রেলের নিম্নতম শ্রেণীতে গিয়েছি, সস্তার হোটেল খুঁজেছি, বেড়াতে গিয়ে অন্য সকলের মত স্থানে স্থানে প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় জিনিস কেনার রেস্ত হাতে ছিল না। কিন্তু ভ্রমণে এসব তো বাধা হয়ে উঠেনি। বেলার কথাই বলি। তখনো আমাদের পুরী দেখা হয়ে উঠেনি। অথচ দু-তিন বারই পাশ দিয়ে যাওয়া আসা হয়ে গেছে। সেবার চিল্কা হয়ে উত্তর দিকে আসার সময় থেকেই বলছিল পুরীতে নামবে। আমি বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেছি যে রেলের রিজার্ভেশান, আগরতলার প্লেনের টিকিট, কলেজে খোলার দিনে উপস্থিত থাকার প্রয়োজনীয়তা, ইত্যাদি। সে বুঝেনি। খুর্দা রোড থেকে কটক পর্যন্ত কেঁদেই চললো। কত বললাম যে পুরী তো ঘরের কাছে। কত বার আসবে। হয়েছেও তাই। অন্তত বার পাঁচেক আমরা পরে পুরী গিয়েছি, জগন্নাথদেবকে প্রণাম করেছি। ২০০২ সালে আমেরিকা গিয়েছিলাম। ফেরার পথে লন্ডনও অন্যান্য জায়গা দেখে এসেছি। ২০০৩এ আবার ইংল্যান্ড; ভাবা যায়! কিন্তু হয়েছে তো! সুতরাং 'আর দেখতে পাবি' বলাটা অন্যায় হবে।

রাত দশটায় বাস বার্কিং রোডে দাঁড়ায়। পুত্র ও পুত্রবধূ এখনো এসে পৌছায়নি। অনেকেই দাঁড়িয়ে। নিতে আসার আত্মজনেরা আসেনি। তাঁরা এলেন। গাড়িতে বসতে বসতেই হট বক্স থেকে বেরুলো খিচুড়ি, ভাজা, তরকারি; বোতলে জল। গাড়ি চলে, খাই। হঠাৎ ডাক, 'বাবা, আমরা চলে এসেছি।' উঠলাম। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে এসে রাজা হলেন, সিংহাসনে বসলেন। লক্ষ্মণ চামর দোলাতে দোলাতে ঘুমিয়ে পড়তে থাকলেন। এসব হয়। ইপ্সউইচ। রাত একটা, নাকি সকাল একটা? জয় রামকৃষ্ণ, জয় মা।

ইপ্সউইচ

কলিয়ারস্ এনসাইক্লোপিডিয়ায় আছে যে ইপ্সউইচ ইংল্যান্ডের সাফোক কাউন্টিতে অরওয়েল নদীর তীরে অবস্থিত একটি শহরের নাম। শহরটি লন্ডন থেকে উনসত্তর মাইল (১১০ কিলোমিটার) উত্তর পূর্বে অবস্থিত এটি একটি আঞ্চলিক শিল্প-শিক্ষা ও বিনোদন কেন্দ্র। অরওয়েল নদীতে একটি বেশ ছিমছাম বন্দরও তৈরি হয়েছে। ইপ্সউইচ একটি প্রাচীন শহরও বটে। একটি রোমান আমলের পুরাতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হওয়ায় স্থানটিতে রোমান দখলদারির সাক্ষ্যও মিলেছে। স্যাক্সন আমলে ইপ্সউইচ বারবার ভাইকিংদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়েছে। ১২০০ সালে রাজা জন (যিনি ম্যাগনা কার্টার জন্য বিখ্যাত) ইপ্সউইচের বার্জেস (জমিদার) দেরকে চার্টাব দেন। ইতিহাসখ্যাত কার্ডিনেল উলজি ইপ্সউইচে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাড়িটি এখনো এখানে আছে। তিনি এখানে একটি কলেজ স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু উলজিজ গেট নামের টিউডর আমলের একটি ধ্বংসাবশেষ ছাড়া সেই কলেজের আর কিছুই নেই আজ। অন্য প্রাচীন নিদর্শনের মধ্যে আছে পঞ্চদশ শতাব্দীর অ্যান্শেন্ট হাউস ও ক্রাইস্ট চার্চ ম্যানশন। আছে প্রাচীন বস্তুর সংগ্রহ শালা ইপ্সউইচ মিউজিয়াম। চার্লস ডিকেন্সের সম্পূর্ণ অন্য স্বাদের লেখা 'দ্য পিকউইক পেপার্স' নামক গ্রন্থে যে 'দ্য হোয়াইট হর্স হোটেলের কথা আছে সেটি এখনো আছে এখানে। ইপ্সউইচেব লোকসংখ্যা লাখ তিনেকেব কিছু বেশি।

টাউন সেন্টার থেকে একেবারে কাছে 'ক্রাইস্ট চার্চ পার্ক' নামে বড পার্ক আছে। এটি ইপ্সউইচ শহরের গর্ব। বাসিন্দা ও পর্যটকদেব জন্য এটি একটি বড় আকর্ষণ। আমরা প্রায় প্রতিদিন পার্কের চারদিকে ঘুরে এসে আমাদেব 'মর্নিংওয়াক' সেরেছি। আমাদের ৪৫/৫০ মিনিট লাগতো এই পার্ক প্রদক্ষিণ করতে। এই পার্কটির ইতিহাস চলে যায় দ্বাদশ শতকে। এতে চৌদ্দটি ঐতিহাসিক ভবন আছে। এদের মধ্যে ষোড়শ শতকের ক্রাইস্ট চার্চ ম্যানশন্ অন্যতম। দু'টি চার্চ আছে—বেথেস্ডা ব্যাপটিস্ট চার্চ ও সেন্ট ম্যাবিজ্ চার্চ। বেশ্ ক'টি ছোট বড় স্মৃতি সৌধও আছে। পার্কের বৃক্ষাদিব কথাও উল্লেখ করতে হয়। বেশ কিছু গাছের বয়স সাড়ে তিনশ' বছরেরও বেশি। অনেক হর্স চেস্টনাট গাছ আছে। সুন্দর বড় গাছ, ধুতরা ফলের মত কাঁটা ভরা ফল। ফল ফেটে মাটিতে পড়ে। ভিতরে চেস্টনাটের মত খয়েরী বীজ। তবে এগুলি খাওয়ার নয়। ক্রাইস্ট চার্চ ম্যানশান্ নামক বিশাল বাড়িটির মালিক ছিলেন ফেলিক্স থর্নলি কবোল্ড নামের এক ভদ্রলোক। তিনি ম্যান্শানটি ইপ্সউইচ, মিউনিসিপাল কর্পোরেশান কে দান করার প্রস্তাব করেন একটি শর্তে—কর্পোরেশান তাঁর বাকি জমিদারি মুল্য দিয়ে কিনবে। তাই হলো। পুর পবিষদ বাকি জমিদারি কিনে নিযে ক্রাইস্ট চার্চ ম্যানশান বিনামূল্যে পেয়ে যায়। ১৮৯৫ সালে ক্রাইস্ট চার্চ পার্ক জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। ম্যান্শান্টি এলিজাবেথীয় যুগের স্থাপত্যের একটি সুন্দর নিদর্শন। এতে কনস্টেবল ও গেইনসবরা সংগ্রহের যে বস্তুসামগ্রী আছে লন্ডনের বাইরে তেমন আর কোথাও নেই।

ষোলই অগাস্ট, ২০০৩ এ আমরা ইপ্সউইচ নদী বন্দরটিতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। বেশ বড়ই বন্দরটি। আমরা মানে প্রসূন মুদিতা আর আমি ও বেলা। নদীর নাম 'অরওয়েল'।

অনেকেই জানেন জর্জ অরওয়েলের কথা। তিনি বিখ্যাত বই 'অ্যানিমেল ফার্ম' ও 'নাইন্টিন এইট্টি ফোর এর লেখক। নদীর নাম ও মানুষের নাম এক হয়ে গেল? তক্ষুনি স্মৃতি দেবী স্মরণ করিয়ে দেন যে আমার নিজের প্রপিতামহীর নাম ছিল গঙ্গা, ফ্রান্স ভ্রমণে আমাদের সহযাত্রী ছিলেন তামিল পৃথ্বীরাজ ও তাব সহধর্মিনী যমুনা, আমাদের পরিচিত একাধিক মহিলার নাম সরস্বতী। নাগপুর বাসিনী আমাদের ভাগ্নীর নাম কাবেরী আর তার মায়ের নাম ছিল কৃষ্ণা। আরেক কৃষ্ণা (দেবদাস) তো আমাদের প্রতিবেশিনী, সদাহাস্যমুখী স্নেহশীলা প্রিয়া ললনা। আমার মাসির নাম ছিল সিন্ধু। অনেক নাম নদীতে মানুষে একাকা'ব হয়ে আছে ভাগীরথী, অলকানন্দা, মন্দাকিনী, তামসী. তমসা, ব্রাহ্মণী, তাপ্তী, কত কী? সুতরাং, অরওয়েলে আপত্তি কী? অবাক হওয়ারই বা কী আছে?

প্রায় দু-ঘন্টা হেটে বেড়ালাম ইপ্সউইচের অরওয়েল হেইভেনে (haven)। আজ বড় জাহাজ এখানে একটিই মাত্র আছে। ছোট ও মাঝারি জাহাজ আছে অনেক। লেডি অরওয়েল নামের ওই মাঝারি জাহাজটি যাত্রী নিয়ে প্রমোদ ভ্রমণ করায়। অ্যাংলোনর্ডেন শিপিং কোম্পানির বিরাট গুদাম ও কিলোমিটাব দীর্ঘ খোলা জায়গায লম্বা লম্বা, সাইজ করা কত কাঠ। কত দেশ থেকে জানি এসেছে এসব। দেখলাম সেই সুদূর ইন্দোনেশিয়া থেকে আসা প্লাইউডের পাহাড়। আমাদের এই বৈকালিক ভ্রমণ চলছে ছুটির দিনে। নদীর বন্দরটি এখন বন্ধ। কর্মীরা কেউ এখন নেই। কিন্তু ছবির মত সুন্দর এই বন্দরটিতে এখন অনেক লোক। সকলেই হাঁটছেন। এরা আমাদেরই মত বেড়াতে এসেছেন। উজ্জ্বল রোদ ও ঠান্ডা বাতাস। বেড়াবার জন্য অতি উত্তম পরিবেশ। অনেকেই আমার মত গরম পোশাক পরে এসেছেন। সেন্ট পিটার্স চার্চকে পিছনে রেখে মুদিতা আমাদের ছবি তুললো। কত যে ছবি তোলা হচ্ছে তার আর সংখ্যা নেই। মনে পড়ে শ্রীমান জয়ন্তর কথা। আমাদের আমেরিকা প্রবাসের সময় শ্রীমান তাঁর স্ত্রী পায়েল সম্পর্কে বলেছিল। 'মেসো, সকাল সাড়ে সাতটায় অফিস যাওয়ার সময় পকেটে হাত দিয়ে দেখি একটা নতুন ফিল্মের রোল। দিয়ে গেলাম। রাত আটটায় ঘরে ঢুকে জুতোর ফিতে খুলবার জন্য হাত নামাচ্ছি তখন পায়েল বলে, 'শোন না। আমি চা বসাই। তুমি একটু নীচে গিয়ে একটা রোল ফিল্ম নিয়ে এসো।' তাই হচ্ছে আজকাল। একটা জীবনে কত দেখলাম। ক্যামেবা কিনলেই একগাদা ফ্লাশ বাল্ব কিনতে হতো। প্রতিটি ক্লিক করার সঙ্গে একটা করে বাল্ব খতম। সুতরাং, ক্যামেরা ব্যবহারে মিতব্যয়িতা ছিল বাধ্যতামূলক। আমেরিকায় তো দেখে এসেছি ইউজ্ এন্ থ্রো ক্যামেরাও। কাগজের ক্যামেরা, তাতে একটা ফিল্ম ভরা। ফটো তোলা শেষ হলে নিয়ে যাও দোকানে ডেভেলাপ করতে। দাও দোকানিকে। তিনি ফিল্মটা খুলে ক্যামেরাটা ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দেবেন। কি কান্ড বলুন তো।

এবার আমরা দোকানে যাব। ইপ্সউইচ টাউন সেন্টার থেকে আমাদের বাসস্থান ফনেরো রোড যাওয়ার রাস্তাটির নাম হাইস্ট্রীট। সার্থকনামা রাস্তা, পুরোটাই খাড়া চড়াই। আমাদের হেঁটে যেতে কষ্ট হবে বলে ছেলে বৌমা আমাদেরকে রাস্তার পাশে রাখা একটা হেলান দেওয়ার ব্যবস্থা সহ বেঞ্চে বসিয়ে রেখে বাড়িতে গেল গাড়ি আনতে। দূরে তো নয়। ওই যে দেখা যায়। আমরা নিজেরা দুজনও এখানে প্রায়ই আসি। নেহাৎ ঘুরতেও আসি। কোনও কোনও সময় এই প্যাটেলের দোকান থেকে এটা ওটা সেটা নিতেও আসি। প্যাটেলের

দোকানটিকে লোকে ইন্ডিয়ান স্টোরও বলে। এই দোকানে সব ভারতীয় খাদ্যবস্তু সহ অন্য জিনিস পাওয়া যায়। ঝিঙ্গা পটল করলা, ধনে জিরা হলদি, আচার পাপড় পুদিনা পাতা, মুড়ি চিড়া চানাচুর, ধুপকাঠি, নকুল দানা, সিঁদুর, আটা, ময়দা, সুজি, এসব আমরা এখান থেকেই নিয়ে যাই। এই দোকানটি খুব কাছেও বটে আর এখানে এলে বহু ভারতীয় মুখ দেখা যায় বলেও আমরা এখানে প্রায়ই আসি। যাদের বিশেষ ভারতীয় বস্তুর নেশা আছে তাদের তো ভারতীয় বিপণী ছাড়া চলেই না। আমাদের মিসিগানবাসী কল্যাণাশীষ সপ্তাহে অন্তত এক দিন তিরিশ মিনিট গাড়ি চালিয়ে ইন্ডিয়ান দোকানে যেত পান আনতে। পানটি দিলেই মা ছায়াদেবীর মুখখানা উদভাসিত হয়ে উঠতো আহ্লাদে। সেটা কোন ছেলের না ভাল লাগে। পিতা অমরেন্দ্র বাবুর পানের নেশা নেই। তবে দিলে নাও করেন না।

ওরা গাড়ি নিয়ে এলে আমরা দোকানের উদ্দেশ্যে চলি। আমাদের পুত্র গাড়ি চালাতে খুব ভালোবাসে। বধুমাতা মুদিতা ভালোবাসে শপিং করতে। দুজনেই ভালবাসে আমাদেরকে দেখাতে। এদের রাজযোটক নয়, একেবারে বাদশাহ যোটক হয়ে পড়েছে। আমেবিকায় থাকতে কত দূবে দূরে নিয়ে গেছে দোকান করতে। ২০০২ সালের আটাশে মে নিয়ে গিয়েছিল COSTCO নামের এক অতিকায় দোকানে। পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ড্রাইভ! সেখান থেকে আমাকে কিনে দিয়েছিল Robert A.F. Thurman এর Essential Tibetan Buddhism, প্রকাশক Castle Books. বড় ভাল বইটি। ইংল্যান্ডেও তাই। এখানে আমরা এ পর্যন্ত সেইন্সবেরি, আর্গস্, তেস্কো এবং অ্যাজ্‌দা নামের বিপণিগুলোতে গিয়েছি। প্রসূন আজ আমাদেরকে মরিসন নামের দোকানটিতে নিয়ে গেল। কিন্তু ঘোবাঘুবি বেশি করাব আগেই একজন এসে কানে কানে বললো যে দোকান বন্ধ করার সময় হয়ে গেছে। আমরা তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেলাম। এবার গন্তব্য অ্যাজ্‌দা। ওই বিপণিটি চব্বিশ ঘণ্টা খোলা থাকে। আমি বলি অ্যাজ্‌দা হচ্ছে মেজদা ও সেজদার পরেব দাদা। আমেরিকার দোকান গুলির মতই মস্ত এক একটা দোকান। পাওয়া যায় প্রায় সব জিনিসই। এই দোকানগুলি কিন্তু কোনোটাই একক একটি দোকান মাত্র নয়। প্রত্যেকটি নামই একটি দোকান শৃঙ্খল বটে। এককেটার অনেক শাখা। এই ASDA নামের দোকান শৃঙ্খলটি সেদিন WALL MART নামক আমেবিকার অতিকায় শৃঙ্খলের কাছে বিক্রী হয়ে গেল। পত্রিকায় পড়ছিলাম যে WALL MART এত শাখা খুলেছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যে কর্মচারী সংখ্যায় এরা সে দেশে দ্বিতীয় বৃহত্তম নিয়োগকারী হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে WALL MART এর কর্মচারী সংখ্যা সরকারি কর্মচারী সংখ্যাব পরেই। ওই দেশে সরকারই বৃহত্তম নিয়োগকারী। ব্যবসা এইভাবে বড হতে হতে monopoly হয়ে যায়। তার বিরুদ্ধে অবশ্য আইন আছে। Safeway নামক বিপণি শৃঙ্খলটি বিক্রী হয়ে যাবে। এগিয়ে এসেছে WALL MART, TESCO এবং MORRISON ক্রেতা হিসাবে। কিন্তু মনোপলি নিরোধ আইনের বলে ব্রিটিশ সরকার WALL MART এবং TESCO কে এই সওদা করা থেকে বিরত থাকতে বলেছে। MORRISON একা এখন ক্রেতা। সে যা খুশি দাম বলতে পারে। তার জন্যও দেশে দেশে রক্ষা কবচ আছে। ওই বিক্রয়ে মূল্য যাতে ন্যায্য হয় সেজন্য সরকারি প্রতিনিধি থাকবেন উপস্থিত। Safeway-র মালিকগণ যাতে ঠকে না যান তা দেখবেন তিনি।

Argos নামক বিপণি শৃঙ্খলটি একটু অন্য ধরনের। এদের কাছে কি জিনিস পাওয়া যায় তার আছে দুটি বহু বর্ণে মুদ্রিত সুদৃশ্য ক্যাটালগ আমাদের পূজা সংখ্যার আকারের। প্রথমটিতে লেখা Argos-3000 prices lowered. এটির পৃষ্ঠা সংখ্যা 1206, ওজন হবে দেড় কিলো। প্রতিপৃষ্ঠায় বস্তু সামগ্রীর রঙিন ছবি ও মূল্য মুদ্রিত। হাজার জিনিস। দ্বিতীয় বইটিতে লেখা Argos Additions. এতে পৃষ্ঠা সংখ্যা 938, ওজন হবে এক কিলোর বেশি। সেই রকম ছবি আর দাম, পোশাক—জামা, প্যান্ট, জুতো, টুপি, টাই, অন্তর্বাস, ছাতা; আসবাব—খাট, আলমারি, সোফা, চেয়ার, টেবিল, সব; রান্না ঘরের সব জিনিস; বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি—টেলিভিশন, কম্পিউটার, ওয়াশিং মেশিন, ফ্রিজ, ইস্ত্রী, কত কি; অলংকার— রূপার, সোনার, হিরার, প্ল্যাটিনামের; ক্যামেরা, ঘড়ি ; হ্যান্ডব্যাগ, কসমেটিকস, সুগন্ধী কত বলবো? ছোট কানের দুল থেকে বিশাল শ্যান্ডেলিয়ার, সব পাবেন ওই ক্যাটালগের ছবিতে। দামও লেখা আছে। আলাদিনের আশ্চর্য বিপণি।

কিন্তু Argos এর শো রুমগুলি তেমন নয়। কোন শাখাই পাঁচ সাত হাজার বর্গফুটের বেশি নয়। এরা সমস্ত পণ্য সম্ভাব ক্রেতার পরীক্ষার জন্য সামনে এনে সাজিয়ে রাখেননি। অনেক জিনিসেরই সামান্য নমুনা আছে, অনেক জিনিসের নেই। বড় জিনিসগুলি নেই। ক্যাটালগ দেখুন, অর্ডার দিন, জিনিস আপনার বাড়ি পৌছে যাবে। দাম দিয়ে রেখে দিন। অপছন্দ হলে ত্রিশ দিনের মধ্যে ফেরৎ দিলে মূল্যও ফেরৎ পাবেন। বাণিজ্য এলাকায় বিশাল দোকান করলে অনেক খরচ পড়ে। Argos সেরকম খরচ করে না বলে Argos অনেক জিনিসই অন্যদের তুলনায় কম দামে দিতে পারে। তাই ওদেরও ক্রেতার অভাব নেই। এদেশে সাধারণ ব্যবসায়ে ঠকানোর প্রবণতা কম। সুতরাং ব্যবসা ভালোই চলছে। Argos এর দোকানেও ভিড় সর্বদাই লেগে আছে।

বিশে অগাস্ট ২০০৩ তারিখে ইপ্সউইচ স্টেডিয়ামে ফুটবল খেলা ছিল। সারা শহর থম থম। প্রশাসন কর্মীদের মাথা গরম। ফুটবল মাঠে গুন্ডামিতে ইংরেজ যুবক ফুটবল প্রেমীরা বেশ নাম করেছে। সকলে এদেরকে ভয় পায়। খুনোখুনী করা এদের কাছে কোন ব্যাপারই নয়। সেদিন ইউরোপীয়ান ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপের খেলা। ইংল্যান্ড খেলবে ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে। তাই উত্তেজনা চরমে। ইংরেজ ফুটবল প্রেমীরা বিদেশে গিয়েও মারামারি বাঁধায়। দেশে খেলা। কি জানি কি হয়। তিন হাজার পুলিশ এসেছে ইপ্সউইচে অতিরিক্ত। শহরে টহল দিচ্ছে ওরা। দোকানে দোকানে ফরমান জারি করেছে কাচের বোতল গ্লাস, বাসন কোসন সরিয়ে ফেলতে। কেবল পলিথিনের জিনিস ব্যবহার হবে আজ। ওগুলো দাঙ্গাবাজদের বিশেষ কাজে আসবে না। পুলিশের কুকুর ও দাঙ্গা দমনকারী পুলিশের অশ্বারোহী বাহিনী এসেছে। ঘুরছে শহরে। টি ভিতে দেখালো শহরের মোড়ে মোড়ে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। আকাশে হেলিকপ্টার উড়ছে। তবে All's well that ends well. শেষ পর্যন্ত বিশেষ কিছু হয়নি। ইংল্যান্ড আজ ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে তিন এক গোলে জিতলো।

আমি গ্রন্থাগারকে মন্দির মনে করি। পথ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় গ্রন্থাগারের সামনেও সেই রকম মাথা নত করি। সঙ্গত কারণেই আমার সঙ্গে সেই আগরতলার মহারাজা বীর বিক্রম কলেজের গ্রন্থাগারের সম্পর্ক নিবিড়তম। বত্রিশ বছরের সম্পর্ক, যে-কোনো সময়ে

প্রবেশের অধিকার, কর্মীদের সপ্রেম ব্যবহার। ভোলা যায়! তবে শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বীরচন্দ্র লাইব্রেরীর সঙ্গে সম্পর্ক অর্দ্ধ শতাব্দী ধরে বজায় আছে। সেই ১৯৫৮ সাল থেকে। মাঝে বত্রিশ বছর যাওয়া আসা একটু কম ছিল মাত্র। পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার কোন্নগরের শিবনাথ শাস্ত্রী লাইব্রেরি, কলকাতার ব্রিটীশ কাউন্সিল লাইব্রেরি, হায়দরাবাদের সেন্ট্রাল ইন্‌স্টিটিউট অব ইংলিশ অ্যান্ড ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজেস্ এর লাইব্রেরি ও আমেরিকান লাইব্রেরী, সুখচর কাঠিয়াবাবা আশ্রমের বাবা বৃন্দাবন বিহারী দাসজীর লাইব্রেরি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া স্টেটের ফেয়ারফ্যাক্স কাউন্টির পাবলিক লাইব্রেরির সেবাও নিয়েছি। দেখেছি ঘুরে ঘুরে অবাক বিস্ময়ে ওয়াশিংটন ডি. সি.তে আমেরিকান লাইব্রেরি অব কংগ্রেসও। ওই লাইব্রেরি অব কংগ্রেসে ককবরক ভাষায় লেখা 'রামায়ণ প্রভাস চন্দ্রনি' ও স্থান পেয়েছে দেখে গর্ব বোধ করেছি। এবার ইংল্যান্ডে এসে ইপ্সউইচ শহরের নর্থগেট স্ট্রিটে অবস্থিত কাউন্টি লাইব্রেরিব সেবা বেশ কিছুদিন নিলাম। প্রতিদিন দুইতিন ঘণ্টা লাইব্রেরিতে কাটিয়েছি। ছেলের কার্ডে বই এনে বাড়িতে বসে পড়েছি। বেশ বড় লাইব্রেরি। একতলায় লেন্ডিং সেকশান, দোতলায় রিডিং রুম, ইন্টারনেট ফেসিলিটি ও রেফারেন্স লাইব্রেরি। বহু লোক প্রতিদিন এখানে আসেন। আমিও অতি আনন্দের সঙ্গে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছি। লাইব্রেরীটি শহরের এক বিশেষ আকর্ষণ। এই লাইব্রেরিটিতে ইংরেজি ছাড়াও আফ্রিকান, ক্যারিবিয়ান, চাইনিজ, রুশ, আরবী, হিন্দী, বাংলা, গুজরাতী বই আছে। বাংলা বইয়ের বেশির ভাগই বাংলাদেশী। লাইব্রেরিকে আমার 'উলট পুরাণের দেশ—আমেরিকার কথা' এক কপি দান করলাম।

খ্রিস্টান দেশের প্রধান আকর্ষণ সেই দেশের গির্জা। গির্জা দেশের মানুষেব আভিজাত্য এবং তাদের ইতিহাসও সূচিত করে। আমি সুযোগ পেলেই ঈশ্বরের গির্জা নামক এই নাম ঘরে গিয়ে দাঁড়াই, চক্ষুমুদে নীরব প্রার্থনা জানাই, 'হে ঈশ্বর, মানুষকে শান্তি দাও।' সেদিনও ছেলের সঙ্গে ক্যান্টারবেরির ক্যাথিড্রাল এ গিয়েছিলাম, সেন্ট টমাস বেকেটের অধিষ্ঠানে কটা মিনিট নত মস্তকে দাঁড়িয়েছিলাম। ইংল্যান্ডের গির্জা সেন্ট মার্টিনেও দাঁড়িয়েছিলাম।

ইস্পউইচে গির্জা অনেক। রাস্তা দিয়ে হাঁটলে একটু পর পরই গির্জার চূড়া দেখা যায়। আমাদের ফনেরো রোডের বাড়ির সবচেয়ে কাছে আছে **বেথেস্ডা ব্যাপ্‌টিস্ট চার্চ**। একটু পরেই আছে সেন্ট মার্গারেটস চার্চ। বেথেসডা ব্যাপটিস্ট চার্চটি তুলনামূলক ভাবে কম বয়সী। তবে **সেন্ট মার্গারেটস চার্চটিকে** বলা হয় ১১৬০ সালের। কিন্তু এটির প্রথম উল্লেখ দেখা যাগ ১৩০৭ সালে। গত শতাব্দীগুলিতে এর রক্ষনাবেক্ষণ হয়েছে ঠিক মতই। ইপ্সউইচের মানুষই সাহায্য কবেছেন সর্বদা। অনেক সময় প্রয়োজন বোধে এক আধটু পবিবর্ধনও হয়েছে। এই উত্তব দিকের অংশটুকু, যেটিতে অর্গানটি রাখা হয়েছে, সেটি বোধ হয় ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত। টাউন সেন্টারের গায়ে দাঁড়ানো ছোট্ট চার্চটির গঠন শৈলী অতি সুন্দর। ছুঁচালো চূড়াটি যেন আকাশ ছুঁই ছুঁই। এটির নাম সেইন্ট স্টিফেনস্ চার্চ। পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত এই চার্চটি এখন একটি টুরিস্ট ইনফরমেশন সেন্টার। আজ **সেন্ট পিটারস্ চার্চটি** যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, অনেকে মনে করেন সেখানেই ইপ্সউইচের প্রথম চার্চটি নির্মিত হয়েছিল। চার্চটির পশ্চিম দিকের এই টিউডর প্রবেশ দরজাটি কার্ডিনাল উলজি করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর স্থাপিত কলেজের চ্যাপেল্ হয়েছিল এই চার্চ। শ্বেতপাথরের ফন্টটি দ্বাদশ শতাব্দীর। **সেইন্ট ম্যারিজ অ্যাট দ্য কী** তে গেলে হাতে

দূরবিন থাকলে ভাল হয়। কাজে লাগবে। চোখে লাগালে চূড়ায় চাবিটি দেখা যাবে। ভিতরে যান। উপরের ডাবলহ্যামারবিম ছাদটি ১৪৫০ সালের। সব কাঠেই সুন্দর খোদাই কাজ করা। কাঠের থামে থামে ক্ষোদাই করা মূর্তিগুলি সব কবন্ধ কনিষ্ক হয়ে আছে। ওখানে একজন দিগম্বর মানুষ একটি পাঁজর হারাবার জন্য তৈরি। ইনি আদম হবেন। ইভ তৈরির জন্য তাঁর পাঁজর প্রয়োজন। এই যে একজন মানুষ, তার লম্বা দাঁড়ি ও মাথায় কাপড় বাঁধা। ওই আরেকজন, জিভ বার করে আছেন। এখানে হেনরি তুলির সমাধি। সেইন্ট **ক্লিমেন্টস্ চার্চটি**তেও দর্শনীয় অনেক। এই রয়েল আর্মস্ চিহ্ন কাঠের। স্থানীয় শিল্পী তৈরি করেছেন ১৬৬২ সালে। ওই সিংহ ও ইউনিকর্নের পায়ের তলায় দুটি নগ্ন মূর্তি দেখা যাচ্ছে। ফন্টটি সিভিল ওয়ারের সময় বেপাত্তা হয়ে গিয়েছিল। রেস্টোরেশানের পরে আবার স্থাপিত হয়। ১৯৫৭ সালে নির্মিত হয় **ক্রাইস্ট চার্চ** (ইউনাইটেড রিফর্মড)। গথিক শৈলীর এই গির্জাটি স্থানীয় স্থপতি জে. বার্নেস এর নক্সা অনুযায়ী জন রাইট তৈরি করেন। কেন্ট থেকে আসে পাথর। এর বড় গ্যালারি ঢালাই লোহার কাজে ও রং করা কাচের জানালা, অতি সুন্দর। এখানে আছে **মেথডিস্ট চার্চ** এবং **ইউনিটারিয়ান মিটিং হাউস**ও।

প্রত্যেক শহরই একটি সংগ্রহ শালা বা মিউজিয়াম রাখার চেষ্টা কবে এবং রাখতে পারলে গর্ববোধ করে। ইপ্সউইচেবও একটি সংগ্রহ শালা আছে এবং তা গর্ব বোধ করার মতই। এই সংগ্রশালাটির তিনটি অংশ—হাইস্ট্রিটে ইপ্সউইচ্ মিউজিয়াম, ক্রাইস্ট চার্চ পার্ক এ ক্রাইষ্ট চার্চ ম্যানশান এবং তার সংলগ্ন উল্‌জি আর্ট গ্যালারি। ইপ্সউইচ মিউজিয়ামটি ছোট পরিসরে একটি সার্থক সংগ্রহ শালা। এখানে ন্যাচারাল হিস্টরী অংশে কঙ্কাল ও অশ্মীভূত অস্থি ও বৃক্ষের সংগ্রহ, ম্যামথ থেকে জিরাফ পর্যন্ত কত প্রাণীর প্রমাণ আকৃতির মূর্তি, কত সরীসৃপ, পাখি যে আছে সীমা সংখ্যা নেই। আছে ভূতত্ত্ববিদ্যা সংগ্রহ, মানুষের সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাস, মিশবীয় সভ্যতার পৃথক বিভাগ, ইপ্সউইচ শহরের ও তার অধিবাসীদের ইতিহাস সংগ্রহ ও মুদ্রা সংগ্রহ। সুন্দর সংগ্রহশালা। আমার কেবল আমার শহরের সংগ্রহ শালার দারিদ্র্যের কথা মনে পড়ে। প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্যকে বলবো এই মিউজিয়ামের কথা। ক্রাইস্ট চার্চ ম্যানশানের কথা একটু আগেও বলেছি। ষোড়শ শতাব্দী থেকে ১৮৯৪ সাল পর্যন্ত যে তিনটি ধনী পরিবার এই প্রাসাদে বাস করেছেন তাঁরা তাদের ব্যবহৃত সব সামগ্রীই রেখে গেছেন। তার মধ্যে আছে আসবাবপত্র, বাসনকোসন, চিত্র ও ভাস্কর্য সংগ্রহ সব। এই প্রাসাদের সঙ্গেই পরে তৈরি হযেছে উল্‌জি আর্ট গ্যালারি। এটি একটি স্থায়ী প্রদর্শনী গ্যালারি। স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক চিত্র, ভাস্কর্য বা অন্য কিছুর প্রদর্শনী লেগেই আছে এখানে। এসব কথা বলতে গিয়ে শ্রীজহর আচার্যির 'রাজেন্দ্র কীর্তিশালার কথা মনে পড়ছে। অর্থবিত্ত কিছুই নেই। কিন্তু কেবল অসাধারণ আকাঙক্ষার জোরে পুরাতাত্ত্বিক বস্তু, মুদ্রার ও একটি উপজাতি সংস্কৃতির ছোট সুন্দর সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে আগবতলা শহরের এক কোণে।

'দ্য ওল্ড সান ইন' ইপ্সউইচের একটি দ্রষ্টব্য স্থান। সেইন্ট স্টিফেনস্ লেনে এই সেদিনও এটির নাম ছিল এটফিল্ড এন্ড ডটার্স প্রিমিসেস্। পঞ্চদশ শতকের একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এটি। পরে হয় পান্থশালা বা ইন্। ১৯০১ সালে এটিকে একটি প্রাচীন সংগ্রহ বিক্রয়শালাতে পরিবর্তন করা হয়। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত সিলহার্স্ট ব্রাদার্স ব্যবসা করেছেন এখানে। তখন এসেছিলেন এটফিল্ড। তিনিও অবসর নিয়েছেন এখনকার মালিক দুর্গ ও কন্যা শীলা। এরা বাড়িটির প্রাচীন গৌরব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছেন।

পাইকেনহ্যাম গেট হাউসটি ১৪৭১ সালে সাফোক এর আর্চডিকন উইলিয়াম পাইকেনহ্যাম এর বাসস্থানের প্রবেশ পথে তৈরি হয়েছিল। জায়গাটি এখন ইপ্সউইচ ও সাফোক ক্লাবের দখলে। বাড়িটি কাঠের। ভিতরে ও বাইরে সুন্দর খোদাই কাজ। ১৯৮২-৮৩ সালে ইপ্সউইচ বিল্ডিং প্রিজার্ভেশান ট্রাস্ট এটির পুনরুদ্ধার কাজ করিয়েছেন।

১৮৮৫ সালে স্থাপিত ইপ্সউইচ ও সাফোক ক্লাব আর্কডিকন উইলিয়াম পাইকেনহ্যাম এর বাসস্থানটির বর্তমান দখলকার। অনেক প্রাচীন ও পরে সংযোজিত কাঠের খোদাই কাজ সহ স্থানটি একটি পর্যটকের আকর্ষণ স্থান। অনেকেই এটি দেখতে আসেন ও শিল্প কর্মের প্রশংসা করেন।

কেবল প্রাচীন জিনিসই দর্শনীয় হয় একথা ঠিক নয়। ইপ্সউইচ শহরের প্রায় কেন্দ্রস্থলে কালো রঙের একটি কাঁচের বাড়ি আছে। বাড়িটিতে কোনও জানালা নেই। ভিতরের আলোগুলি মিটমিট করছে দেখা যায়। এই ত্রিতল বাড়িটির দোতলায় আমাদের বধূমাতা মুদিতা কাজ করে। অনেক কৌতূহলীর মত আমাদেরও বাড়িটি দেখার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু অকারণে প্রবেশ নিষেধ। কর্মী মুদিতাব শ্বশুর-শাশুড়ি বলে প্রবেশ কবা যাবে না। একটি সুযোগ ঘটে গেল। দ্য ইপ্সউইচ সোসাইটি ও ইপ্সউইচ সিভিক্ ট্রাষ্ট ১৩ই ও ১৪ই সেপ্টেম্বর ২০০৩ তারিখে ইপ্সউইচ্স্ হেরিটেজ ওপেন ডেজ্ পালন করছেন। এই দু-দিন শহরের কিছু দ্রষ্টব্যস্থান সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেবেন। এর মধ্যে উইলিজ্ বিল্ডিং অর্থাৎ ওই কালো কাচের বাড়িটিও আছে। সুযোগ পেয়ে গেলাম ও দেখে এলাম।

বাড়িটি একেবারেই নতুন। ১৯৭৩-৭৫ সালে এটি নির্মিত হযেছে। কিন্তু স্থাপত্য ও অন্যান্য গুণের জন্য এটি অনেক পুরস্কার পেয়েছে। স্যাব নরমান ফস্টার নামক স্থপতির জীবনেব একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি এই কাচ-ইস্পাত-এ্যালুমিনিয়ামেব বাড়িটি। ১৯৭৬ সালে এটি বিজনেস ও ইন্ডাষ্ট্রি প্রিমিয়াব এওয়ার্ড ও আব এস মেমোরিয়াল এওয়ার্ড পেয়েছে, ১৯৭৭ সালে রয়েল ইনস্টিটিউট অব ব্রিটিশ আর্কিটেক্ট এওযার্ড পেয়েছে, ১৯৮৩ তে গ্যাস এনার্জি ম্যানেজমেন্ট এওয়ার্ড পেয়েছে।

বাড়িটিতে সর্বমোট ২,২০.০০০ বর্গফুট জাযগা আছে। তিন তলা বাড়িটির প্রত্যেকটি তলে দেড় একর বা প্রায় ৬৭,৫০০ বর্গফুট জায়গা। ছাদেব উপর একটি রেস্তঁরা আছে। আধা একর সবুজ ঘাস ঢাকা লন এবং ফুলবাগান আছে ছাদে। এতে কর্মীদের একটা আলাদা পরিবেশ হয় এবং তাপ নিয়ন্ত্রণও হয়। সারা বাড়িটি এয়ার কন্ডিশন্ড। এক হাজার করণিক ও দুই'শ সেবা কর্মী কাজ করে এখানে। ১,৪০,০০০ বর্গফুট কার্পেট স্থান ও ৬৫,০০০ বর্গফুট রাবার ঢাকা জায়গা আছে। ছয়টি এসকেলেটার ও দু-টি লিফট চলছে। দেয়ালের রং হাল্কা হলুদ ও কার্পেট সবুজ। রেস্টুরেন্টটি প্রত্যহ এক হাজার জনের খাদ্য প্রস্তুত করে। এই বাড়িটি উইলিজ নামক ইন্সিওরেন্স কোম্পানির। ব্রিটেনের ইন্সিওরেন্স কোম্পানিগুলির মধ্যে উইলিজ একটি বনেদি প্রতিষ্ঠান। আমরা বাড়িটির ভেতবে দেখতে গিয়ে মুদিতা কোথায় বসে কাজ করে তাও দেখে এলাম।

একটি দ্রষ্টব্য স্থান এখানকার টাউন হল। এটির দ্বারোদঘাটন হয় ১৮৬৮ সালে। হাই ভিক্টোরিয়ান শৈলীর স্থাপত্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন এই বাড়িটি। বাইরে থেকেই দেখা

যায় সারি দেওয়া ধ্রুপদি থাম, পুরো মূর্তি ও বিভিন্ন মস্তক। বিশাল সিঁড়ি, কিনারায় বালুস্ট্রেড এবং ঢালাই লোহার সুন্দর কাজ। কাউন্সিল কক্ষের ছাতের সুন্দর কাজ, কার্নিশ ও প্লাস্টারের কাজ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ট্যাভার্ন স্ট্রীটে আছে ইপ্সউইচ ইনস্টিটিউট ও গ্রন্থাগার। ১৮২৪ সালে এটি মেকানিক্স ইন্‌স্টিটিউট হিসাবে স্থাপিত হয়েছিল। বাড়িটি অবশ্য রচিত হয়েছে ১৮৩৪ সালে। টাউন সেন্টারের বাজারের মধ্যে এটি একটি মরূদ্যান বিশেষ। গ্রন্থাগার, পাঠকক্ষ ও কথাবার্তা বলার ঘর বা আড্ডাঘর আছে একটি। তাতেও চলে না। ফলে রেস্তঁরা খোলা হয়েছে। চা কফি ও খাবার পাওয়া যায়। অতিথিরা প্রায় সকলেই বয়স্ক মানুষ। মদ্যাদি সহ এক জনের খেতে মাত্র পৌনে দশ পাউন্ড (সাড়ে সাত শো টাকার মত) লাগে।

প্রায় সঙ্গেই আছে অ্যাডমিরালস হাউস। ইপ্সউইচের সন্তান অ্যাডমিরাল বেঞ্জামিন উইলিয়াম পেজ অবিবাহিত ছিলেন। প্রাচীন বস্তুর কদর বুঝতেন তিনি। তাঁর বাড়িটিতে সাতাশটি কক্ষ। সারাজীবন ধরে যখনই খবর পেয়েছেন যে ইপ্সউইচে বা নিকটে কোন পুরানো বনেদি বাড়ি ভেঙে ফেলা হবে তখনই সেখানে গিয়ে পছন্দমত আসবাব, মেন্টালপিস, ইত্যাদি কিনে নিজের বাড়ির ঘরগুলি সাজিয়েছেন। পরে বাড়িটি দান করে গেছেন ইপ্সউইচ ইনস্টিটিউটকে। এখানে এখন ছোট একটি রেস্তরাঁ আছে। নাচ, গান, আঁকা, যোগা ইত্যাদি শেখবার ক্লাশ হয়, তবে রক্ষণাবেক্ষণের খরচ চলে। যে ভদ্রলোক ঘুরিয়ে সব দেখালেন তাকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। গায়ের রঙটি তো তার দুধে আলতায়। কিন্তু তার মুখের আকৃতি, চোখের আদল, চুলের আদল, কথা বলার ভঙ্গি সব আমাদের সুধীরবাবুর-শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার এর মত। খুব অবাকই লাগলো। ঈশ্বরের কতই না কৌতুক। যাঁরা হিন্দি সিনেমার রসিক এবং চোর মচায় শোর' দেখেছেন তারা বলবেন, 'হাম শকল হোতা হ্যায়'।

এগুলি ছাড়াও ইপ্সউইচে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের অনেক বাড়িঘর আছে। সেগুলি এখনো বিভিন্ন কাজে ব্যবহার হচ্ছে। সাফোক রেকর্ড অফিস এইসব পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনের হিসাব রাখেন ও কৌতূহলী জিজ্ঞাসুর সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকেন। ওল্ড কাস্টম হাউস, আইজাক লর্ডস্ ওয়্যার হাউস, বেলস্টেড হাউস, উলভার্স্টোন হল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইপ্সউইচ সোসাইটি এইসব উত্তরাধিকার রক্ষার চেষ্টা করেন। এরা সভা করেন, চাঁদা তুলেন, সরকারও ধনীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইপ্সউইচের গৌরব যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে সর্বদা তাদের দৃষ্টি সজাগ। ঈশ্বর তাদের সহায় হোন কামনা করি।

ক্যান্টারবেরি

অনেক বছব আগে একবার সারনাথ গিয়েছিলাম-তীর্থ পর্যটনকালে। বলা হয় যে এই সারনাথ থেকেই বুদ্ধদেব তাঁর নিরীশ্বর সৎ জীবন যাপনের অভিনব ধর্মপ্রচার আরম্ভ করেছিলেন। তৃতীয় খ্রিস্ট পূর্ব শতকে এই সারনাথে সম্রাট অশোক একটি স্তূপ নির্মাণ করান, তাঁর একটি স্তম্ভ স্থাপন করান ও একটি শিলালেখ রাখেন। সাবনাথেব পবিত্র ভূমিতে দাঁডালে, সেই স্তূপের প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করলে মনে একটি শীতল শান্তি অনুভূত হয়। বড ভাল লাগে। একবাব বুদ্ধগয়ায়ও গিয়েছিলাম। ওখানে এক বৃক্ষতলে বসে সিদ্ধার্থ বোধিলাভ করে বুদ্ধ হয়েছিলেন। বুদ্ধগয়ায় তরুণ সন্ন্যাসীগণ কে কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে মন্ত্রজপ করে তপস্যা করছেন তা দেখে আশ্চর্য হয়েছি। বারাণসীতে গিযে মনে হযেছে যে এই নগবী পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন জীবন্ত নগরী বটে। কপিলাবস্তুর সংসাব ত্যাগী বাজপুত্র বারাণসীব পথে যখন হাঁটতেন তখন থেকে আড়াই হাজার বছর পাব হযে গেছে। কিন্তু তখনই বাবাণসীব বয়স তিন হাজার বছব পার হয়ে গিয়েছিল। বারাণসীর পাশ দিযে বযে যাওযা গঙ্গা কত কালের সাক্ষী। কবে বাজা হরিশ্চন্দ্র চন্ডাল হয়ে ওই মণিকর্ণিকাব ঘাটে তিন চিতা সাজিয়েছিলেন মৃত পুত্র রুহিদাস, মৃতপ্রায় পত্নী শৈব্যা ও নিজেব জন্য? ভাবতবর্ষেব কত স্থানে ছড়িয়ে আছে কত ঐতিহাসিক ঘটনার কথা। বিভিন্ন স্থানে গেলে কেন যেন মনে হয় বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার আমি বুঝি প্রত্যক্ষদর্শী' হবে না কেন, আমাব ধমনীতে বইছে আত্মাব অমবত্বের কথা। অনন্তবাব শরীর নষ্ট হযেছে, ত্যক্ত হযেছে, কিন্তু এই শরীবী আত্মা আছে। হয়তো কোন সুদূর অতীতে অন্য শরীবে আমি এখানে বা ওখানে ছিলাম; সেই কথাই অস্পষ্ট ভাবে মনে পড়ে।

> ন জাযতে ম্রিয়তে বা কদাচিন্ নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূযঃ।
> অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহযং পুবানো ন হন্যতে হন্যমানে শবীবে।।

এই (আত্মা) কখনো জন্মান না বা মরেন না, ইনি কখনো হন না, হযে থাকেন না; এঁর জন্ম নেই, ইনি নিত্য, সনাতন ও পুরাতন, শবীব বিনষ্ট হলেও (আত্মা) হত হন না।

সকল বিদেশবাসী যেমন স্বদেশে জন্মস্থানে যেতে চান, গেলে ভাল লাগে, বাল্যবেলাব কথা তার জন্মস্থানে গেলে মনে পড়ে, আবাব তিনি স্মবণে মননে সেই বেলা বাঁচেন, আমাবও তেমনি ঐতিহাসিক স্থানে যেতে ইচ্ছে কবে। আমাব প্রাচীন স্থানে দাঁড়ালে, ঐতিহাসিক ঘটনা মনে পড়ে, নিজেকে এক অলীক প্রত্যক্ষদর্শী মনে হয়। আমাব অবাক লাগে না। তাই খুব ঘুবে বেড়াই।

আমার ছেলেটিও তেমনি। কোন পিতা যেমন প্রিয় শিশুপুত্রটির সব আবদাবই রাখবার চেষ্টা করে, প্রায় সাধ্যাতীত দাম দিয়েও পুত্রের আকাঙ্ক্ষিত খেলনা, পোশাক, চকোলেট কিনে দেয়, আমার পুত্রও পিতার মুখ থেকে কোন স্থানেব নাম বার হলেই সেখানে নিয়ে যায়। গাড়ি চালাতে তার কোন ক্লান্তি নেই, পায়ে হাঁটতে তার পবিশ্রম নেই, ঘুমের রেশনে টান পড়ছে বলেও তার কোনই উদ্বেগ নেই। বাপকে নিয়ে উদ্দাম ঘুবে বেডাচ্ছে কোথায়

কোথায়; বার্কিং রোড, হ্যাম্পস্টেড, লোয়েসটফট, বাকিংহামশায়ার, বেরী সেন্ট এডমান্ডস, কেমব্রিজ আর এবার ক্যাণ্টারবেরী। বলেছিলাম একবার মহুয়া সৌমজিৎদের বাড়িতে বসে 'ক্যান্টারবেরী'র নাম। ব্যস, প্রসূন ঠিক করে ফেললো ছয়ই সেপ্টেম্বর, ২০০৩ তারিখ শনিবার নিয়ে যাবে পিতা মাতাকে ক্যান্টারবেরী দেখাতে। ওদের কাজে ছুটি খুবই কম। সপ্তাহে কাজ অবশ্য পাঁচ দিন। শনি রবিবারকে ওরা উইক এন্ড বলে। যাওয়ার স্থানটি বেশিদূরে হলে শনিবারই বেশি পছন্দ; পরদিন রবিরার বলে শনিবারে বেশি পরিশ্রম হলেও কুছ পরওয়া নেই, সকালে ঘুমিয়ে পুষিয়ে নেওয়া যায়। কাছে হলে শনি রবি যে বারেই হোক; সকাল দুপুর বিকাল যখনই হোক বেরিয়ে পড়া যায়। গতবার (২০০২) যখন আমেরিকায় গিয়েছিলাম তখনো এই করেছে। গতবার মানসিক আবহাওয়া আরো ভালো ছিল, পায়েল, জয়ন্ত, রাজর্ষি, সর্বাণী-অভিজিৎ এবং পায়েলের বাবা-মা পঙ্কজ, পূর্ণিমা ছিলেন। এন্তার ঘুরেছি। সেসব আমার আমেরিকার কথায় লিখেছি এবার কাছাকাছি সঙ্গ দেবার সঙ্গী নেই। তবে সেটা ছিল বিশাল দেশ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র; আর এটা নেহাৎই একটা দ্বীপ ইংল্যান্ড, খুব ঘুরছি এবার (২০০৩)ও। স্থির হলো যাব ক্যান্টারবেরী। আমরা থাকি সাফোক কাউন্টির ইপ্সউইচে, ক্যান্টারবেরী হচ্ছে 'কেন্ট' এ। আমাদের ফনেরো রোডের বাসস্থান থেকে দূরত্ব বেশ— ১১১ মাইল বা ১৭৭ কিলোমিটার। ইন্টারনেটের রুটপ্ল্যানার থেকে যে পথের দিশা আনা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে সময় লাগবে দু-ঘণ্টা উনচল্লিশ মিনিট।

এই পথ নির্দেশিকা এবং মানচিত্র ইন্টারনেট সভ্যতার এক অনবদ্য দান। আমেরিকায় ও দেখেছি ইংল্যান্ডএও দেখছি গাড়ির চালকরা যে-কোনো অচেনা জায়গায় যেতে হলেই পথের নির্দেশ ও মানচিত্র চায় ও কম্পিউটার থেকে প্রিন্ট আউট নিয়ে নেয়। চালকের বাড়ি থেকে তার গন্তব্য স্থল পর্যন্ত পুরো পথের নির্দেশ থাকে ওইগুলিতে। উপদেশও থাকে— ক্লান্ত হলে গাড়ি চালাবেন না। দু-ঘণ্টা গাড়ি চালাতে চালাতে ক্লান্তি লাগলে কাছের সার্ভিস ষ্টেশনে যান, এক কাপ কফি খান বা একটু ঘুমিয়েই নিন। যাট মাইলের (প্রায় শো কিলোমিটার ঘণ্টায়) বেশি স্পীডে গাড়ি না চালালেই ভালো।

ক্যান্টারবেরী। বেশ প্রাচীন জায়গা। সেই কবে পোপ প্রথম গ্রেগরি বেনেডিক্টাইন মঙ্ক সেন্ট অগাষ্টিনকে পাঠিয়েছিলেন ইংলণ্ডে খ্রিষ্টের ধর্মপ্রচার করতে। সাধু অগাষ্টিন এসে ভিড়েছিলেন কেন্ট এর উপকূলে। দেখা করেছিলেন কেন্ট এর রাজা প্রথম এথেলবার্টের সঙ্গে। অনুমতি চেয়েছিলেন ধর্মপ্রচারের। রাজা অনুমতি দিয়েছিলেন এবং ক্যান্টারবেরীতে তাকে থাকার জায়গাও দিয়েছিলেন। রানি বার্থাতো শ্রদ্ধায় গদ গদ। তিনি খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করলেন। গত ১৯৯৭ সালে ক্যান্টারবেরী সেন্ট অগাষ্টিনের আগমন ও রানী বার্থার খৃষ্ট ধর্মগ্রহণ করার চৌদ্দশো বছর পূর্তি উৎসব পালন করেছে এবং 'বার্থাজ ওয়াক' বলে একটি পায়ে হাঁটার রাস্তা করেছে সেই ঘটনার স্মরণে। রাজা এথেলবার্টের কালেই সেন্ট অগাষ্টিন ক্যান্টারবেরীর আর্চবিশপ হন রোমের পোপের অধীনে। সেই পরম্পরা অব্যাহত চলছে। সেই পরম্পরা রক্ষার জন্য টমাস বেকেট রাজরোষে পড়ে প্রাণ দিয়েছেন ১১৭০ সালে। আর্চ বিশপ টমাস বেকেট আততায়ীর হাতে প্রাণ দেন ১১৭০ সালের ২৯শে ডিসেম্বর। তাঁর মৃত্যুর পর বছর তিনেক এখানে কোন আর্চবিশপ ছিলেন না। ১১৭৩ সালে রোমের

পোপ তৃতীয় আলেকজান্ডার বেকেটকে সেন্ট ঘোষণা করেন। ১১৭৪ সালে রিচার্ড অব ডোভারকে আর্চ বিশপ পদে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু রাজাদের চার্চ দখল করার প্রচেষ্টা থামেনি। ১৫৩৪ সালে অ্যাক্ট অব সুপ্রিমেসি পাশ হয়; তখনকার আর্চ বিশপ টমাস ক্রেমার সেটি মেনে নেন, আর ইংল্যান্ডে পোপের অধিকার শেষ হয়, রাজাই চার্চের প্রধান হন। ক্যান্টারবেরীর আর্চ বিশপ অ্যাঙ্গলিকান চার্চের অধ্যক্ষ নহেন। তবে যখনই অ্যাঙ্গলিকান চার্চের কোন সম্মেলন হয় তিনিই সভাপতিত্ব করেন।

ক্যান্টারবেরীর ক্যাথিড্রলে আর্চবিশপ টমাস বেকেটের হত্যা এক আশ্চর্য ঘটনা। টমাস বেকেট (১১১৮-১১৭০) ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে বিদ্যার্জন শেষ করে ক্যণ্টারবেবীর আর্চ বিশপের অধীনে কাজ নেন। বিদ্বান বুদ্ধিমান ও করিৎকর্মা এই অফিসারটিকে ক্যন্টাববেরীর বহুপদে রেখে কাজ করিয়েছেন আর্চ বিশপ। কিন্তু লোকটিকে চোখে লেগে যায় রাজা দ্বিতীয় হেনরীর। তিনি তাঁকে নিয়ে যান এবং চ্যান্সেলার অব ইংল্যান্ড পদ দেন। বড় পদে গিয়ে বেকেট বিলাসে গা ভাসিয়ে দেন। রাজার পরম প্রিয়পাত্রটি রাজাকে ছাড়িয়ে যান। এমন সময় ক্যন্টারবেরীর আর্চ বিশপেব পদটি খালি হয়। রাজা হেনবী তাঁর নিজের লোক টমাস বেকেটকে সেই পদে বসাবেন স্থির করলেন। কিন্তু বেঁকে বসলেন বেকেট। বললেন, 'এমন কাজটি করো না। আমি তোমাব বন্ধু বলে আমাকে এই পদ দিচ্ছ এই মনে করে যে আমাকে দিয়ে মনোমত কাজটি কবিযে নিতে পাববে। কিন্তু তা হবে না। ওই পদ পেলে আমাকে পদেব মর্যাদা রেখে চলতে হবে। আমি তোমাব আজ্ঞাবহ হযে লোক হাসাতে পারবো না।' রাজাব সিদ্ধান্ত দৃঢ় হলো। একেই কববেন আর্চ বিশপ। করলেনও। সেটা ছিল ১১৬২ সাল।

বেকেট কি আব কববেন? বাজাজ্ঞা তো না মেনে পাবা যায় না! গেলেন, শপথ নিলেন আর্চ বিশপ পদে। কিন্তু বাতাবাতি চবিত্র পরিবর্তিত হযে গেল টমাস বেকেটেব। সমস্ত বিলাস বিদায় নিল। অতি সবল জীবন যাপন করতে আরম্ভ করলেন তিনি। অল্পদিনেব মধ্যেই শুরু হলো সংঘাত রাজশক্তিব সঙ্গে। অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়ালো যে ১১৬৪ সালে প্রাণেব ভয়ে আর্চ বিশপ টমাস বেকেট পালিয়ে গেলেন ফ্রান্সে। ছয় বছর কাটলো নির্বাসনে। কিন্তু একদিন মনে হলো তিনি ঠিক কবছেন না। ইংল্যান্ডের বাজাব ভযে তিনি বিশ্বপতি, রাজার রাজা ঈশ্বরের কর্তব্য পালন কবতে পাবছেন না? মেরে ফেলবে? ফেলুক। সুতবাং ফিরে এলেন তাঁর অধিষ্ঠানে, ক্যন্টারবেবীর ক্যাথিড্রালে। আবার সংঘর্ষ। ক্রুদ্ধ রাজা হেনবী একদিন লন্ডনে স্বগতোক্তি কবলেন. 'একটা পুরোহিত রাজাকে এত জ্বালাচ্ছে। এমন কেউ নেই এটার হাত থেকে আমাকে মুক্তি দেয?' চারজন নাইট ঘোড়ায় চড়ে রওয়ানা হয়। সান্ধ্য প্রার্থনাব সময় ওরা ক্যন্টারবেরীর ক্যাথিড্রলে পৌছায় এবং প্রার্থনারত আর্চ বিশপকে হত্যা করে। রক্তে রঞ্জিত হয় ঈশ্বরের ঘব। সেটা ছিল ২৯শে ডিসেম্বর ১১৭০। তিন বছব কেউ আর্চ বিশপ ছিলেন না এখানে। ১১৭৩ এ বেকেট সেইন্ট হয়ে যান। পবে ডোভার এর রিচার্ড আর্চ বিশপ হন। সেই থেকেই ক্যান্টারবেরীব ক্যাথিড্রাল তীর্থস্থান। তখন থেকেই দলে দলে তীর্থ যাত্রী আসে বেকেট উৎসবে। তবে আজ যে টমাস বেকেট-এর মূর্তি দেখে এলাম, যে স্থানটিতে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল, সেই স্থানে রাখা তলোয়ার দেখে এলাম তা কি ছিল? বসানো হয়েছিল বটে, কিন্তু সহ্য হয়নি লন্ডনের রাজশক্তির। ১৫৩৮ সালে, টমাস

বেকেটের হত্যার ৩৬৮ বছর পরেও রাজার আদেশে এই ক্যাথিড্রলে প্রবেশ করে বেকেটের সমস্ত চিহ্ন মুছে দেয় দুর্বৃত্তরা। ১৫৩৪ সালে অষ্টম হেনরীই অ্যাক্ট অব সুপ্রিমেসি পাশ করিয়ে পোপের অধিকার বিনষ্ট করে ইংল্যান্ডে চার্চের উপর রাজার অধিকার প্রতিষ্টা করেন। যা দেখে এলাম সেসব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই সেদিন, ১৯৮৬ সালে। চারশো বছর ধরে মানুষ তীর্থ করে গেছে, শ্রদ্ধা জানিয়ে গেছে, চোখের জলে ভেসেছে শূন্য স্থানে।

ক্যান্টারবেরীর ক্যথিড্রালটির পুরো নাম ক্রাইষ্ট চার্চ ক্যাথিড্রাল অব ক্যান্টারবেরী। সারা পৃথিবী জুড়ে বহু জায়গার নামের আগে 'ক্রাইষ্ট চার্চ' কথাটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা এখন যে ইপ্সউইচে থাকি, যে পার্কটির গায়ে ফনেকরোডে এই টাওয়ার অ্যাপার্টমেন্ট নামের ষোল নম্বর বাড়িটি দাঁড়ানো, সেই পার্কটির নাম ক্রাইষ্ট চার্চ পার্ক, পার্কে একটি চারশো বছরের প্রাচীন প্রাসাদ আছে, সেটির নামও 'ক্রাইষ্ট চার্চ ম্যানশন।' ক্যাথিড্রালে ঢুকতে দক্ষিণা লাগে। সাবালকদের জন প্রতি চার ও শিশু বৃদ্ধদের তিন পাউন্ড করে। আমরা চার জনের জন্য দক্ষিণা দিতে হলো চৌদ্দ পাউন্ড, বা প্রায় এগারোশ টাকা। টিকিট কেটে ভিতরে যাওয়ার পথে হাতে আসে ছোটো একটি মুদ্রিত বিজ্ঞপ্তি—'প্রবেশমূল্য কেন?' ওরা বলছেন যে এই বিশাল অট্টালিকাটি রক্ষা করতে, যাঁরা এখানে থাকেন বা এটি দেখতে আসেন তাদের নিরাপত্তা সহ সব ব্যবস্থা করতে, অনভিপ্রেত আগন্তুকদের রুখতে, এই অট্টালিকার সংস্কার করতে প্রতিদিন গড়ে নয় হাজার পাউণ্ড খরচ হয়। সংস্কার কাজ তো লেগেই আছে, বিদ্যালয়গুলি চলছে, আর চলে না। সরকার বা কোন গির্জা সংস্থা থেকেও কোন সাহায্য আসে না। এই প্রবেশ মূল্য নেওয়া হচ্ছে কিছুদিন থেকে। তবে যাঁরা স্থানীয় লোক, যাঁরা ক্যাথিড্রেলের চার মাইলের মধ্যে বাস করেন অথবা যাঁরা আরো দূর থেকে প্রতিদিন এখানে কাজ করতে আসেন এবং যাঁরা এই ডায়োসিসের অন্তর্ভুক্ত কোন চার্চের সদস্য, তাঁদের প্রবেশমূল্য লাগে না। ওই রকম লোকের জন্য ষাট হাজার পাশ দেওয়া হয়েছে। ওরা ঐ পাশ দেখিয়ে আসতে পারেন এবং আসেন।

সারা ইউরোপ শীতল এলাকা, উচ্চ অক্ষাংশে অবস্থিত। ইংল্যান্ড তো আরো অনেক ঠান্ডা হতো। কেবল উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোত পাশ দিয়ে বইছে বলে শীতলতা কমেছে। শীতল বলে চাষবাস সহজ ছিল না। জমিও তেমন উর্বর নয়। ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত ভারতীয় উপমহাদেশে জমি উর্বর, চাষ সহজ সাধ্য, বনেও কত ফল পাকুড়। তাই আমার পূর্বপুরুষ বলেছে আমার আদর্শের কথা বিনা আয়াসে বনে যে শাক জন্মায় তাতে যে পোড়া পেট ভরে তার জন্য কে যায় পাপ করতে?' 'স্বচ্ছন্দ বনজাতেন শাকেনাপি প্রপুয়তে অস্য দগ্ধোদর স্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ।' অবশ্য এই আদর্শের জন্য আমরা নিরুদ্যম, অলস, কর্মবিমুখ হয়ে দরিদ্র হয়ে আছি কিনা সে বিতর্ক এখানকার নয়। আমাদের দ্রষ্টব্য ইউরোপ। জলবায়ুর অমিত্রতা, জমির কম উর্ববতা ইত্যাদির কারণে ইংল্যান্ডসহ সমগ্র ইউরোপে দস্যুর আক্রমণ ছিল প্রতিনিয়ত। সুতরাং গড়ে উঠেছে কত কাস্‌ল্ বা দুর্গ, উচ্চ প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে জনবসতি সকল। ক্যান্টারবেরীও উঁচু প্রাচীরে ঘেরা। এই প্রাচীর ইটের নয়, হাতের মুঠির মত আকারের ভাঙা পাথরের টুকরো দিয়ে। সেই কালের কোন মসলা দিয়ে জুড়ে এই প্রাচীর তৈরি। পাথরের ভাঙা কিনারাগুলি ধারালো। এতবছর পরেও সেই ধার আছে।

ধরলে হাত কেটে যাবে। পড়েছি চিনের প্রাচীর খুব প্রশস্ত। কোন কোন জায়গায় এতই প্রশস্ত যে ষোলো জন অশ্বারোহী পাশাপাশি চলতে পারে। সে তুলনায় ক্যান্টারবেরী শহরের প্রাচীর নেহাৎই সামান্য। প্রাচীরের উপরের মসৃণ পুরনো পথ দিয়ে চার পাঁচ জন অনায়াসে হাঁটা যায়। লোকে হাঁট্‌ছেন। এই হাঁটাটি এখানকার একটি আকর্ষণ। এক দিকে ক্ষুদ্র প্রাচীন শহর, আর অন্যদিকে, বাইরের দিকে, পরে গড়ে উঠা চতুর্গুণ বড় আধুনিক শহর। প্রাচীরের উপরে, অনুমান দেড়শো মিটার দূরে দূরে অবজার্ভেশন টাওয়ার। মনের চোখে যেন দেখতে পেলাম নগরী আক্রান্ত, নাগরিকগণ প্রস্তুত। বাইরে শত্রু। এমন একটি আক্রমণের মনোদৃষ্ট বর্ণনা দেখেছি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মৃৎপ্রদীপ' নামক ইতিহাস আধারিত গল্পে। আক্রান্ত নগরী পাটলিপুত্র। শরদিন্দুর ভাষায়ই শুনুন ঃ "মহাসচিব ও সান্ধিবিগ্রহিক পূর্ব হইতেই দুর্গদ্বার রোধ করিয়াছিলেন। প্রাকারে প্রাকারে ভল্লহস্তে সতর্ক প্রহরী ঘুরিতেছিল, সিংহদ্বারগুলির উপরে বৃহৎ কটাহে তৈল উত্তপ্ত হইতেছিল। লৌহ জালিকে সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া স্নায়ুজ্যাযুক্ত ধনুহস্তে ধানুকিগণ ইন্দ্রকোষে লুক্কায়িত থাকিয়া পরিখাপারবস্থিত শত্রুর উপর বিষ-বিদুষিত শর নিক্ষেপ করিতেছিল। প্রাকারের হস্তিনখ মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সেনানীগণ শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল। বুভুক্ষিত কুম্ভীরদল পরিখার কমলবনের মধ্যে খাদ্যান্বেষণে ইতস্তত সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছিল। বাহিরে শত্রু সৈন্য মাঝে মাঝে একযোগে দুর্গদ্বার আক্রমণ করিতেছিল। তখন মকরমুখ হইতে প্রচণ্ডবেগে তপ্তৈতল বর্ষিত হইতেছিল। আক্রমণকারীরা হতাহত সহচরদিগকে দুর্গদ্বারে ফেলিয়া ভগ্নোদ্যমে ফিরিয়া যাইতে ছিল।" আমিও যেন ক্যান্টারবেরীর প্রাচীরের উপরে দাঁড়িয়ে অস্পষ্ট এমন একটি দৃশ্য দেখলাম।

এখানে ক্যান্টারবেরীর কথা বলতে ৫৯৭ খ্রিস্টাব্দে অগাস্টিনের আসার কথা বলা হলেও ক্যান্টারবেরীর ইতিহাস খ্রিস্টপূর্ব যুগে বিস্তৃত। এখানে 'রোমান মিউজিয়াম' বলে একটি জায়গা আছে উপযুক্ত দক্ষিণা দিয়ে সেখানে গেলে ক্যান্টারবেরীর সঙ্গে রোমান সম্পর্কের কথা জানা যায়। সেই সম্পর্ক খ্রিস্টপূর্ব যুগের। পুরাতত্ত্ববিদেরা খনন করে এই রোমান এলাকা খুঁজে পেয়েছেন। কিছু বাড়ির ধ্বংসাবশেষ কিছু ব্যবহৃত জিনিসপত্র, আর আছে দোকান।

কান্টারবেরীতে প্রত্যেকদিন আসেন পর্যটক-দর্শক-ভক্তগণ। কিন্তু সেন্ট টমাস বেকেটের শহীদ হওয়া উপলক্ষ্যে যে বার্ষিক উৎসব হয় তখন মানুষ আসেন দলেদলে। সেই আসা উপলক্ষ্য করে একটি গল্পগুচ্ছ লিখেছেন জেফ্রি চসার চতুর্দশ শতাব্দীতে। 'ক্যান্টারবেরী টেলস' নামের পদ্যে লেখা সেই গল্পগুচ্ছে ক্যান্টারবেরীর কথা কিছুই নেই। কিন্তু সেই বই ক্যান্টরেরীকে জগদ্বিখ্যাত করেছে; চসার নিজেও সেই বই লিখে জগদ্বিখ্যাত হয়েছেন। বইয়ের অনুবন্ড বা Prologueটি বড় ভাল। ক্যান্টারবেরীর বার্ষিক উৎসবের যাত্রী ঊনত্রিশ জন লন্ডন শহরের উপকণ্ঠে 'ট্যাবার্ড ইন' এ রাত কাটাচ্ছেন। কাল সকালে যাত্রা শুরু। কেউ যাবেন হেঁটে, কেউ ঘোড়ায়। ইন্ এর মালিক প্রস্তাব করলেন তিনিও যাবেন যাত্রীদের সঙ্গে, একশর্তে। প্রত্যেক যাত্রী যাওয়ার সময় দু-টি ও আসার সময় দু-টি গল্প বলবেন। সবার ভোটে যার গল্প শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হবে তাকে সবাই চাঁদা দিয়ে এক মহাভোজে আপ্যায়িত করবেন। অনেক গল্প হওয়ার কথা। কিন্তু মাত্র চব্বিশটি গল্প আছে বইয়ে, তাতেও দুটি অসম্পূর্ণ। কিন্তু বইটি জনপ্রিয় হয়েছে Prologueটির জন্য। চসার প্রতিটি তীর্থযাত্রীর চেহারা ও চরিত্র এমন সুন্দর

করে চিত্রিত করেছেন যে একজন ঐতিহাসিক বলেছেন যে, একদিকে রাজন্যবর্গ, অন্যদিকে হতদরিদ্রগণ যারা সঙ্গত কারণেই তীর্থযাত্রায় যেতে পারেন না, এরা ছাড়া চসার সমগ্র ইংরেজ জাতটাকেই তার এই Prolouge-এ তুলে ধরেছেন 'Except for the royalty on the one hand and the dregs of the people on the other whom probability excludes from sharing a pilgrimage, Chaucer has taken the whole English nation in his prologue. এই 'ক্যান্টারবেরী টেলস' এ ক্যান্টারবেরীর কথা কিছু নেই, অথচ এই বইটি ক্যান্টারবেরীর কথা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়েছে।

সেন্ট টমাস বেকেটের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে নত মস্তকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে করতে মনে পড়লে কত কথা। সব বন্ধন ছেড়ে দিয়ে, সমস্ত মোহ ত্যাগ করে যাঁরা ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করেন তাঁদেরকে ঈশ্বর রক্ষা করেন কৈ? রাজার নাইটেরা টমাস বেকেটকে সান্ধ্য প্রার্থনারত অবস্থায় হত্যা করলো। ঈশ্বর তাঁকে রক্ষা করলেন না তো? আবার বলি কাকে বলে রক্ষা? টমাস বেকেট বাহান্ন বছর বয়সে আততায়ীর হাতে প্রাণ দিয়েছেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য বত্রিশ বছরের দেহটি ত্যাগ করেছেন, যিশুখ্রিস্ট তেত্রিশ বছরে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন, স্বামী বিবেকানন্দ উনচল্লিশে স্বধামে গমন করেছেন। কি হতো টমাস বেকেট আরো দশ বিশ বা পঞ্চাশ বছর বেঁচে থাকলে? ক্যান্টারবেরীতে আর্চ বিশপতো হয়েছেন হয়তো আরো একশত জন! কিন্তু ক্যান্টারবেরীতে ১১৭০ সালের পর আমার মত কোটি শ্রদ্ধালু এসেছেন এবং আসবেন তার মধ্যে কত জন টমাস বেকেট ছাড়া আর কোন আর্চবিশপকে স্মরণ করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন? আমার মনে হয় আর কাউকে না, সেন্ট অগাষ্টিনকেও না। ধর্মের তত্ত্ব বোঝা কঠিন, এ যে' নিহিতং গুহায়াং! দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ। আগরতলার একটি যুবক ছেলে, ব্যবসায়ী, বিবাহিত ও এক সন্তানের জনক। সকাল বেলা লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ির দীঘিতে নিত্য দিনের মত স্নান করতে যাচ্ছিল। নতুন মোটর সাইকেল কিনেছে তার এক বন্ধু। চালিয়ে যাচ্ছে। থামলো বন্ধুকে দেখে। উৎসাহে আনন্দে বন্ধুকে জোড় করে পিলিয়নে বসিয়ে চালাতে গেল। মুহূর্তে দুর্ঘটনা। ছিটকে পড়ে মৃত্যু। ধর্মপ্রাণ সদাহাস্যমুখ, পরোপকারী একটি তরতাজা যুবক চলে গেল। আমাদের বড় দুঃখ। মাস খানেক পরে মৃতের বড় ভাই অশ্রু সজল চোখে একটি পোস্ট কার্ড আমাকে দেখালেন: পূজ্যপাদ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজী লিখেছেন, '—কে যে এত অল্প বয়সে ঠাকুর কোলে তুলে নিলেন তা শুনে আমরা স্তব্ধ। তাঁর প্রয়োজনে তিনি নিয়েছেন....।' কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গান্ধারীর আবেদন' কবিতায় গান্ধারী তাঁর পতিদেব রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে আবেদন জানাচ্ছেন পাপিষ্ঠ পুত্র দুর্যোধনকে ত্যাগ করে ধর্ম রক্ষা করতে। রাজা ধৃতরাষ্ট্র অন্তরে বাহিরে অন্ধ। তিনি বললেন, 'কি দিবে তোমারে ধর্ম?' গান্ধারী বলছেন, 'মহারাজ! ধর্ম নহে সম্পদের হেতু, নহে সে সুখের ক্ষুদ্র সেতু, ধর্মই ধর্মের শেষ।' জানি, তবু বুঝতে পারি কই? আমাদের নিজেদের দিকেই তাকাই। হৃদয় বৃন্তে কন্যারূপে যে ফুলটি ফুটেছিল, অকালে ঈশ্বর তাকে তুলে নিলেন একটি অবোধ পাঁচ বছরের বালককে মাতৃহারা করে। বুঝি সব তাঁর ইচ্ছা, কিন্তু হৃদয়ের যে জায়গাটি থেকে তাকে তুলে নেওয়া হয়েছে সেখানকার ক্ষত নিরাময় হয় কই? থেমে থাকে কিন্তু প্রসঙ্গের নখ ক্ষরণে আবার রক্ত ঝরে, নতুন করে বেদনা হয়। এত কথা সেন্ট টমাস বেকেটের হত্যা

স্থলে দাঁড়িয়ে মনে এলো। THY WILL BE FULFILLED তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, হে ভগবান।

ক্যান্টারবেরীর ক্রিপ্টে যথাস্থানে একটি করে মোমবাতি দিলেন বেলা ও মুদিতা। আমরা পড়লাম মুদ্রিত প্রার্থনা—

I lit a candle in	আমি একটি প্রদীপ দিলাম
CANTERBURY CATHEDRAL	ক্যান্টারবেরী ক্যাথিড্রালে
I did not know how to pray	আমি জানতাম না প্রার্থনা কেমন করে করে
I did not know what to pray	আমি জানতাম না কি প্রার্থনা করবো
I did not have much time	আমার সময়ও ছিল না বেশি
The light which I offered was	আমার প্রদীপটি ছিল
a little of what I have	আমার যা ছিল তার একটু
a little of my time	আমার সময়ের একটু
a little of myself	আমার নিজের একটু
I left it before the Lord	আমি ওটিকে ঈশ্বরের সামনে রেখেছি
before the Blessed Virgin	পবিত্র কুমারীর সামনে রেখেছি
and the whole company of heaven	স্বর্গের সকলের সামনে রেখেছি
THE FLAME	দীপ শিখাটি
Stood for my prayer	আমার প্রার্থনা
Which is always with me	যা সদা আমার সঙ্গে আছে

ক্যান্টারবেরী ক্যাথিড্রালে এক জায়গায় সাজিয়ে রাখা আছে অনেক মূল্যবান জিনিস। আমার কাছে সবচেয়ে শ্রদ্ধার বস্তু দেখলাম দুটি, একটি ক্ষুদ্র রূপার আধারে রাখা এক খণ্ড শ্বেত বস্তু। লেখা আছে যে সকলের বিশ্বাস এটি টমাস বেকেটের অস্থির একটি খণ্ড। আর একটি অলংকৃত রূপার ক্রশ। রিভিলেশন পুস্তকে যেমন বর্ণিত আছে তেমন একটি ক্রশ। এতে অনেক মূল্যবান মণি ইত্যাদি বসানো আছে। আছে কত পান পাত্র, অস্ত্র ইত্যাদি। আমাদের থাকা কালে বৈকালিক প্রার্থনা হল। আনুষ্ঠানিক পোশাকে যাজকদেরকে দেখলাম। ভজন গান শুনলাম। মন শ্রদ্ধায় আপ্লুত হল। ঈশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বড় সুন্দর একটি তীর্থস্থান দর্শন হল। হিন্দু হওয়ার এটাই লাভ। সকলের তীর্থেই শ্রদ্ধা জানাতে পারি। আমার ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান। "আছ অনলে অনিলে, চিরনভোনীলে, ভূধর সলিলে গহনে। আছ বিটপীলতায় জলদের গায়, শশী তারকায় ও তপনে।" আমার কাছে শিববাড়ি ও ক্যান্টারবেরীতে সমান অধিষ্ঠান ঠাকুরের। আমার পুস্তক বলে —

বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনী।
শুনিচৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ।। গীতা ৫-১৮

যতক্ষণ ভিতরে ছিলাম ক্যাথিড্রালের বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিল। বাইরে এসে দেখি বৃষ্টি নেই, তবে রাস্তাঘাট ভেজা, এখানে সেখানে অল্প বিস্তর জল। ছেলে বললো, 'চল খাওয়া যাক

কোথাও। ক্ষুধা লেগেছে। গতবার আমেরিকায় তোমাদেরকে ম্যকডোনাল্ডস্ এ নিয়ে যেতে পারিনি, তোমরা নিরামিষ খাও আর এরা ওখানে নিরামিষ কিছু করে না। আজ চল ম্যাকডোনাল্ডস এ। ইংল্যান্ডে এদের নিরামিষ খাবারও আছে। তবে যদি থাকে। তিনটা বেজে গেছে। পাওয়ার ভরসা কম। পেলে খাবে তো? "মাথা নেড়ে সম্মতি দিলাম। যাওয়া হল ম্যাকডোনাল্ডস-এ। বাইরে পাতা চেয়ার টেবিল খালি নেই ভেতরেই যেতে হবে। মনে মনে বলি, তাই ভালো। ভেতরটা দেখা হয়ে যাবে। কোনোদিন যাইনি। কোনদিন কি আর যাব?' আমরা তিন জন উপরে গিয়ে বসলাম টেবিল দখল করে। রাজা দীর্ঘ লাইনের পিছনে দাঁড়ালো। মিনিট দশেক পরে মুদিতা বলে, 'দেখছিলাম ভাল ছিল, এখানে বসে ক্ষুধা বেশি লাগছে।' বেলা হাসলেন. তিনিও স্পষ্টতই ক্ষুধার্ত। আরো দশমিনিট পরে, বড় ট্রেতে করে চার জনের দু-রকমের খাদ্য ও বড় গ্লাসে কোক নিয়ে পুত্র এলো। আজ বড় তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ হয়ে গেল। Hunger is the best sauce!

এবার হেঁটে যাব সেন্ট অগাস্টিন্স্ অ্যাবেতে। বললাম যেতে যেতে যে ক্যান্টারবেরী ক্যাথড্রলের খ্যাতি বৃদ্ধির জন্য আরো একজন ধন্যবাদ পেতে পারেন। তিনি হলেন টি. এস. এলিয়ট। যাঁরাই ইংরেজি সাহিত্যের খবর কিছু রাখেন তাঁরাই এলিয়টের কথা জানেন। তাঁর 'Waste Land' বিখ্যাত দীর্ঘ কবিতা। ফ্রেন্ডস্ অব ক্যান্টারবেরী ক্যাথিড্রল নামে একটি সংস্থা আছে। এর সদস্যগণ টি. এস. এলিয়টকে ভার দেন (commissioned) ১৯৩৫ সালের বার্ষিক উৎসবের জন্য উপযুক্ত একটা কিছু লিখে দিতে। বললেন যে নাটক হলেই ভাল হয়। এলিয়ট লিখলেন তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাব্য নাটক Murder in the Cathedral। সেই বছরই এই নাটক ক্যাথিড্রালের চাপ্টার হাউসে অভিনীত হয় ও প্রকাশিত হয়। এই ক্যান্টারবেরীর সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের যোগাযোগও খুব। চসার ও তাঁর ক্যান্টারবেরী টেলস এর কথা তো বলেছি। বিখ্যাত উইলিয়াম শেক্সপীয়ারের সমসাময়িক ইংরেজ নাট্যকার ক্রিস্টাফার মার্লোর জন্মস্থান এই ক্যান্টারবেরী। এখানেই স্কুলে পড়েছেন ও লেখাও শুরু করেছিলেন এখানেই। "পাথরের দেয়ালেই কারাগার হয় না/হয় না লোহার গরাদেই পিঞ্জর/যদি হয় সুজন আর নিষ্পাপ মন/করে তোলে তারে প্রার্থনার ঘর"। ছত্রগুলি লিখেছিলেন রিচার্ড লাভলেস সপ্তদশ শতকের প্রথমার্দ্ধে। সেই লাভলেসের সঙ্গে ক্যান্টারবেরীর সম্পর্ক ছিল নিবিড়। তাঁর পিতামহ রানি প্রথম এলিজাবেথের আমলে ক্যান্টারবেরী থেকে নির্বাচিত পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। লাভলেস মাঝে মাঝেই এখানে থাকতেন।'রবিনসন ক্রুসো', 'মল ফ্ল্যান্ডার্স' ইত্যাদি গ্রন্থের লেখক ড্যানিয়েল ডিফো একজন পাদ্রী ছিলেন। তিনি ক্যান্টারবেরীর ব্ল্যাকফ্রায়ার্সে প্রচারে আসতেন। জন্মে পোলিশ হলেও পরে ইংরেজ হয়ে যাওয়া জোসেফ কনরাদ শেষ বয়সে ক্যান্টারবেরী অঞ্চলেই বাড়ি করে বাস করেন। চার্লস ডিকেন্সের উপন্যাস 'ডেভিড কপারফিল্ড' এর ডেভিড ক্যান্টারবেরীতে স্কুলে পড়েছে। এখানেই তার সঙ্গে দেখা হয়েছে ইউরিয়া হীপ ও উইক ফিল্ডস্দের সঙ্গে। ডিকেন্স প্রায়ই ক্যান্টারবেরীতে থাকতেন।

আসা গেল সেন্ট অগাস্টিনস্ অ্যাবিতে। ধ্বংস স্তূপ ছাড়া কিছুই নেই। একটি বড় ঘরে ইতিহাস লিখে রেখেছেন ওরা। প্রবেশ মূল্য মাথাপিছু তিন পাউন্ড। সুতরাং চলো। সেন্ট মার্টিনস্ চার্চ-এ। ছোট একটি চার্চ। এখানেই প্রার্থনা করতেন সেন্ট অগাস্টিনের দ্বারা

বাপ্তিস্মাদত্তা কেন্ট এর রাজা এথেলবার্টের বাণী বার্থা। চৌদ্দশো বছর আগে। কত কবব, কত স্মৃতিফলক। মনে আসে টমাস গ্রে মহাশযেব কবিতা Elegy written in a Country Churchyard. ছবি তুলে দিতে অনুবোধ করা হয এক ভদ্রলোককে। দিলেন। ওবা স্বামী-স্ত্রী এসেছেন নিউজিল্যান্ড থেকে। বললাম, আমরা ভারতীয়, এসেছি কলকাতা থেকে, নিউজিল্যান্ডের অর্ধেক পথ। ওরা হাসলেন। ওদেব সঙ্গে আবাব দেখা হয প্রাচীরের উপবে।

ছেলে আবার যাবে লীডসএ। মাইল বিশেক দূবে। যাওয়া হল। কিন্তু দেবি হয়ে গেছে। বন্ধ হয়ে গেছে কাসল্-এর দবজা। আমাদেব কোনও দুঃখ নেই। মন তৃপ্ত। অনেক দেখেছি। চল বাড়ি ফেরা যাক। পথে গাডি থামে। আবার ম্যাকডোনাল্ডস্। আগে ভেবেছিলাম আব বোধহয় এদের দোকানে যাব না। কিন্তু চাব ঘণ্টা যেতে না যেতেই আবার। এবাব কফি। কফি খেযে এক ঘণ্টা পড়ে বাড়ি। জয় বামকৃষ্ণ। জয় মা।

লন্ডনে দুর্গাপূজা-২০০৩

উৎসব সাধারণত দু'রকমের হয়, ধর্মীয় ও অন্যান্য। কেউ হয়ত বলবেন পারিবারিক ও সামাজিক। কেউ হয়ত ভাগটা করবেন অন্যভাবে। যুগে যুগে উৎসবের রকম-সকম বদলে যায়। উৎসব পালনও কত রকমের হয়। প্রাচীনকালে রাজপুত্রদের জন্য যৌবরাজ্যে অভিষেক, সিংহাসন আরোহণ, রাজ্য বিজয়, অন্য রাজার আক্রমণ পরাভূত করা ইত্যাদি ছিল উৎসবের বিষয়। অশ্বমেধ বা রাজসূয় ইত্যাদি যজ্ঞ ছিল বটে, তবে সেগুলি কালে ভদ্রে হত। প্রত্যেকেই অবশ্য পুত্র সন্তানদের (পুত্রীর নয় কিন্তু) জন্ম, পুত্রের বিবাহ, ইত্যাদিতে আনন্দ করতেন। কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে তা উৎসবে পরিণত হতো না। এখন আর রাজা নেই, তবে নির্বাচনে দলের বিজয় উৎসব, মন্ত্রী হলে তবে তার জন্মোৎসব, মন্ত্রীর পুত্রকন্যার জন্ম, বিবাহ, দন্তোদ্গম, ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ ইত্যাদি উপলক্ষ্যে বড় উৎসব হয়। বর্তমান কালে মধ্যবিত্ত বলে একটি শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছে। তিনশ' বছর আগেও পৃথিবীর কোন দেশে মধ্যবিত্ত ছিল না। ছিল কেবল রাজা ও অমাত্যবর্গ, বিদেশী ভাষায় শাহানশাহ্ আর আমীর ওমরাহ, আর একেবারে জানোয়ার সমান গরিব-গর্বা। জানোয়ার ও গরিবের কোনও উৎসব থাকে না। এখন মধ্যবিত্ত হওয়ায় সমাজটা একটা গ্যালারির মত হয়ে গেছে। তাতে অনেক থাক; বিত্তের থাক। এই গ্যালারীতে নীচের লোকগুলি দুটো চেষ্টা করছে : উপরে উঠার চেষ্টা করছে ও উপরের লোকগুলোকে টেনে নীচে নামাতে চেষ্টা করছে। উপরের লোকগুলি নীচের গুলিকে নীচে রাখতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে; সাধারণভাবে ডাকাতি, রাজনীতি অথবা বাণিজ্য করে লোক বিত্তের উপরের থাকে উঠে। আগে বড়দের বিত্ত বেশি ছিল উৎসব করতো, ছোটদের কিছুই ছিল না বলে উৎসব করার প্রশ্নই ছিল না। এখন শ্রেণীর সংখ্যা দুই নয়, অনেক। উৎসবও বেশি। স্বাধীনতা দিবসের মতো উৎসব একেবারে আধুনিক উৎসব, মে দিবসের মত উৎসব প্রায় আধুনিক উৎসব, রাজনৈতিক দলের বা কর্মচারী সমিতির বার্ষিক বা আঞ্চলিক উৎসবগুলিও আধুনিক উৎসব। কবুতর বা বিড়ালের বিয়ের মত উৎসব আজকাল উঠে গেছে কিন্তু পুষ্পপ্রদর্শনী, জারিগান-পদ্মাপুরাণ গীত প্রতিযোগিতা বা চৈত্র মাসের স্টক ক্লিয়ারেন্স বা ডিসকাউন্ট মেলা ইত্যাদি নতুন উৎসব এসেছে। কুকুর প্রদর্শনী, ষাঁড় বা মোরগের লড়াই; গোঁফ, নখ বা কানের চুলের দৈর্ঘ্য প্রতিযোগিতাও আজকাল উৎসব হিসাবে পালিত হচ্ছে। কত কম সময়ে কতটা রসগোল্লা, সিদ্ধডিম বা কাঁচালঙ্কা কে খেতে পারেন সেসব নিয়েও উৎসব হচ্ছে। কে কত দিন ধরে প্রতিদিন স্ত্রীকে বা স্বামীকে প্রহার করে আসছেন এমন একটা বিষয় নিয়েও উৎসব হতে পারে। গিনেস বুকে স্থান হতে পারে।

তবে উৎসবের বিষয় নিয়ে বিবেচনা করলে ধর্মীয় বিষয়ই শীর্ষে থাকবে সন্দেহ নেই। জনপ্রিয়তার এই দিকটা বিবেচনা করেই নিরীশ্বরবাদী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও সোৎসাহে ধর্মীয় উৎসব গৃহের দ্বারোদঘাটন, মন্দির সজ্জা, প্রতিমা নির্মাণ ইত্যাদির বিচারে অংশ গ্রহণ ইত্যাদি করতে নির্বিচারে এগিয়ে আসেন। ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে বাঙালির দুর্গোৎসব খুব বর্ণাঢ্য ও জনপ্রিয় এবং তুলনামূলকভাবে দীর্ঘস্থায়ী। চারদিন পাঁচদিন ধরে চলে এই উৎসব। এই

স্থায়ীত্বের জন্যও এই উৎসবটিকে অগ্রাসন দেওয়া যেতে পারে। আসল পূজা আসার আগে থেকেই প্যান্ডেল ও প্রতিমা নির্মাণ দিতেও মাসেব অধিক সময় কাটে। দোকানে দোকানে সমারোহ আরম্ভ হয়; নতুন কাপড় চোপড় কেনা হয়, কত কি।

যাঁরা আমাদের মতো বাণপ্রস্থী, সংসার যাদেবকে আর কর্মক্ষম মনে করে না, তাঁদের একটা মস্ত সুবিধা যে তাদের আর কোন কিছু করার জন্য ছুটির দরখাস্ত করে উৎকণ্ঠিত হয়ে সেই ছুটি মঞ্জুর করার অপেক্ষায় বসে থাকতে হয় না। তাদের কাজই নেই সুতরাং ছুটির আর প্রয়োজন কী? তারা নিশ্চিন্তপুরেব অধিবাসী। তাদের কাছে সব বারই রবিবার। তারা ক্যালেন্ডার দেখেন কেবল অন্যের জন্য। যাদের বাড়িতে যাওয়ার বাসনা তারা বাড়িতে থাকবেন তো? আর ক্যালেন্ডার দেখেন একাদশীর জন্য, তিনি কবে আসবেন সেটা জানার জন্য। নইলে যে কোন কাজই বাণপ্রস্থীরা অনায়াসে নিরুদ্বেগে কবে ফেলতে পারেন। তাই ছেলে যখন মার্চ মাসে ফোনে বললো তাব কাছে গিয়ে কিছুদিন থাকতে, তখন আর বিশেষ কিছু অজুহাত ছিল না সামনে তাকে 'না' বলার। নিজে তো কাজের অনুপযুক্ত বা সুপারএনুয়েটেড হয়ে গেছি তিন বছব পাব হযে গেল। ছেলেব মায়েরও পতির গতি সম্প্রতি হয়ে গিয়ে তিনিও প্রতিবারই রবিবার হয়ে যাওযাব স্বাদ চেটে পুটে নিচ্ছেন। তবে ছেলেব আদরের আহ্বানে কী বলে 'এখন কেমন করে আসবো' বলি। একটা অজুহাত মনে পড়লো। গত বছর মাত্র আমেবিকা গিয়ে এসেছি। আসাব পথে লন্ডন ও আরও ক'টা জায়গা দেখে এসেছি। আবার, বছব এখনো পুবে নি, এখনই ইংল্যান্ড যাওযা? না, এখনই না। ক'টা মাস তো যাক। কিন্তু নিজেই বুঝি অজুহাত দুর্বল। এটা দিয়ে দু'মাসও কাটানো গেল না। মে (২০০৩) মাসেই রাজী হয়ে গেলাম যাব ছেলেব কাছে, ইংল্যান্ডে। কথা মতো কাজ। ট্রাভেল এজেন্ট, ভিসা, যাওয়ার উড়ানের টিকিট, সব হয়ে গেল। ফিববেন কবে? উত্তর ঠিকমত দেওয়ার আগেই একটা তারিখ ওরাই বসিয়ে দিল—যাত্রার ঠিক তিন মাস পবেব দিনটা।

ছেলের কাছে থাকার আনন্দেব তুলনা নেই। নিজেদের গাড়িতে বসে বেড়াবারও তুলনা নেই। তাছাড়া আমাদের ছেলেরও তুলনা নেই। বাবা মাকে নিয়ে এমনভাবে নেচে বেডানো ও অন্য কেউ করে বলে আমাদেব মনে হয় না। এন্তার ঘুবে বেড়াই। ২০০২-এ আমেবিকায় গিয়েও এমনই করেছি। ২০০৩-এ ইংল্যান্ড-এ এসেও তাই করেছি। কেবল ইংল্যান্ড নয়, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ডও ঘুরে এসেছি। ছুটির চিন্তা নেই, তবু খালি বাড়িটাব জন্য, আমাব ছোট গ্রাম সমান রাজধানী শহরটার জন্য, চেনা মুখগুলিব জন্য, 'কেমন আছেন' কথাদুটি শোনার জন্য। ভাই সংকেতের জন্য মন কেমন করে। দু'মাস যেতে না যেতেই ফোন কবলেই, কবিতা, মণিলাল, সংকেত, মিতা, শিখা, সোমা, চুমকি, প্রথম কথা 'কেমন আছ' না বসে 'কবে আসছ' বলে। মুদিতা লন্ডনে গিয়ে ভাই চিন্টুকে রাখী বাঁধে আর আমাদের গীতাভবন, অগ্নিবাবু, মণি-জবা, দীপক, পীযুষদা, চিত্তদা, মনোরঞ্জন বাবু, রতিরঞ্জন, প্রদীপ বিকাশ বাবুদের কথা মনে পড়ে। মাঝে মাঝেই প্যারিস, এঙ্গেল বুর্গ, জেনেভা, ক্যান্টারবেবীর তলায় এরা তলিয়ে যান, আবার সবার উপরে এরা ভেসে উঠেন। দিন সপ্তাহ মাস যায়। ভাই সংকেত ডাকে 'চলে এসো'। বলে সে দার্জিলিং যাবে।

ছেলের বাড়িতে মুম্বাই, ওয়াশিংটন, ইংল্যান্ড ক'বারই এসে থাকলাম। সে নিজেই এত

এত জায়গায় নিয়ে যায়, দু'সপ্তাহ আগেই বলে কবে কোথায় যাওয়ার পরিকল্পনা তার, যে আমি আর অমুক বা তমুক জায়গার বাসনা প্রকাশ করার ফুরসৎ পাই না। তবে সে বাসনা প্রকাশ করার প্রয়োজনও সে রাখে না। তার বাসনা তৃপ্তি করেই আমরা তৃপ্তের চেয়েও বেশি। নিজের আর কি থাকবে? সেই কবে নিয়ে গিয়েছিল বাকিংহামশায়ারে বামকৃষ্ণ বেদান্ত সেন্টারে, বলে দিয়েছিলেন স্বামী দযাত্মানন্দজী মহাবাজ চৌঠা অক্টোবর দুর্গাপূজা হবে ওখানে, সেখানে যেতে। ছেলে গত বছর থাকতো মিল্টন কেইনস্‌-এ ওখানে দুর্গাপূজা হয়। ওখানকার পিয়ালী ও সর্বেন্দু চিঠি পাঠিয়েছে দুর্গাপূজার। শুভদীপ কাগজ দিয়েছে লন্ডনের পাঁচখানা দুর্গাপূজার ঠিকানা দিয়ে। এক তাবিখ থেকে পাঁচ তারিখ পূজা এবার। কিন্তু এখানে তো আর পুজার জন্য ছুটি থাকে না। আমাদের কোথাও গেলে যেতে হবে চার তারিখেই। সেদিন শনিবার। পরদিন রবিবার আছে বটে, কিন্তু সেদিন তো পূজা থাকবে না, থাকবে কেবল বিসর্জন। ছেলে কেবল ওজন করে যাচ্ছে কোন পথে গেলে বাবা মাকে বেশি সংখ্যায় পুজা দেখানো হবে। বাকিংহামশায়ার বাতিল। ১১২ মাইল দূরে ওখানে গেলে আর কোথাও যাওয়া যাবে না। মিল্টন কেইন্‌সে গেলে পরিচিত জনদের সঙ্গে দেখা হবে। তবে লন্ডনে পূজা বেশ ক'খানা। আগে লন্ডনে গিয়ে পূজা দেখে সন্ধ্যায় মিল্টন কেইনসও সেখান থেকে বাড়ী ইপ্সউইচে আসা যায় রাত বেশিই হয়ে যাবে। তবু সেদিন তো প্রসাদ পাওয়া হবে। রাতে রান্না খাওয়ার ঝামেলা থাকবে না। পরদিন রবিবার। অফিস নেই। তার সরল চিন্তন শেষ হলে ছেলে আমাব দিকে তাকায় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে, আমার অ্যাপ্রুভাল চায় যেন। আমাদের আবার মতামত কি? যে-কোন দিকে গেলেই হল। আমাদের তো শতকরা একশো ভাগই লাভ। শুধু জিজ্ঞাসা করি, 'ধুতি-পাঞ্জাবীটা পরে নেব?' সে বলে, 'এনেছ? ভালইতো? পরো। কিন্তু তোমার ঠান্ডা লাগবে। দেখেছ তো? পাঁচ ডিগ্রি। তোমাদের পক্ষে বেশ ঠান্ডা না?' বললাম না কিছু। আমাব শীতের সব ব্যবস্থা আছে। আসাব সময় কবিতা সব দেখে টেকে দিয়েছে। কলকাতায় সঞ্জীব আবার চেক আপ কবেছে। শীতে কষ্ট হওয়াব কথা নয়।

দেখতে দেখতেই তেসরা অক্টোবর ২০০৩ শুক্রবার চলে গেল। কাল শনিবার উইক এন্ড। দুর্গাপূজাব নবমী দিন। দুর্গাপূজা দেখতে যাব লন্ডনে। সকালে উঠে অন্যদিনের মতই সব। আমি ডায়াবেটিক বলে আমার অধিক খাওয়া বা একেবারে না খাওয়া, অধিক ঘুমানো বা অধিক জাগবণ সমস্তই ডাক্তাবেব বারণ। আমাব ডাক্তার নরেন্দ্র গণচৌধুরী এবং শঙ্কর রায়দের মতোই সকল ডাক্তারের ডাক্তার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাঁচ হাজার বছর আগে বলে গেছেন—

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি নচৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতি স্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন ॥

এও উপযুক্ত পাবমাণ ভোজন ও নিদ্রার নির্দেশ। একেবারে ছোটবেলা থেকেই খাওয়া ও উপবাসেব ব্যাপারে আমার অনাধিক্যের অভ্যাস চলছে। আমার অধিক বয়সে অন্ধ হয়ে যাওয়া ঠাকুবমা আমার পড়াশোনা ছাড়া অন্য সব ব্যাপাবেই অধিক কিছু করার বিষয়ে সতর্ক থাকতেন ও আমাব মাকে সতর্ক রাখতেন। কিছুক্ষণ পর পর আমাকে তিনি ডেকে কাছে নিতেন এবং আমার ছোট বুকটাতে হাত দিয়ে বা কখনো কান দিয়ে দেখতেন আমি অধিক দৌড়াদৌড়ি করে হাঁপাচ্ছি কিনা। পাড়াগাঁয়ের হিন্দু পরিবারে পালা পার্বণ ব্রত পূজা লেগেই

থাকতো, আর এসবের প্রধান আনুষঙ্গিক ছিল বাড়ির সধবা মহিলাদের উপবাসে থেকে পূজার ব্যবস্থাদি করা। আমি প্রতি ব্রত উপবাসেই উপবাসী থাকার বায়না ধরতাম। আর ঠাকুরমা এই ব্যাপারে আমার মায়ের সঙ্গে একটা দীর্ঘস্থায়ী ষড়যন্ত্র করে রেখেছিলেন। মা ও ঠাকুরমা কোন ব্রতের দিন সকাল বেলায় উপোস করার শুভ সংকল্পের ঘোষণাকে অফিসিয়েলি স্বীকৃতি দিতেন না। কিছুই বলতেন না। বোধহয় মুচকি হাসতেন। তবে সেটা আমি দেখেছি বলতে পারি না। আমি ঘন ঘন আমার সংকল্প সজোরে ঘোষণা করতাম। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘোষণার ঘনত্ব কমতে থাকতো। আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ মা আমাকে খাবার দিতেন, আমিও অভ্যাস মত প্রথম গ্রাসটি মুখে দিতাম। কিন্তু গ্রাসটি মুখে দিয়েই হা হয়ে থাকতাম, আমার মুখ বন্ধ হতো না। মনে পড়ে যেতো আমার উপোস করার প্রতিজ্ঞা আছে। মা ঠাকুরমা আমার বারম্বার উপোস করার প্রতিজ্ঞা ও তা ভুলে গিয়ে সময় মত খাবার খেয়ে নেয়ার কথা সরস কাহিনী হিসেবে পরিচিতদেরকে বলতেন ও আমোদ কবতেন। আমি লজ্জিত হবার চেষ্টা করতাম। মা-ঠাকুরমা বিশ্বাসই করতেন না যে, যে বালক প্রতিদিন সাড়ে ছ'টায় প্রাতবাশ পায় সে সাড়ে আটটায় খাবার সামনে পেলে সহজেই তার উপবাসেব প্রতিজ্ঞা ভুলে গিয়ে খাবাব মুখে দিয়ে ফেলে। এর মধ্যে কোন ভণ্ডামি থাকে না। সত্যি বলতে কি ভণ্ডামি করতে গেলে যে বুদ্ধি লাগে সেই বুদ্ধি আমাব তখনো হয়নি—বুঝি কোনদিনই হয়নি। সংসারে সকলেই জানে আমাকে ঠকানো খুব সহজ।

সুতরাং, চৌঠা অক্টোবর ও সময় মত চা এবং তাবপরের দুধ-কর্নফ্লেক্সের প্রাতবাশ খেয়ে নিলাম। কিন্তু প্রসূন মুদিতা কিছু খেলো না। রওযানা দেওয়া গেল লন্ডনেব পথে দুর্গা দর্শনের বাসনা নিয়ে। এই পথ দিয়ে, অর্থাৎ ইপ্সউইচ থেকে চেমসফোর্ড হয়ে লন্ডন, বেশ ক'দিন যাতায়াত হলো। পথ আমাদেবও চেনা হয়ে গেছে। তবু দেখতে ভাল লাগে। সবচেযে বেশী আকর্ষণীয় বিযয হলো বাস্তাব পবিচ্ছন্নতা ও মসৃণতা; কোথাও আবর্জনা নেই, কোথাও খানাখন্দ নেই। অন্য আবেকটা ব্যাপাবও প্রথম প্রথম আমাদেরকে খুব বিস্মিত করতো, ইদানীং বিষয়টাতে এতই অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে আর বিস্মিত হই না। সেটা হলো শব্দহীনতা। গবম থাকলে, জানালার কাচ নামিযে দিলে চড় চড় একটা শব্দ শোনা যায়, এটা পীচের বাস্তাব সঙ্গে বাবারেব টায়ারের ঘর্ষণের শব্দ। ঠাণ্ডা থাকলে, জানালা বন্ধ থাকে, তখন ঐ শব্দও শোনা যায না। আর কোনো শব্দ নেই। ক্বচিৎ অ্যামবুলেন্সের সাইরেন শোনা যায। রাস্তায হাজার হাজার কত রকমের গাড়ি সারিবদ্ধ হয়ে চলছে, ট্রাফিকের লাল আলো দেখলে কিলোমিটার দীর্ঘ গাড়ীর সারি দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, কিন্তু শব্দ নেই। কেউ হর্ন বাজাচ্ছে না, কেউ অধৈর্য হচ্ছে না, সবাই শব্দ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকছে। গাড়ীতে বসে থেকে আমাব কেবল মুম্বই, কলকাতা, চেন্নাই, আগবতলার কথা মনে পড়ে। আমাদের কৃষ্ণায়ণে তো আবো ভাল। দোতলায় তিন তলায় কাউকে ডাকতে হলে কোনো কোনো গাড়িওয়ালা কষ্ট করে উপরে উঠে গিয়ে ডোরবেল বাজায় না, নীচে গাড়িতে বসে তীব্র স্বরে হর্ণ বাজিয়ে বন্ধুকে ডাকে। এতে অন্যদের অসুবিধা হচ্ছে কিনা, সেকথাও যদি ভাবতে হয় তবে গাড়ি কিনে কি লাভ?

দিনটা ভাল। কিন্তু আকাশে মেঘ, যে-কোন সময় সেই মেঘ গলতে পাবে। বৃষ্টি হলে আমাদের অসুবিধা হবে। দেখা যাক, আজ পর্যন্ত বৃষ্টির দেবতা দেবরাজ ইন্দ্র আমাদেব প্রতি

বিশেষ করুণা দেখাচ্ছেন। কোনদিন বৃষ্টি বর্ষে আমাদের ভ্রমণানন্দে ব্যাঘাত ঘটান নি। আজ কী আর তিনি আমাদের দুর্গা প্রণামে ঈর্ষা দেখাবেন? ভাবতে ভাবতে বার্কিং রোড হয়ে বিশপস্ এভিনিউ দিয়ে গাড়ি চলার সময় হঠাৎ পরিবেশ বদলে গেল। কলকাতার চিৎপুর রোড বা পুরানো দিল্লীর কোন রাস্তা দিয়ে যেন গাড়ি চলছে মনে হলো। রাস্তায় ভীড়। সাদা মানুষ একেবারেই নেই। মানুষগুলি যেন কোন যাদুবলে দিল্লী কলকাতা বা সিলেটের মানুষ হয়ে গেছে, কেবল গায়ের চামড়ার রঙ বা মুখের দাড়ি গোঁফ নয়, পোশাকও তেমন হয়ে গেছে। পুরুষের পাজামা মাটি থেকে সাত ইঞ্চি উপরে উঠে গেছে, পাঞ্জাবী হাটু ঢেকে ফেলছে; মেয়েদের মাথায় হিজাব উঠেছে, সালোয়ার কামিজ বর্ণজলুষ হীন হয়ে গেছে। দোকানের নাম ইংরেজির সঙ্গে আরবী-ফারসি বাংলা লিপিতেও দেখা যাচ্ছে। শাড়ির দোকান, আগরবাতি দেখা যাচ্ছে, গাড়ি ইঞ্চি ইঞ্চি করে চলছে।

অবশেষে আপটন সেন্টার দেখা গেল। এখানেই বেঙ্গলি কালচারাল এসোসিয়েশান এর দুর্গাপূজা। এসোসিয়েশানের রেজিস্টার্ড অফিস অবশ্য ১০৬, হলডেন রোড, লন্ডন, E6, 3JN, তবে সেখানে পূজা হওয়ার মত বড় জাযগা নেই। ওরা একটা জায়গা ভাড়া নিয়ে পূজা করেন। উনত্রিশ বছর ধরে পূজা করছেন ওরা। এবার এই ছোট টাউন হলটা নিয়েছেন তাঁরা। মূর্তি এনেছেন পশ্চিম বাংলা থেকে। চারদিন ধরেই পূজা। এই বেঙ্গলি কালচারাল এসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারির নাম শ্রীমতী গৌরী ব্যানার্জী, সহকারী-শ্রীমতী কৃষ্ণা বাগচী; এক্সিকিউটিভ কমিটিতে অন্যদের মধ্যে আছেন শ্রীমতী শীলা নন্দী, শ্রী নিখিল চক্রবর্তী, শ্রী চঞ্চল সমাদ্দার, শ্রীমতী চিত্রা দাসগুপ্তা ও শ্রীমতী আলপনা প্যাটেল। গৌরী, কৃষ্ণা, শীলা, নিখিল, চঞ্চল, চিত্রা ও আলপনা আমার প্রাক্তন সহকর্মীদের নাম। নামগুলি দেখে মুখগুলি যেন দেখতে পেলাম। কথা বলছিলাম পূজার উদ্যোক্তাদের সঙ্গে। হঠাৎ নীচে ছোট দুটো হাত আমার উরু জড়িয়ে ধরেছে। ওমা! বৃষ্টি ও তার বাবা মা প্রতীক ও মালবিকা বসু। সুইজারল্যান্ড ভ্রমণে এরা আমাদের সহযাত্রী ছিলেন। আদর করলাম বৃষ্টিকে। দেখালাম প্রসূন মুদিতাকে। ওদের কাছে বৃষ্টির কথা অনেক বলেছি। উদ্যোক্তাগণ বললেন, 'দেড়টায় পূজা, পরে অঞ্জলি ও খিচুড়ী প্রসাদ পয়ে আনন্দ করবেন, রাতের ভোগ প্রসাদ নিয়ে তবে যাবেন। বাড়িতে গিয়ে কেবল শুয়ে পড়া। ছেলে বলে, 'বাবা মা দেশে থাকে, অনেক পূজা দেখে। এখানে পূজা দেখাতে নিয়ে এসেছি। দুপুরের পাট শেষ হলে বেরুবো, অন্য দু'এক জায়গায় পূজা দেখাবো, সম্ভব হলে রাতে আবার আসবো। ওঁরা সানন্দে বললেন, ঠিকই তো। সম্ভব হলে আসবেন।' আমাদেরকে বললেন, 'আগামী পূজায় আমাদের নিমন্ত্রণ রইলো। ইংলান্ডে থাকলে আসবেন।' মৃদু হেসে, বিনীত সম্মতি জানালাম। জুতো ছেড়ে ভিতরে গিয়ে প্রতিমার সামনে প্রণত হ'লাম। চেয়ারে গিয়ে বসলাম। এখনো তেমন ভক্তসমাগম হয় নি।

বৃষ্টিরা পেছনের সারিতে বসেছে। বৃষ্টি ক্ষণে ক্ষণে উঠে এসে একবার আমাকে একবার বেলাকে জড়িয়ে ধরছে। দু'মিনিট এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকা বৃষ্টির কোষ্ঠীতে লেখেন নি বিধাতা। ধীরে ধীরে লোক জন আসছেন। আমার পাশে যে দুজন বসলেন তাদের সঙ্গে একটি কন্যা আছে। বৃষ্টিরই বয়সী, নাম নেহা। বৃষ্টির সঙ্গে নেহার ভাব হতে নেহাৎই দু'মিনিট লাগলো। শুরু হয়ে গেল দাপাদাপি, দৌড়াদৌড়ি আর খিলখিল কলকল হাসি। লোকজন

আসছেন, হলটি ভরে গেছে। বেলার পাশে একজন বয়স্কা পৃথুলতনু মহিলা এসে বসলেন। পনেরো সেকেন্ড পরেই দুজন কথাবার্তা শুরু করে দিলেন। সামনে চাদর পাতা এলাকা ভরে গেছে। এবার কারুকার্য করা মসৃণ মোম ঘষা মেঝেতেই লোক বসা আরম্ভ হয়েছে। আমাদের পায়ের কাছে বসলেন এক শ্বেতাঙ্গিনী। মাথায় কদমফুল বয়কাট চুল, গায়ে হলুদ কালো কামিজ, গলায় ওড়না, কব্জিতে শাঁখা। দেশেও আধুনিকা বঙ্গললনা এই দাসীত্ব ও অসভ্যতার প্রতীক শাঁখা বর্জন করছেন। এখানে এর হাতে শাঁখা দেখে বেলা পার্শ্ববর্তিনী সীমন্তনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি হেসে বলেন—ওমা, এটিতো আমার ছেলের বৌ। দূরে বসা ছেলেকেও দেখান। বৌমার পাশে বসা দুটি মেয়ে ওর নাতনী। তিনির চার ছেলে দুই মেয়ে। সবাই বিবাহিত। পাঁচ জন লন্ডনের বিভিন্ন জায়গায় ও এক মেয়ে ইউ এস এ-তে থাকে।

পূজা আরম্ভ হলো। পুরোহিত মশায় আসন পিঁড়ি হয়ে বসেন নি। নত জানু হয়ে বসেছেন। তবে ধুতি পরেছেন। এই হল ঘরে তিনি ও আমি এই দুজনেই ধুতি পরা। বাকি সকলেই আন্তর্জাতিক প্যান্ট (ট্রাউজার্স) ও কোট/সোয়েটার/জ্যাকেট পরেছেন। তিন জন পাঞ্জাবী ও চাদর এনেছেন। ধুতি আমরা দুজন। 'পুরোহিত দর্পণ' সামনে খুলে রেখে উদাত্ত কণ্ঠে মন্ত্র পড়ে পূজা করছেন তিনি। তবে ধ্যান মন্ত্রে 'অর্দ্ধেন্দু কৃত শেখরাং' কথা তিনটি বাদ পড়েই গেল। টেপ রেকর্ডারে ঢাক ও অন্যান্য বাদ্য বাজনা বাজছে। বৃষ্টির নাচানাচি বন্ধ। প্রথমত নেহা নাচতে চাইছে না। দ্বিতীয়ত ভীড় এত হয়েছে যে নাচা চলে না। তাই বৃষ্টি এখানে থাকতে চাইছে না। অনেক বোঝাবার চেষ্টা করে পরাস্ত হয়ে প্রতীক মালবিকা চলে গেল। বেচারা। আমরা বসে বসে পূজা দেখছি ও শুনছি। খুব ভাল লাগছে। আড়াইটা বেজে গেল। মনটা খচ খচ করছে। ছেলেটা বৌটা কিছু খায় নি। আমার আবার ক্ষুধা লেগে গেছে। যাক পূজা শেষ হল। প্রথম ব্যাচের অঞ্জলি হয়ে গল। আমরা দ্বিতীয় ব্যাচে অঞ্জলি দিলাম। থালায় থালায় প্রসাদ আসছে, সবাই নিচ্ছি—রসগোল্লার মত দেখতে দুধ সাদা নারকেলের নাড়ু, কলকন্দ, বড় বড় সাদা ও হলুদ গোলাকৃতি মিষ্টি, চাল কলার মাখা নৈবদ্য, টুকরা করা আম, তরমুজের মাসতুত ভাই, ইত্যাদি। প্রসাদ নিতে নিতে খেতে খেতে কিউ বন্দী হয়ে পড়লাম। অতি ধীরে এগুচ্ছে কিউ। কিসের কিউ না জেনেই এগুচ্ছিলাম। শুনে ভাল লাগলো এটি খিচুড়ীর সন্ধানে যাচ্ছে।

তিন ভাগ করা থার্মকলের থালা, প্লাস্টিকের চামচ ও টিসু হাতে পাওয়া গেল। একভাগ খিচুড়ী, এক ভাগে লাবড়া নামধেয় মিক্সট ভেজিটেবল্ কারি ও তৃতীয় ভাগে আমের চাটনী ও তার উপরে পানতুয়া নিয়ে সবে পড়া গেল। ভোজন-রতদের ভীড়ে দাঁড়িয়ে ভোজন শুরু। এদিকে ওদিকে কেউ কেউ চেয়ারে বসেও খাচ্ছেন। অদূরে চেয়ারে বসা এক তরুণ চেয়ার ছেড়ে উঠে আমাকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। মৃদু আপত্তি জানিয়ে বসে খেলাম। ছেলেকে বললাম পানতোয়াটি তুলে নিতে। সে নেবেনা। মুদিতাও নেবে না। বেলাকে আর না বলে তার প্লেটেই তুলে দিলাম। প্রসাদ শেষ করে আবার প্রতিমার সামনে। একটি ফটো নিয়ে বাইরে আসা গেল। ভীষণ ঠাণ্ডা। এর মধ্যে বৃষ্টি হয়ে গেছে। বসো গাড়িতে, চলো অন্য কোনখানে।

আধ ঘণ্টা পরে এলাম অন্য জায়গায়। এটি মাইল এন্ড ; ৩৩, রোল্ডা গ্রোভএ হিন্দু

প্রগতি সঙ্ঘের পূজা। বেশ ছোটই এই হিন্দু প্রগতি সংঘ মন্দির। প্রণাম করে দাঁড়াতেই একটি মেয়ে হাতে প্রসাদের থালা ধরিয়ে দেয়—একটি লুচি, একটু সুজি, ক'টি সেদ্ধ কালো ছোলা। প্রসুন হাত তুলে দেয়ালের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেখানে একটি শ্বেত প্রস্তর খণ্ড লাগানো আছে। তাতে কালো বাংলা অক্ষরে খোদাই করে লেখা আছে—

পরম পূজনীয় পিতা
ঁপ্রভাস চন্দ্র ধরএর
স্মৃতি অমর হউক।
সৌজন্যে— শ্রী আর কে ধর (পুত্র)
শ্রী সুভাস ধর (,,)
শ্রী হরিপদ ধর (,,)
ঠিকানা— গ্রাম-বামসিদ্
পোঃ-শাকবা
থানা বিয়ানী বাজার
জিলা-সিলেট বাংলাদেশ।

অনন্য অভিজ্ঞতা। ক'জন লোক আছে পৃথিবীতে যিনি নিজের নামের এমন অমর হওয়ার ঘোষণা নিজের চোখে দেখতে পেয়েছেন? অমর হওয়ার ইচ্ছা যে কত বড় নির্বুদ্ধিতা তাও বোঝা গেল। সন তারিখ কিছু এখানে না থাকলেও বাংলাদেশ কথাটি থাকাতে বোঝা যায় যে এই অমর হওয়ার আকাঙ্ক্ষাটি বেশি প্রাচীন নয়। তবু ইতোমধ্যেই 'হউক' কথাটির মধ্যস্থ স্বরবর্ণটি অংশত মুছে গিয়ে ব্যঞ্জনবর্ণ হয়ে গেছে আর সম্পূর্ণ কথাটি 'অমর হড়ক' হয়ে গিয়ে সমস্ত আকাঙ্ক্ষাটিকে তো পরিহাস করছেই আমার দিকে তাকিয়ে ঠে ঠে করে হাসছে। মন্দিরটির পরিসর কম। সকলে ভিতরে আসতে পারছেন না। তাই এখানে দেরি করা ঠিক নয়। একটি ছবি নিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল। একজন ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে আসছেন। আমাদের দেখে দাঁড়ালেন। দু'টো সৌজন্যসূচক কথা বলে গেলেন। এখানকার পূজার কোন কর্মকর্তা হবেন মনে হয়। তিনি চলে গেলেন ভিতরে। আমরা রাস্তা পার হয়ে গাড়িতে গিয়ে বসলাম। আবার যাব অন্য জায়গার পূজায়। এবার কমার্শিয়াল স্ট্রিট, টয়েনবি হলে, তৃতীয় পূজায়। ভালই হচ্ছে এবার। একাধিক জায়গায় প্রতিমা দর্শন লণ্ডনে, কম কথা। কাল ফোন করলে ভাই সংকেত বলবে কত পূজা সে দেখেছে।

টয়েনবি হল, কমার্শিয়াল স্ট্রিট (ও) গোল্ডা গ্রেঞ্জ থেকে বেশি দূরে হওয়ার কথা নয়। গাড়ি থামে। পেছন থেকে আসছেন একটি পরিবার। স্বামী স্ত্রী ও দু'টি ছেলে মেয়ে। মহিলার শাড়ি আর শাঁখা বাঙালি হওয়ার ইনডেলিবল মার্ক। বেলা নেমে যান। জিজ্ঞাসা করেন কাছের পূজাটি কোথায় হচ্ছে জানেন কিনা। তিনি হাত তুলে দেখালেন। ডাইনা বাঁয়া বোঝালেন। তিনি ওদেরকে নিয়ে টাওয়ার ব্রীজ দেখিয়ে কিংস ক্রসে পুজা দেখাবেন। আমরা ত্রিপুরার জেনে বললেন যে, সে তো অনেক দূরে। বললেন যে তিনিও ত্রিপুরায় গিয়েছিলেন, ১৯৭১ সালে, আগরতলায়, দুর্গা বাড়িতে। একটি দীর্ঘশ্বাস শুনলাম বুঝি? ভদ্রলোক সামনের দিকে চললেন। আমাদের গাড়িও চললো। পৌঁছে গেলাম আমরা আরেকটি পূজাস্থানে। জয় মা দুর্গা, দুর্গতি নাশিনী।

টয়েনবি হলো ছোট্ট প্রতিমা। অনেক লোক। সন্ধ্যে হয়ে যাচ্ছে। তবু লাস্ট ব্যাচ এখনো বাকি অঞ্জলি দেয়ার। ডাকা হচ্ছে আরো কেউ বাকি থাকলে আসতে। আর অঞ্জলি হবে না। মন্ত্র পড়া আরম্ভ হয়ে গেল। ওদিকে আরেকটা বড় ঘর। প্রসাদ দেওয়া হচ্ছে। খিচুড়ী লাবড়া পায়েস, আমরা দাঁড়ালাম। একজন দিচ্ছেন। এক মহিলা এসে বললেন, 'ওখানে ফল প্রসাদ ছিল তো!' বলে চলে গেলেন। ঐখানে খিচুড়ী দিয়ে বললেন, 'পায়েস পরে আইয়া নিভা।' গিয়ে বসলাম থালা নিয়ে। সেই মহিলা ফল প্রসাদ নিয়ে আসলেন। ওরা ক্লান্ত। বড়ই ঠাণ্ডা। আন্তরিকতার কমতি নেই। একখানা ছোট সিলেট বসেছে এখানে। কেবল সিলেটি অ্যাকসেন্ট। থালা ফেলে হাটি। ওদিকে করিডোরে একটা টাঙানো ফটোগ্রাফ। ক'জন দেখছেন। একজন আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছেন, 'ঐ যে, ওটাই দত্ত সায়েবের মাইয়া। ওখানো পড়ুইন।'

চল। আবার গাড়ি। ছেলেকে বলি, 'আর লন্ডন নয়। যদি মিল্টন কেইনস্ যেতে হয় তবে ওখানে হয়ে বাড়ি চল।' ছেলে বলে, 'আরেকটা জায়গা' এরপর ভাববো।' চলি আবার। আমরা বিডবরা স্ট্রিটে, ক্যামডেন সেন্টারে পূজা স্থলে এলাম। এটিই কিংসক্রস আন্ডার গ্রাউন্ড স্টেশনের কাছে। এই পূজায়ই আসবেন বলেছিলেন পথ দেখানো অচেনা ভদ্রলোক, '৭১ সালের ভয়ঙ্কর দিনে যিনি আগরতলার দুর্গা বাড়িতে শরণ নিয়েছিলেন। মন্দির এক টাউন হল-ক্যামডেন সেন্টার। বিশাল প্রতিমা। জোড় হাতে প্রণাম জানাই। ছেলেকে একটুক্ষণ আগে বলছিলাম ফিরতে। আর দরকার নেই। সাড়ে দশটা থেকে চলছিতো চলছিই। প্রণাম জানাই আবার সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোস্তুতে। শরণাগতদীনার্ত পরিত্রাণ পরায়ণে। সর্বস্যার্তি হরে দেবি নারায়ণি নমোহস্তুতে।

সামনে এসে দাঁড়ায় শুভদীপ, প্রসূনের সহকর্মী। তাঁর স্ত্রী বলে, 'ক'টি পূজা দেখলেন? প্রসূন বলে, 'চারটি। মিল্টন কেইন্স্ এখনো হয় নি। হবে কিনা বুঝতে পারছি না। প্রসাদ এখানে আর নিলাম না। গাড়িতে গিয়ে ছেলে বলে, 'এখন একবার ওয়ালথামস্টো যেতে হবে। কাল চিন্টুর জন্মদিন।' গেলাম সেখানে। মুদিতা ওকে জন্মদিনের উপহার দিল। এবার বুঝলাম রহস্য। বাড়ি থেকে মুদিতা একটা ছোট্ট পলিথিনের প্যাকেট এনেছিল। গাড়িতে গুছিয়ে বসে সেটা খুঁজে পাচ্ছিল না। তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। রাস্তার শোল্ডারে গাড়ি থামিয়ে প্রসূন এসে খোঁজে, মুদিতার সীটের নীচ থেকে বেরোয় পলিপ্যাক। এখন বুঝি, ঐ প্যাকে মনীশের উপহার ছিল। উপহার দেওয়া হল। বেলা একটু টাকাই দিল।

সাড়ে সাতটা। আর মিল্টন কেইনস্ নয়। বলি, 'ওদেরকে একটু ফোন করে বলে দাও।' প্রসূন ফোনে পিয়ালীকে পেলো। বললো যে আমরা এখনো লন্ডনে। আজ আর হলো না। আমরা এবার ইপ্সউইচে ফিরে যাব। পথে জোর বৃষ্টি। 'হে দেবেন্দ্র! ধন্য তোমায়। তিন মাসে ক'দিনই বৃষ্টি হয়েছে ক্যান্টারবেরীতে, প্যারিসে, ডিজনিল্যান্ডে, এঙ্গেলবুর্গে, আজ দুর্গা পূজায়। কিন্তু আমাদের কোন কষ্ট দেয়নি বৃষ্টি। প্রণাম তোমায়। জয় মা দুর্গা। রাত সোয়া নটায় বাড়ি। জয় রামকৃষ্ণ।

লন্ডনে আরেকদিন

একজন মানুষ দীর্ঘ সৎ জীবন যাপন করে পরলোক গমন করেন। ঈশ্বরের দপ্তরে চিত্রগুপ্ত মশায় তার কম্পিউটারে তত্ত্ব ও তথ্য জেনে তাকে দীর্ঘকাল স্বর্গবাসের অনুমতি দেন। স্বর্গবাসে তার সঞ্চিত পুণ্য খরচ হয়ে গেলে পরে তার সম্বন্ধে অন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে ভবিষ্যতের অমুক তারিখে এই ফাইল তাঁর কাছে উপস্থাপিত করার আদেশ দিয়ে স্বাক্ষর করে দেন। মানুষটি ইহলোকের জীবনকালে এমন সৎ জীবন যাপন করেছেন যে সকলেই তাকে নির্বোধ ভাবতো। মানুষের চোখে জল দেখলেই তিনি গলে যেতেন এবং কেউ সাহায্য চাইলে তাকে কখনো ফেরাতেন না। কেউ ধার নিলে তাকে কখনো শোধ করার জন্য তাগাদা দিতেন না এবং বার বার ধার চাইলেও দিতেন। তিনি খুব দাতাও ছিলেন। না চাইলেও তিনি ধর্মস্থানে ও মানব হিতকর প্রতিষ্ঠানে দান করতেন। তাঁর দান সর্বদাই গোপনে দিতেন পত্রপত্রিকায় তার এইসব কাজের কথা কখনো মুদ্রিত হত না। গৃহেও তিনি সদা সাহায্যকারী ছিলেন। যতক্ষণ বাড়িতে থাকতেন ঘরের এটা ওটা সেটা কাজে সর্বদা ব্যপৃত থাকতেন। এমনকি বাড়িতে কোন অতিথি অভ্যাগত এলে তাঁদের পরিচর্যার ব্যবস্থাও তিনিই করতেন। তার গৃহিনি মনে মনে অত্যন্ত প্রীত থাকলেও প্রকাশ্যে সর্বদাই স্বামীর সকল কাজেই এগিয়ে আসার জন্য তাকে সস্নেহ তিরস্কার করতেন এবং সর্বদাই সপ্রেম দৃষ্টিতে তার দিকে দৃষ্টিপাত করতেন। পূজা, খেলা ইত্যাদি উপলক্ষে বালকেরা, বালিকারা, যুবক-যুবতীরা বা ভদ্রমহোদয়গণ তার কাছে আসতেন কিন্তু চাঁদার অঙ্ক কখনো বলতেন না। তাঁরা জানতেন যে মানুষটি নিজেই যা দেন তাতেই 'তারা আনন্দিত ও বিব্রত বোধ করেন। সেই মানুষটির জন্য যে স্বর্গে থাকার ব্যবস্থা হবে তা তো বলাই বাহুল্য।

একবার স্বর্গ ও নরকবাসীদের একস্‌চেঞ্জ প্রোগ্রামে একদল স্বর্গবাসী নরকে বেড়াতে গেলেন। ঐ দলে আমাদের মানুষটিও ছিলেন। তিনি সেখানে পান ভোজন নৃত্য ইত্যাদিতে এমন আনন্দ উপভোগ করলেন যে স্বর্গে ফিরে এসেও সেসব কথা ভুলতে পারছিলেন না। অনেক ভেবে চিন্তে দরখাস্ত করলেন যে তিনি নরকেই বাস করতে চান। দরখাস্ত পেয়ে তো স্বর্গের অধীক্ষকদের চক্ষুস্থির। মানুষটার মাথা ঠিক আছে তো? (আসলে স্বর্গ নরকে যাঁরা বাস করেন তাঁরা মানুষও নন আর অশরীরী বলে তাদের মাথাও নেই। কিন্তু আমি যখন মানুষী ভাষায় এই গল্প লিখছি তখন এসব না লিখে তো মনের কথা প্রকাশ করতে পারিনা। তাই এভাবেই লিখছি।) স্বর্গে এসে কেউ নরকে যেতে চায়? কিন্তু স্বর্গে তো আর মাথা পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই। এখানে মাথা নেই, মস্তিষ্ক নেই, সুতরাং নিউরোলজিস্টও নেই। তবু স্বর্গের কর্মকর্তাগণ মায় প্রধান অধীক্ষক চিত্রগুপ্ত এই নির্বোধকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন এই পাগলামী ছাড়তে। (সবিনয়ে বলি, পরলোকে, তা স্বর্গই হোক আর নরকই হোক, পাগল নেই। পাগলামী তো মস্তিষ্কের রোগ, আর মস্তিষ্ক তো শরীরের অংশ।) কিন্তু ওরা নরকের যত মন্দ চিত্রই আঁকুন মানুষটি তা বিশ্বাসই করলেন না। তিনি নিজের চোখে (আবার সমস্যা, চোখ কোথায় বিদেহীর? কিন্তু আমাকে বুঝাতে হবে তো বিষয়টা! পাঠক নিজগুণে আমার

ভাষার অক্ষমতা ক্ষমা করবেন।) সেখানকার সব ব্যবস্থা দেখে এসেছেন। বিপরীত কথা বিশ্বাস করেন কি করে? তিনি নাছোড় বান্দা। এবার কর্মকর্তাগণ পড়লেন বিপদে। যিনি মর্ত্যে সৎ জীবন যাপন করে এসেছেন তাঁর জন্য স্বর্গ আর যে অসৎ জীবন যাপন করেছে তার জন্য নরক বাসের ব্যবস্থা অলঙ্ঘনীয়। পরলোকে আসা মানুষটির ইচ্ছা অনিচ্ছার জন্য কোনও আলাদা প্রভিশান সেই সংবিধানে নেই। অনেক ভেবে চিন্তে চিত্রগুপ্ত মশায় নির্বোধ মানুষটির জন্য এক মাসের ছুটি কাটাবার অনুমতি দিলেন ইচ্ছামত স্থানে। আর ইচ্ছামত স্থানটি তো আমাদের জানা।

নির্বোধ গেলেন নরকে। পৌছানো মাত্রই তাকে একটি ঝুড়ি ও একটি কোদাল দেওয়া হলো মাটি কাটতে হবে বলে। মানুষটির অবাক ও জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেখে সেই নারকী কর্মচারী সবিনয়ে জানালেন যে মানুষটির সব কথা তিনি জানেন্। কিন্তু মাটি কাটার চাইতে সহজ কোন কাজ নরকে আর নেই। মানুষটি বললেন যে তিনি এখানে এসে ক্লাব, ক্যাবারে, পান, ভোজন ইত্যাদি বিলাসের বহুল ব্যবস্থা দেখে গেছেন। এখন কেবল ঐ মাটি কাটা কেন! নারকী জানালেন যে সে সব কেবল বিদেশী (অর্থাৎ স্বর্গবাসী) পর্যটকদের জন্য, স্বদেশী (অর্থাৎ নরকবাসী)-দের জন্য এখানে কেবল মর্ত্যলোকে কৃত কর্মের অনুযায়ী শ্রমসাধ্য কর্ম করার ব্যবস্থা আছে। এখানে কোন আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা নেই। ব্যাপারটা অনেকটা মর্তলোকের কারাগারের মত। কারাগারে বন্দীরা কেবল শ্রমসাধ্য কাজ করে অপরাধের প্রায়শ্চিত করে। বাইরের গণ্যমান্যরা এলে যে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়, মিষ্টান্নের ব্যবস্থা হয়, তা কেবল তাদের জন্য, বন্দীদের জন্য নয়। একথা সত্য যে নির্বোধ নরকে এসে শ্রমসাধ্য কাজ করে শাস্তি ভোগ করার মত কোন কাজ মর্ত্যে করে আসেন নি। তাই তাকে নরকের সবচেয়ে সহজ কাজ মাটি কাটাই দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া নরকের অধীক্ষক সর্বত্রাস নিয়মরাজ আদেশ দিয়েছেন যে নির্বোধের কাজের কোন ওভারসিয়ার থাকবে না, কম কাজ করলেও কেউ তাকে তর্জন করবে না এবং নিয়মিত তাকে নরকবাসীদের খাদ্য রুটি লবণ ও জল দেয়া হবে।

সব শুনে তো নির্বোধের আত্মারাম খাঁচা ছাড়া (অবশ্যই ওখানে আত্মারা মুক্ত, দেহ খাঁচা তো তারা সংসারে ত্যাগ করেই যান)। তাঁর সর্বদাই কম কথা বলার অভ্যাস। এতক্ষণে সে বুঝতে পারলো সে কি কাণ্ডই করেছে। আর কিছু বলে তো লাভ নেই। সে ঝুড়ি কোদাল নিয়ে মাটি কাটায় লেগে গেল। আশাকরি সকলেই বুঝতে পারছেন যে মানুষটি এতই সৎ (এবং সৎ বলেই নির্বোধ অভিধা প্রাপ্ত) যে নরকে তার কাজ দেখার জন্য কোন ওভারসীয়ার না থাকলেও সে কাজে ফাঁকি দেয়নি। যত দিন ছিল সে এত মাটি কেটেছে যে আগের সমস্ত রেকর্ড ম্লান হয়ে গেছে। কালক্রমে স্বর্গের দেওয়া ছুটির সময় শেষ হয়েছে ও সে স্বর্গে ফিরে গেছে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা তথাকথিত বোদ্ধারাও নির্বোধের মতই কাজ করে থাকি বলে আসল বিষয়ে যাওয়ার আগে এই ক্লাসিক নির্বোধের গল্পের অবতারণা। এই অধীনের গল্প যাঁরা শোনেন বা তার লেখা যাঁরা পড়েন তাদের তো অভ্যাসই হয়ে গেছে শিরোনামের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিষয়ের কথা শুনতে বা পড়তে। 'লন্ডনে আরেক দিন' শিরোনাম দেখে যাঁরা এই লেখা পড়তে আরম্ভ করেছিলেন এবং এতক্ষণ আমার পরলোকগত মানুষ নির্বোধের ইহলোক ও পরলোকে নির্বুদ্ধিতার কথা পড়েছেন এবং লন্ডনের নাম গন্ধও পাননি কিন্তু পড়েছেন তবু, তাদেরকে

অসংখ্য ধন্যবাদ। যাঁরা কোনার্ক বা খাজুরাহোতে মন্দিরে যান তাদের ক'জন বিগ্রহের খোঁজ করেন, বা বিগ্রহের সামনে গিয়ে শির নত করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন? প্রয়োজন কি? মন্দির গাত্রে erotica ভাস্কর্যের যে বিপুল সমারোহ সেসব দেখেই আশ মেটে না, চুলোয় যাক বিগ্রহ! লন্ডনের কথা যা শুনবেন তার চেয়ে আমার নির্বোধ মশায়ের কাহিনী খারাপ কি?

গতকাল ছিল সাতাশে সেপ্টেম্বর, ২০০৩। আমরা ইপ্সউইচ থেকে কালও লন্ডনে গিয়েছিলাম। রওয়ানা হতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কালকের সাইট সীয়িং একটু টপ্সি টার্ভি হয়ে গেল। সেই কথা আরম্ভ করতে গিয়েই কত কথা হয়ে গেল। প্রথমে গিয়ে পৌঁছলাম একটি মন্দিরে। লন্ডনের নিজডেন (NEASDEN) অঞ্চলে বিখ্যাত স্বামী নারায়ণ মন্দির। এই সেই স্বামী নারায়ণ মন্দির, যাদের প্রধান মন্দির অক্ষরধাম, ভারতে আমেদাবাদের নিকটে, গান্ধীনগরে; আক্রান্ত হয়েছিল সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা ক'মাস আগে। বেশ বড় জায়গা নিয়ে শ্বেত পাথরের কারুকার্য করা বড় মন্দির। ভারতে ঐ নৃশংস আক্রমণের পর থেকে এখানে কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা। মন্দির গাত্রে, ভিতরে ও বাইরে শিল্পীগণ এমন নিপুণ কাজ করেছেন যে মনে হয় ওরা প্রস্তরশিল্পী নয়, স্বর্ণশিল্পী। এখানকার একজন আমরা কলকাতা থেকে এসেছি শুনে জানালেন যে কলকাতায়ও এরকম মন্দির হবে। নভেম্বরেই এখানকার অধ্যক্ষ স্বামীজী কলকাতা যাচ্ছেন সেই মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন উৎসবে; প্রসূন জানতে চায় কলকাতায় কোথায় সেই মন্দির হবে। ভদ্রলোক আমাদেরকে হাত দিয়ে সেখানে দাঁড়াতে বলে পাশের টেবিলের উপর রাখা কাগজ পত্রের ভিতর থেকে একটি কাগজ খুঁজে বার করে দেখালেন। দেখলাম মন্দির হবে উত্তর ভবানীপুরে চক্রবেড়িয়া রোডে। জিজ্ঞাসা করলেন আমাদের পরিচিত জায়গা কিনা। হ্যাঁ বললাম। অবশ্য ভবানীপুর আমাদের চেনা হলেও চক্রবেড়িয়ার চক্র তৎক্ষণাৎ ভেদ করতে পারি নি। ফিরে গিয়ে শেখরকে জিজ্ঞেস করবো। নইলে কলকাতার রাস্তার ডিক্সিনারী শ্রীমান বাণীব্রতকে বললেই জানা যাবে। আমরা ঘুরে ঘুরে মন্দির দেখলাম, বাইরে গিয়ে ছবি তুললাম কিন্তু দুঃখ রইল, গর্ভগৃহে বিগ্রহকে প্রণাম করা হল না, এখন বন্ধ, খুলবে সেই সাড়ে তিনটায়। ততক্ষণ আমরা থাকতে পারবো না। আমাদের যে অনেক জায়গা দেখতে হবে। হে ভগবান ক্ষমা করো। আমরা পার্থিব বস্তু সামগ্রী দেখার জন্য চললাম। বন্ধ দরজার বাইরে থেকেই শির নত করলাম। যেন দেখতে পাচ্ছি আমাদের বড় মহারাজ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজীর চোখ মুখে কৌতুকের ঝিলিক, যেন শুনতে পাচ্ছি তিনি বলছেন, 'এইই হয়। সংসারের হট্টমন্দিরে আসলের চেয়ে ফাওএর কদর বেশি হয়ে পড়ে। এখানে এটাই নিয়ম।' মনে পড়ে রূপার কথা। আমার লক্ষ্মীদির মেয়ে রূপা স্বামীনারায়ণ পন্থী হয়ে সন্ন্যাসিনীর জীবন বেছে নিয়েছে।

গাড়ি চলে। প্রসূন চালায়, মুদিতা মানচিত্র হাতে নিয়ে পাশে বসে নেভিগেট করছে। আমাদের গাড়ি Wilton Place, SW-1, London-এ পার্কিং এর জায়গা পেয়ে সেখানে রাখা হলো। কিন্তু এই ব্যাপারে প্রসূন খুব সতর্ক। আমাদেরকে গাড়িতেই বসিয়ে রেখে দেখতে গেল অবস্থাটা। বেলাদেবী বেরিয়ে গেলেন, পাশে দাঁড়ালেন। আমিও অনুসরণ করলাম। কেই বা না করে? একটা ছোট গোলাকৃতি পার্কের চারদিকে গোলাকৃতির চতুর্থাংশ চারটি ছ'তলা ফ্ল্যাট কমপ্লেক্স, সারিবদ্ধ গাড়ি রাখা, একেবারে নিস্তব্ধ। মিনিট খানেক পরপর একটা দুটো

গাড়ি চুপচাপ চলে যাচ্ছে। ওরা দুজন এলো। বললো, 'দাঁড়াও, এ জায়গাটা রেসিডেন্টদের জন্য। আমরা ওখানে পেয়িং পার্কিংএ রেখে আসি।' গাড়ি রেখে এলে আমাদের পদযাত্রা শুরু হল। পুত্র বললো, 'বাপরে, এখানকার ফ্ল্যাটের মাসিক ভাড়াই হবে তিন হাজার পাউন্ড। আড়াই লক্ষ টাকা। আমরা হাটতে হাটতে মিনিট পাঁচেকেই Knights Bridge আন্ডার গ্রাউন্ড স্টেশনে পৌছলাম। সিঁড়ি দিয়ে লোক নেমে যাচ্ছে মাটির তলায়। উঠে আসছে কত জন! আমরা হাঁটি। মুদিতা দেখায় ঐ যে দেখা যাচ্ছে একটা বড় বাড়ি, প্রায় গৈরিক রঙের, আমরা ওটাতে যাব। এটা পুরোটাই Harrods-এর পণ্যশালা—আমাদের ভাষায় দোকান। ব্যস, সেই যে ঢুকলাম, আর কোথাও যাওয়া হল না। সাতটি তলায় ঘুরে ঘুরেই রাত হয়ে গেল।

Harrods Department Store পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ডিপার্টমেন্ট স্টোর এটি। এতে এমন সব অদৃষ্ট পূর্ব ও মহামূল্যবান বস্তু সামগ্রী সাজানো আছে যার তুলনা নেই কোথাও। যোগাযোগের ক্ষেত্রে এখন তো বিপ্লব ঘটে গেছে। পৃথিবীটা এখন একটা গ্রাম হয়ে গেছে। কিন্তু মাত্র পঁচিশ বছর আগেও এমন ছিল না। ইন্টারনেট, ফ্যাক্স ছিল না। টেলিফোনও ধেড়ধেড়ে ছিল। তখনো টেলিগ্রাম করতে হতো পোস্ট অফিসে গিয়ে। তখন বড় বড় শহরে বড় ব্যবসায়ীরা টেলিগ্রাফিক ঠিকানা রেজিস্টার্ড করে রাখতেন টেলিগ্রাম এলে তাড়াতাড়ি পাবার জন্য। সেই সময় এই Harrods-এর টেলিগ্রাফিক ঠিকানা ছিল Everything। London. এই দু'টো কথার মধ্যে এই বিখ্যাত বিপণিটির ঐন্দ্রজালিক জীবন দর্শন নিহিত আছে।

চারদিকে চারটি বড় বড় রাস্তা। মাঝখানে প্রায় বর্গাকৃতি আয়তক্ষেত্রটিতে একটি ছয় তলা বিশাল প্রায় গৈরিক রঙের বাড়ি। মাটির নীচে একতলা ও মাটির উপরে ছয়তলা মোট সাত তলা এই বাড়ি। মোট একলক্ষ এগারো হাজার পাঁচশ স্কোয়ার ফুট জায়গার নব্বই শতাংশে ক্রেতাদের জন্য সাজানো আছে বিশ্বের সেরা, অবশ্যই মূল্যেও সেরা সব সামগ্রী। কত ক্রেতা আসেন প্রতিদিন এখানে? কোন কোন দিন তিন লক্ষ ক্রেতা এসেছেন। হিসাব আছে। পৃথিবীর পঞ্চাশটি দেশ থেকে আসা পাঁচ হাজার কর্মচারী এখানে কাজ করেন। বড় দোকানকে ডিপার্টমেন্ট স্টোর বলা হয়। তিনশ ত্রিশটি ডিপার্টমেন্ট আছে এই অতিকায় বিপণি হ্যারড্স্ এ। সাতচল্লিশটি বিশাল ট্রাক দুইলক্ষ পঁচিশ হাজার বার জিনিসপত্র নিয়ে আসে প্রতি বছরে হ্যারড্স্ এ। প্রতি রাতে এখানে সাড়ে এগারো হাজার বাল্ব জ্বলে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নিউ ইয়র্কের একটি রেস্তঁরায় লেখা ছিল যে ওখানে যে-কোন খাবার পাওয়া যায়। একদিন একজন লোক এসে হাতির মাংসের বারবিকিউ চান। চটপটে বেয়ারা অর্ডার নিয়ে স্যালুট করে চলে যায়। চল্লিশ মিনিট পরে সে এসে জানায় যে হাতির মাংসের বারবিকিউ করার স্পেশালিস্টকে খবর দিয়ে আনা হয়েছে। তিনি এসেছেন। তিনি জানতে চাইছেন ক্রেতা কোন হাতির মাংস চাইছেন। ইন্ডিয়ান না আফ্রিকান; বাচ্চা না বয়স্ক; মদ্দা না মাদি ; অ্যালবিনো না নর্মাল? এত কথা শুনে সেই অতি চালাক খদ্দেরও ভড়কে যায়। সে মনে করে এদের কাছে বুঝি সবই আছে; বলার মাত্র অপেক্ষা; যেটা চাইবে, সেটাই এনে দেবে। দাম যদি চায় এক মিলিয়ন ডলার? তাঁর তখন অবস্থা ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। সে তখন কৌশল পাল্টায়। সে বলে যে সে ফিলিপ্পিনস্ যাচ্ছে, অনেকক্ষণ অপেক্ষা

করার মত সময় নেই। তাড়াতাড়ি কিছু খেয়েই চলে যাবে। এই বলে তাড়াতাড়ি পাবার মত খাবারের অর্ডার দেয়, সেটা পরিবেষণ হয়, সে খেয়ে দাম চুকিয়ে ফিলিপ্পিনস্ বা কামচাটকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। বিক্রেতা এবং খদ্দের উভয়রই ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে।

Harrods-এ গিয়েও সব পাবেন। Store Guide বলে যোল পৃষ্ঠার এই সুদৃশ্য বইটিতে সাতটি তলার সাতটি রঙীন প্ল্যান ম্যাপ আছে, কোন ঘরে কি সাজানো আছে তা লেখা আছে। দু'টি পৃষ্ঠায় চার কলমে A-Z Directory বলে চার কলাম বস্তু সূচী দেওয়া আছে। কিন্তু তাতে QXYZ ইত্যাদি অক্ষরের শিরোনাম নেই। V অক্ষরটির নীচে কেবল Video/DVD লেখা থাকায় মনে হলো এত বড় দোকানে Violin নেই? পরক্ষণেই দেখি M-এর তলায় Magazines দিয়ে আরম্ভ ও Musical Instruments দিয়ে শেষ। বুঝাই যায় Violin ওখানে আছে। A দিয়ে Aircraft হয়। ১৯১৯ সালে তাও বিক্রী হয়েছে। Alligator ও তো হয়। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগানকে উপহার দেওয়ার জন্য একটি বাচ্চা হাতি—নাম তার গার্টি কেনা হয়েছিল হ্যারড্স্ থেকে।

প্রতিটি তলায় এক বা একাধিক খাবার দোকান আছে। গ্রাউন্ড ফ্লোরেই খাদ্য রসিকদের সমাগম সবচেয়ে বেশি। এই যে জাপানী তরুণ তরুণীরা খাচ্ছে কাঁচা মাছের টুকরা কি জানি এক ঝোলে চুবিয়ে। ওখানে মধ্যপ্রাচ্যের শেখ এরা খাচ্ছেন হাত দিয়ে। ঐ দেখুন ঐ কাচের শো কেসে লেখা আছে যে এইসব খাবারের সমস্ত মাংসই হালাল। অর্থাৎ ধর্মপ্রাণ মুসলমান এই মাংস স্বচ্ছন্দে নিঃশঙ্ক হয়ে খেতে পারবেন। মাংসের জন্য পশু বধ করার ইসলামী এক বিশেষ পদ্ধতি আছে। সেই পদ্ধতিতে বধ করা পশুর মাংসকে হালাল বলে। আমেরিকায়ও হালাল মাংসের বিজ্ঞাপন দেখা যায় সর্বত্র। সেইসব দোকানীর অধিকাংশই দেখেছি বাংলাদেশী বা পাকিস্তানী। এক আধজন ভারতীয়ও আছেন। ওখানে খাচ্ছেন চীনারা। অবাক হয়ে দেখতে হয় ওদের খাওয়া। দুটো উল বোনার কাঠির মত কাঠি দিয়ে কেমন চটপট খেয়ে নিচ্ছেন সবাই। একটা কণাও পড়ছে না। কত দেশের কত রকমের খাবার। ওদিকে ইতালীয়ান আর এদিকে দেখি স্পেনীয় খাবার। এদিকে আমাদের, ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশী খাবার। ঐ যে সিঙ্গাড়া বা সামোসা, বেশ বড় বড়। একটি সিঙ্গাড়ার দাম নিরানব্বই পেন্স বা সাতাত্তর টাকা। এখানে চারজনে পেট ভরে খেতে হলে অন্যূন চার হাজার টাকার দরকার। ছেলেকে বলি এখানে এখন কিছু খাব না। আমার ম্যাকডোনাল্ডস-এর ঐ ভেজিটেবল স্যান্ডউইচ বড় ভাল লাগে। কাছাকাছি ওদের দোকান নেই? তবে পরে খাব। এখন একটু দেখি।

হ্যারড্স্-এ যাঁরা আসছেন, ঐ এসকেলেটার দিয়ে উঠছেন নামছেন, ঐ তলায় তলায় ঘুরছেন, কোন কোন জিনিস নিবিষ্ট মনে দেখছেন, এদের অন্তত এক তৃতীয়াংশ ক্রেতা নয়, এরা শুধু দর্শক। বিনা পয়সায় মহার্ঘ্য পণ্য সম্ভারের এক বিশাল প্রদর্শনী দেখতে এসেছেন। রোজ আসেন। ঘুরে ঘুরে দেখছেন, নয়ন সার্থক করছেন। আমরাও ঐ এক তৃতীয়াংশের দলেই পড়ি। লন্ডনের দ্রষ্টব্য কত কিছু ছেড়ে এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। দামের টিকিট দেখে সেই যে চক্ষু আমাদের ছানাবড়া হয়েছিল। সেই হয়েই আছে। আর ছোট হওয়ার অবসর পাচ্ছে না। পোশাক-পুরুষদের, মহিলাদের, চিলড্রেন ও চিলড্রেন অন্ ফোর এর আলাদা ভাগ। ঐ বিভাগটির নাম লাক্জারিজ্, এখানে জুয়েলারীজ্, ফার্নিচার, বেড্জ্, ইলেকট্রনিক্স,

স্পোর্টস, কত কিছু। বিছানার ঘরে একটি খাটসহ বিছানার দাম পাঁচ লক্ষ টাকা। ঐ ফ্ল্যাট টেলিভিশানটির দাম সাত লক্ষ টাকা। (দামের কি আর মাথা মুণ্ড আছে আজকাল! আজ, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০৩ লন্ডনের দ্য টেলিগ্রাফ পত্রিকায় দেখলাম নিউইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্কের পাশে ডাকোটা অ্যাপার্টমেন্টসে একটি এক বেডরুমের ফ্ল্যাট কিনতে গিয়েছিলো কার্লি সাইমন নামের এক যুবতী নায়িকা। ফ্ল্যাটের দাম ছয় লক্ষ পাউন্ড—চার কোটি আশি লক্ষ টাকা। এখানে ফ্ল্যাট কিনতে হলে রেসিডেন্টস্ কমিটীর সঙ্গে ইন্টারভিউ দিতে হয়। ওরা অনুমোদন করলে তবে লেনদেন হয়। শ্রীমতী সাইমন ঐ ইন্টারভিউএ পাশ করতে পারেন নি। কমিটীর মেম্বারগণ ওকে অভদ্র বলে ওর দরখাস্ত বাতিল করে দিয়েছে বলে বিষয়টি সংবাদপত্রে সংবাদ হওয়ার যোগ্যতা লাভ করেছে। খবরটি কোন বিষয় নয়। আমাদের জ্ঞাতব্য হল এই যে একটি এক বেড-রুমের ফ্ল্যাটের মূল্য পাঁচ কোটি টাকা।); ওখানে কাট গ্লাসের বস্তু সামগ্রী। ঐ যে এক ঘন ফুট আকৃতির একটি কাচের আধার। এর মধ্যে রাখা একটি গোলাপ ফুলের গাছ। বিভিন্ন দিক থেকে আলো এসে পড়ায় গাছটি যেন জ্বলছে। সামান্য কাচ কিন্তু, হীরক খণ্ড নয়। কাচের আধারটি সহ কাচের এই গোলাপ গাছটির দাম তিন লক্ষ টাকা।

এখানে একটি অনুপস্থিতি বড় প্রকট। এতক্ষণ ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছি তলায় তলায়, প্রদর্শিত বস্তু সামগ্রী দেখছি ভাল করে, কিন্তু এত মানুষের মধ্যেও অশ্বেতকায় প্রায় চোখেই পড়ছে না। আরব চীনা জাপানীরা থাকলেও কালো বা আমাদের মত বাদামীদের সংখ্যা খুবই কম। হ্যাঁ, এইবার একটা ডিপার্টমেন্ট পেয়েছি যেটাতে জিনিসের দাম বেশি নয়। এটি বইয়ের ডিপার্টমেন্ট। এখানে সবই হার্ড কভার বিখ্যাত বই। কোন লিম্প বা পেপার ব্যাক নেই। বইয়ের দোকানেও ত্রিশ পাউন্ডের নীচে কোন বইয়ের দাম নেই। ত্রিশ পাউন্ড টাকায় হয় সাড়ে বাইশ শ' টাকা। আমার মনে হয় এমন কোন বাংলা বই নেই যার এক খণ্ডের মূল্য এত। একবার কলকাতায় এক বন্ধুর বাড়িতে বসে কথা হচ্ছিল। বলছিলাম যে কলকাতার তুলনায় আগরতলায় বাজার দর বেশি। আমার শহুরে বন্ধুপত্নী আদুরে গলায় জিজ্ঞেস করলেন সব জিনিসের দামই বেশি কিনা। তাকে বলেছিলাম যে একটা দোকান আছে যেখানে সব জিনিসই ঠিক দামে পাওয়া যায়। তিনি সোৎসাহে জানতে চান সেটি কোন দোকান। বলেছিলাম, ডাকঘর। উত্তর শুনে তিনি সন্তুষ্ট হন নি। হ্যারড্স্ কিন্তু সে রকম নয়। এমন নয় যে অন্য জায়গায় যে জিনিসের দাম ধরুন পাঁচশ' টাকা। হ্যারড্স্-এ সেটি পাঁচশ টাকার বেশি। আর হ্যারড্স্ কোন জিনিস তৈরি করে বিক্রীও করছে না। আসল কথা এরা কম দামের জিনিস রাখেই না। যেমন ধরুন নাইকে ব্র্যান্ডের জুতা। নাইকের নিজের দোকানে হয়ত জুতা পাওয়া যায় বারোশ টাকা থেকে বারো হাজার টাকা জোড়ার। হ্যারড্স্-এ সেই জুতার কেবল আট হাজার থেকে বারো হাজার টাকা জোড়ার জুতাই থাকবে, কম দামেরগুলি থাকবে না। এখানে জিনিসের দাম বেশি নয়। বেশি দামের জিনিস থাকে। বেশি ভাল জিনিস তাই বেশি ভাল দাম।

ঐ যে আসামের চা তিন হাজার টাকা কিলো। ঐ যে চুল কাটা ত্রিশ পাউন্ড থেকে শুরু। আমাদের ইপ্সউইচের বাড়ির সবচেয়ে কাছে চুল কাটার দোকানটির নাম Alexandria Hair Artistry. ওখানে পুরুষদের চুল কাটার জন্য লাগে এগারো পাউন্ড। ওখানে হামাগুড়ি দেওয়া বাচ্চাদের পোশাক। কোন পোষাকের দামই পঁচিশ পাউন্ডের কম দেখলাম না। ঐ

যে ছোট পলিথিনের সুদৃশ্য ব্যাগে দুটো করে রাগবীর বল, এক একটা মুঠির মধ্যে আসে; স্যুভেনির আর কি? মূল্য ষোল পাউন্ড। এসব জিনিস অন্যত্র থাকলেও দাম এমনই হবে। তবে অন্য দোকানে এসব থাকবেও না। এমন দাম দিয়ে কেনবার ক্রেতা ওইসব দোকানে যায় না। কোন দোকানীও এত টাকা দিয়ে এসব জিনিস নিয়ে দোকানে রাখবেন না। এরা রাখেন, বিশ্বজোড়া বিত্তবানেরা খবরও রাখেন যে এরা এসব মহার্ঘ জিনিসই রাখেন তাঁরা আসেন। এই বিপণিতে ঢুকবার ও বেরুবার অনেকগুলি দ্বার আছে। যে কোন একটাতে নজর রাখুন, দেখুন। প্রতি দুমিনিট তিন মিনিট অন্তর অন্তরই একজন হ্যারড্স্ লেখা বিখ্যাত সেই পলিথিনের ব্যাগ ভর্তি করে ক্রীত দ্রব্যাদি নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন; লক্ষ্য করছেন অন্য কেউ ব্যাগগুলি দেখলো তো? দেখে ঈর্যান্বিত হলো তো? তবে না নিজের অহঙ্কারের বেলুনটা পুরো ফুলে! পরের ঈর্ষা উৎপাদনে সমর্থ হলে এবং সেই ঈর্ষা নিজে দেখতে পেলে তবে না সুখ সম্পূর্ণ হয়! এখানে এই হ্যারড্স্ এর বিখ্যাত সবুজ রঙের ব্যাগ অন্যের চোখের ঈর্ষাকে প্রকট করে। প্রসঙ্গত বলা দরকার, সবুজ, হাল্কা সবুজ, হ্যারড্স্ সংস্থার প্রিয় রঙ। এদের কার্পেটে সবুজের সমারোহ। বড় বিজ্ঞাপন ঘোষণা করছে 'আসুন হ্যারড্স্ এর কার্ড কিনুন, আমাদের সবুজ কার্পেট সম্বর্ধনা লাভ করুন।' লাল কার্পেট সম্বর্ধনার কথা সকলে শুনেছেন, সবুজ কার্পেট সম্বর্ধনা শুনেননিতো? সবুজের এই বিশেষ ভালাবাসা ও সম্মানের কথা শুনে আমাদের রন্টুর জননী রেখা খুশি হবেন। তাঁর অত্যধিক সবুজ প্রীতির জন্য শ্রীমতী রেখা কেবল আত্মজনের ক্ষেপানোর কথাই শুনেছেন। আজ একটু ভাল কথা শুনে আনন্দিত হবেন ভেবে তাঁর হাসিমাখা মুখখানি দেখে আমরাও আনন্দিত বোধ করছি।

অনেক হয়ে গেছে হ্যারড্স্ এর কথা। তবু বলি যদি কেউ এখানে আসেন, তার তখন মনে হবে আমি কিছুই লিখিনি। হ্যারড্স্এর স্টোর গাইড-এ প্রত্যেকটি তলায় কি পাওয়া যায় তা এক কথায় বলার জন্য সেগুলির এক একটা নাম দেওয়া হয়েছে। নামগুলি বলি ঃ মাটির নীচের তলা—ডিজাইনার পুরুষের পোশাক, স্টেশনারী, দান সামগ্রী ও সেবা; ভূতল তলা বা গ্রাউন্ড ফ্লোর--ভোজন সামগ্রী, সৌন্দর্য, ফ্যাসন, বিবিধ ও পুরুষের পোশাক; প্রথম তল—মহিলা ফ্যাসন ও মহিলাদের পাদুকা; দ্বিতীয় তল—গৃহসামগ্রী, দান সামগ্রী, বিবাহ, উৎসব ও সেবা; তৃতীয় তল—আসবাব পত্র এবং শব্দ ও দৃশ্য; চতুর্থ তল—শিশুদের পোশাক, খেলনা ও হ্যারড্স্ এর জগৎ; পঞ্চম তল—ক্রীড়া, কেশ ও সেবা।

আমাদের দেশে উৎসবের মানেই হচ্ছে ভোজন। ভোলানন্দ সেবাশ্রমে স্বামীজী বাবা কৃপালানন্দ গিরি মহারাজ প্রায় প্রতিটি উৎসবেই একটি ধর্মালোচনা সভার আয়োজন করেন। সভা হয় এগারোটা থেকে প্রায় দুটো পর্যন্ত। ছোট নাট মন্দির—কায়ক্লেশে শ' তিনেক লোক বসতে পারেন সেখানে। প্রতি বারেই শাস্ত্র কথা শুরু হয় বিশ ত্রিশ জন শ্রোতা নিয়ে, ধীরে ধীরে ঈশ্বর ভক্তদেরকে টানেন। কিন্তু ভোজন টানে দেড়টার পর থেকে। দুটোর পরে স্রোতের মত লোক আসে, সন্ধ্যা পর্যন্ত খিচুড়ী চলতে থাকে। এই অবস্থা সব উৎসবে। বৌভাতের মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রিত রাত দশটায়ও এসে কৃতার্থ করেন নিমন্ত্রণকারীকে। খান, ঠাকুর কৃপায় সকলেই মন্দ না। পরিবেষণকারীদের উপর আদেশ, 'হা হা দদ্যাৎ, হু হু দদ্যাৎ, দদ্যাৎ শির সঞ্চালনে, ন দদ্যাৎ ব্যাঘ্র ঝম্পনে।' যখন আর পারেনই না, তখনই ব্যাঘ্র ঝম্পন হয়।

খেতে খেতে আর পারেন না, সে এক অবস্থা। যে বাড়িতে উৎসব, তা পূজা, উপনয়ন, শ্রাদ্ধ যাই হোক সে বাড়িতে কি অবস্থায় খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত হয়, কেমন করে তা রক্ষা করতে হয় সে বর্ণনা শরৎচন্দ্র তাঁর 'পল্লীসমাজ' গ্রন্থে বিশদ করে দিয়েছেন। সে দিকে আমি আর যাই না। আমি তৈরি করা সামগ্রী রক্ষার দিকটা একটু ছুঁয়ে যাই। আমাদের গ্রামেও পল্লী সমাজের রমেশের জেঠাইমার মত একজন জেঠাইমা ছিলেন। ভাঁড়ার ঘরের ভার তার হাতে দিলে সকলে নিশ্চিন্ত হতে পারতেন। কিন্তু এই জেঠাইমারূপী লক্ষ্মীন্দরের লোহার বাসর ঘরেও যতীনরূপী একটি ছিদ্র ছিল। সকলে জানতেন এবং মেনে নিতেন। একদিন এক উৎসব বাড়ির ভাড়ার ঘরে এই বিনীত ছাগশিশুরূপী যতীনও ব্যাঘ্রের গর্জন করে উঠেছিল, 'পারবো না' বলে। জেঠাইমা একটু পর পরই তাকে ডেকে নিয়ে দরজা বন্ধ করে ক্ষীরটা, সরটা, রসগোল্লাটা, দিচ্ছিলেন ; বেচারা যতীন আর পারছিল না। না করলেও শোনেন না জেঠাইমা। বলেন, 'ওরে পাচ্ছিস যখন খেয়েনে। দু'বেলা সব দিন তো পেট ভরে ভাতও জোটে না। খা।' কিন্তু জেঠাইমার আশ তো পেট বেচারা মানতে পারছে না। সে তো ক্লান্ত, ফাটি ফাটি। তাই যতীন বিপর্যস্ত হয়ে পরিত্রাহী চিৎকার করে উঠে 'পারবো না' বলে। পরিতাপের কথা ও স্বস্তির কথা ক্যাটারার হয়েছে এখন। আমাদের ভিয়েন ও ভাড়ার ঘর কালচার মৃতপ্রায়। পরের জেনারেশন এসব শব্দের অর্থ খুজবে অভিধানে।

আমাদেরও সেই অবস্থা। আর পারি না। পদদ্বয় ক্লান্ত, নয়ন দ্বয় শ্রান্ত, শরীর অবসন্ন। যতীন যেমন ক্ষীর, সর, রসগোল্লাও খেতে পারছিল না, আমরাও আর দেবদুর্লভ বিলাস সামগ্রী দেখতে পারছিলাম না। চল বেরোই। চলো এই অবাস্তব, অচিন্ত্যনীয়, ভাষায় বর্ণনার অযোগ্য, অলীক জগৎ থেকে বেরোই। বাস্তবে যাই, মাটিতে দাঁড়াই, মানুষ দেখি। বলে যাই দু'টো কথা। এক—হ্যারড্‌স্ একটি ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যবসা, কোন লিমিটেড কোম্পানি নয়। দুই—এই হ্যারড্‌স্ এর মালিকের পুত্রের সঙ্গে নাকি ইউনাইটেড কিংডম এর রাজপুত্রবধু ডায়ানার পরকীয়া চলছিল। আমরা বেরিয়ে এসে উইলটন প্লেসে রাখা গাড়িতে বসলাম।

ছেলের আশ মেটেনি বৃদ্ধ ছেলে মেয়ে বাবা মাকে লন্ডন দেখাবার। গত বছর আমেরিকা থেকেই ব্যবস্থা করে দিয়েছিল আমাদের লন্ডন দেখার। আমরা স্ট্রাটফোর্ড আপন আভন, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও ওপেন টপ বাসে লন্ডন দেখে গিয়েছিলাম। এবারও কত দেখাচ্ছে। তবু আশ মেটেনা। সুতরাং গাড়ি চলে হাইড পার্ক, হিলটন হোটেল, গ্রসভেনর সার্কেল, এসব দেখিয়ে। একটি চকোলেটের দোকান। কেবল চকোলেট—La Maison Du Chocolat. কত কিছু যে কত বড় হতে পারে তার ধারণা করা ছেড়ে দিয়েছি। শুধু দেখি আর দেখি। বাদাম চিবোই। ডায়েটকোলা পান করি। রামকৃষ্ণ শরণম্ গাই। বাড়ি পৌছাই। বেশ শীত পড়ে গেছে।

সংযোজন ঃ দ্য টাইমস্ অব ইন্ডিয়া, কলকাতা, তেরোই মার্চ, ২০০৪। মোহাম্মদ আল ফায়েদ মিশরীয় বংশ জাত বৃটিশ। তিনি হ্যারড্‌স্ এর মালিক। ১৯৯৭ সালে প্যারিসের এক টানেল-এ এক গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যায় মোহাম্মদ ফায়েদের পুত্র দোদি ও ডায়ানা। ফায়েদ মনে করেন যে এই দুর্ঘটনা বৃটিশ গুপ্ত পুলিশের সাজানো একটি খুন। তিনি এই বিষয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত চেয়ে বার বার আদালতে পরাস্ত হচ্ছেন। সেদিন আবার তার আবেদন খারিজ হলো। ফায়েদ বলছেন যে তিনি লড়ে যাবেন।

গ্রীনিচ

পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি আমরা যখন বিদ্যালয়ের নবম দশম শ্রেণিতে পড়তাম তখন আমাদের লক্ষ্য ছিল পাশ করা। কোন ডিভিশানে কে পাশ করলো সে খবর অপ্রয়োজনীয়; প্রথম দশ জনের মধ্যে একজন হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা সেসব অবান্তর প্রশ্ন বাতুলতা মাত্র। আমি ১৯৫৫ সালে ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষা পাশ করেছি। ১৯৮৭ সালে আমার পুত্র যখন স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেয় তখন বোর্ডের প্রথম দশের তালিকায় কাদের নাম থাকতে পারে সেটাই ছিল গবেষণার বিষয়। এক প্রজন্মে চিন্তা ও চেতনা কতটা বদলে যায়। অবশ্য কারণও ছিল। আমি ছিলাম গরিব গ্রামীণ গৃহস্থের সন্তান, আমার স্কুলটিও ছিল তেমনি। না ছিল ঘর দোর, না ছিল শিক্ষক, না বসবার আসন বা শিক্ষণ সামগ্রী। আমার পুত্র একটি ছোট রাজ্যের রাজধানীর অধিবাসী। একজন মান্যগণ্য কলেজ অধ্যাপকের পুত্র ও নামী স্কুলের ছাত্র। আমি সামান্যভাবে উত্তীর্ণ হয়েও সারা অঞ্চলে খ্যাত হয়ে উঠেছিলাম কারণ তেমন পাশ সেই স্কুল থেকে আগে কেউ করেনি। আমার পুত্র প্রথম দশ জনের মধ্যে একজন হয়েও তেমন খ্যাতি পায় নি। কারণ ঐ স্কুল থেকে বেশ ক'জন প্রতি বছরই দশজনের তালিকায় নাম তুলে নেয়। কিন্তু দুই প্রজন্মের বিদ্যার্থীর কাছেই ভূগোল একটা বিষয় ছিল এবং ভূগোল পরীক্ষায় অঙ্ক থাকতো একটা। মোটামুটি মেধাবী পরীক্ষার্থীরা এই অঙ্কটি কষতে পারতো এবং এই অঙ্কটির নম্বরটি পাবে বলেই ধরে নিত। অঙ্কটির বিষয় ছিল মোটামুটি এক রকম। অমুক স্থানে যখন স্থানীয় সময় সকাল এতটা বেজে এত মিনিট তখন তমুক স্থানের স্থানীয় সময় কত? দু'টি স্থানেরই দ্রাঘিমাংশ দেওয়া থাকতো বন্ধনী চিহ্নের মধ্যে। এই অঙ্কটি কষা ও তার জন্য দেওয়া নম্বরটি পাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীরা একটি স্থানের নাম জানতো। সেই নামটি হল গ্রীনিচ। ভূগোলটিতে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুকে সংযুক্ত করে যে রেখাগুলি টানা আছে সেগুলি তো সবই একরকম। ঐগুলিকে দ্রাঘিমা রেখা বলে বটে কিন্তু কোন একটাকে বিশেষত্ব না দিলে তো সব একই হয়ে যায়। তাই এদের মধ্যে যে রেখাটি গ্রীনিচ নামক স্থানটির উপর দিয়ে গেছে বলে ধরে নেওয়া হয় তাকে বিশেষত্ব দেওয়া হয়েছে; তাকে শূন্য ডিগ্রি দ্রাঘিমা রেখা বা প্রাইম মেরিডিয়ান বলা হয়। এর থেকে পূর্ব দিকে পূর্ব গোলার্দ্ধ বা Eastern Hemisphere-এ যাওয়া হয় আর পশ্চিম দিকে গেলে পশ্চিম গোলার্দ্ধে বা Western Hemisphere-এ যাওয়া হয়। লাতিন ভাষায় 'আধা' শব্দটির কয়টিই প্রতিশব্দ আছে—semi, demi, hemi এবং quasi. ইংরেজিতে বিভিন্ন শব্দের সঙ্গে এগুলির এটা বা ওটা লাগানোর বিধান আছে। বিধানটি অবশ্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কাজে লাগে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই half শব্দটি ব্যবহার করা হয়। তবু কোন কোন ক্ষেত্রে এই শব্দগুলিও চলে। যেমন ভারতে কোনও দুই সরকারি বিভাগের মধ্যে বহু চিঠি চালাচালি করেও যখন একটা কাজ কিছুতেই হয় না (আর আমার মহান ভারতে হামেশাই এমন হয়।) তখন এক বিভাগের প্রধান অন্য বিভাগের প্রধানের কাছে ব্যক্তিগত পত্র লিখেন। সেই পত্রের নাম 'আধা সরকারি' বা ডেমি অফিশিয়েল বা D.O. তবে মোদ্দা কথা এই যে বহু সরকারি কর্মচারীই D.O. কথাটির মধ্যে যে লাতিন ভাষা লুকিয়ে আছে সে খবর রাখেন না। আদালত ও

জমি রেজিস্ট্রি করার অফিস প্রাঙ্গণে তিন রকমের কাগজ ব্যবহার হয়। সাধারণ কাগজ, দলিল লেখার মূল্যবান স্ট্যাম্প পেপার ও একটু মোটা সামান্য নীল বা সবুজ রঙের কাগজ। এই তৃতীয় রকমটিকে সেমি পেপার বলে। এই Semi অর্থে আধা মূল্যবান বুঝানো হয়। তবে যাঁরা সারাদিন এই কাগজ ব্যবহার করেন তাদের মধ্যে খুব কম লোকেই সেমির সঙ্গে লাতিনের আত্মীয়তা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। আমাদের তরুণ বয়সে চাকরি তিন অবস্থায় ছিল—temporary, quasi permanent ও permanent. ওই কোয়াসি শব্দটির অর্থও আধা এবং এটিও লাতিন।

যাকগে। আমার বক্তব্য বিষয় ছিল গ্রীনিচ। আমার স্বভাব মতই কলম বেচারা অনেক ঘোরাফেরা করে তবে আবার গ্রীনিচে আসতে পেরেছে। ইপ্সউইচ থেকে লন্ডন শহরের দক্ষিণ ভাগে গ্রীনিচ অংশে এসে আমরা পৌছলাম। Maze Hill নামক ছোট পাহাড়টির কিনারায় রাস্তার পাশে দক্ষিণাটি দিয়ে, দক্ষিণার রশিদটি উইন্ড স্ক্রিণের ভিতর দিকে লাগিয়ে বাইরে এলাম। বলাই বাহুল্য রাস্তা তৈরি হয়েছে গাড়ি চালাবার জন্য, গাড়ি রাখার জন্য নয়। সুতরাং, রাস্তায় গাড়ি রাখা যায় না। কোন কোন জায়গায় দক্ষিণা দিয়ে গাড়ি রাখারও ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বহু জায়গাতেই দক্ষিণা দিয়েও সীমিত সময়ের জন্য গাড়ি রাখা যায় মাত্র। গ্রীনিচের মেইজ্ হিল-এ দক্ষিণা দিয়ে গাড়ি রাখে লোকে তিন ঘণ্টার জন্য। তাই ইন্টারনেটে অনুরোধ থাকে 'গাড়ি আনবেন না। বাসে ট্রেনে আসুন।' হ্যাঁ বাসে ট্রেনে এলে একটু আধটু হাটতে তো হবেই। তা খারাপ নয়। কথায়ই আছে যে হাঁটলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। তবু লোকে গাড়িতে আসে, পার্কিং-এর জায়গা খোঁজে, কোন মানে হয়?

Maze Hill লন্ডন শহরের গ্রীনিচ বরোর প্রায় মাঝখানে বেশ উঁচু একটি টিলা। গ্রীনিচ বরোটিও ছোট নয়। প্রায় উনিশ বর্গ মাইল এর আয়তন। মাঝ খানের এই টিলা ভূমিটি চারদিকে দেয়াল দিয়ে ঘেরা একটি পার্ক। একটি ছোট জলাশয়ও আছে। তাতে নৌকা বিহারের ব্যবস্থা আছে। বেশ কিছু ছুটি উপভোগ করতে আসা বাবা মা তাদের শিশুদের নিয়ে নৌকায় চড়ে ঘুরছে। হাসির কলকল খলখল শোনা যাচ্ছে। টিলাটির তিন চারটে মাথা এখানে ওখানে খাড়া। বেশ কিছু বড় বড় গাছ। তবে বেশি অংশই ঘাসে ঢাকা পরিচ্ছন্ন। আমরা হেঁটে হেঁটে প্রথম যে মাথাটায় উঠলাম সেটা ছোট, ক'টা বেঞ্চ, ওপাশে একটা ঝোপ। কিছু মানুষ বসে আছেন। একটি পাগড়ী পরা আমার দেশের লোক তার পরিবার নিয়ে এসেছেন। তার স্ত্রী ছোট ভিডিও ক্যামেরায় ছবি তুলছেন, স্বামীটি ক্রমাগত বকে যাচ্ছেন, বলছেন ক্যামেরা হাতে নিয়ে ঘুরালেই ছবি আসে না, জানতে হয়, চোখ থাকতে হয়। স্ত্রীটি পাত্তাই দিচ্ছেন না। আমি শুনছি কেউ বলছে, 'ক্যামেরা, তুমি কার?' ক্যামেরা বলছে, 'যখন হাতে যার'। নেমে পড়লাম ওখান থেকে। পথ পীচ ঢালা। কিন্তু পথ এত খাড়া যে মাঝে মাঝেই এক সেন্টিমিটার উঁচু পাথরের ইট দিয়ে বাধা খাড়া করা হয়েছে; প্যারাম্বুলেটার বা হুইল চেয়ার হড়কে গেলে আর রক্ষে নেই তো, সেইজন্য। আমাদের নেমে গিয়ে উঠতে হবে ঐ চুড়াটায়, ওটার মাথায়ই দেখা যাচ্ছে অবজার্ভেটরি বিল্ডিং, মানমন্দির ভবন।

আমার ঠাকুরমা শেষ বয়সে চোখে দেখতে পেতেন না। সারাদিন বসে থাকা, মাকে এটা ওটা সেটা করার জন্য তাগাদা দেওয়া, উঠান দিয়ে কে হেটে যাচ্ছে তার সঙ্গে কথা

বলা, আমাকে উপদেশ দেওয়া, বেলা কতটা হলো তার খবর নেওয়া, ইত্যাদি তার কাজ ছিল। ভাই উঠো, সকাল হয়েছে, অনিরুদ্ধ কাশছে। পাশের বাড়ির অনিরুদ্ধ দেবনাথ সারাদিন রাত বেশ নিরুদ্ধই থাকতেন। তার কথাবার্তা কিছুই শোনা যেত না। কিন্তু ভোর রাতে, সূর্যদেব উঁকি মারার অন্তত ঘণ্টা দেড়েক আগে তার ঘুম ভেঙ্গে যেত। তিনি উঠে পড়ে হুকা ধরিয়ে টানতে শুরু করতেন এবং তার নিরুদ্ধ ভাব কেটে যেত তিনি অনিরুদ্ধ হয়ে কাশিতে ফেটে পড়তেন। তাতে অবশ্য কারো কিছু আসতো যেতো না। কিন্তু অনিরুদ্ধদার কাশি ঠাকুরমার বাণীতে প্রতিধ্বনিত হয়ে আমার নিদ্রার অন্ত ঘটাতো প্রতিদিন। অনিরুদ্ধদা একবার একটা কাণ্ড করেছিলেন, তা ভুলার নয়। আমার ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে কি জানি বিষক্রিয়া হয়েছিল। আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়নি, তবে বেশ মোটা ও লাল হয়ে উঠেছিল, আর আমি প্রচণ্ড ব্যথায় ভীষণ জোরে চিৎকার করছিলাম। অনিরুদ্ধদা এসে দেখে চিকিৎসা করলেন। ছাগলের সদ্য ফেলা বিষ্ঠা, ভিজা বড়ি, কচলে তার সঙ্গে অতি সামান্য কিছু মিশিয়ে তা দিয়ে সমস্ত আঙ্গুলটা ঢেকে দিলেন। একটা বেশ মোটা বেগুনের নীচের দিকটা কেটে নিয়ে তার ভিতরের জিনিস ফেলে টুপি বানালেন এবং সদ্য দেওয়া ছাগল ঔষধ মোড়া আঙুল সেই বেগুন টুপি দিয়ে ঢেকে দিলেন। ঘণ্টা খানেকে আমার ব্যথা সারে। আমি শুয়ে পড়ি। তিন ঘণ্টা পরে ফোলা কমে ও বেগুন টুপি ওই ছাগল ঔষধ, আমার অঙ্গুষ্ঠের সম্পূর্ণ নখ ও অনেক পূঁজ নিয়ে নিজে নিজেই খসে পড়ে। পরে ভেতর থেকে যে কচ্ছপের পিঠের মত অসমান নখ উঠে তাই নিয়ে জীবন কাটাচ্ছি। প্রায় তিন কুড়ি বছর তো পার হয়ে গেল। কিন্তু নখের দিকে তাকালেই ঠাকুরমা ও অনিরুদ্ধ দাদার কথা মনে পড়ে। আজ এমন চিকিৎসার কথা শুনে কি লোকে বিশ্বাস করবেন?

ঠাকুরমা চোখে দেখতে না পারলেও উঠান দিয়ে কে হেঁটে যাচ্ছে তা বুঝতে পারতেন, সেই পল্লীগ্রামের জুতাহীন পদস্পর্শ সে মাটিতে যত কম শব্দই তুলুক। মনু কি বাজারে যাচ্ছ? কিরে করীম, আজকাল তো এদিক দিয়ে আসা যাওয়া তোর বন্ধই হয়ে গেছে, ব্যাপার কি? নবদ্বীপ নাকি। আজ সন্ধ্যায় একবার আসিস। কিছু কাজ করতে হবে! ছোট বৌ? কাল সকালে এসো, ক'টা সুপারী নিয়ে যেও। এসব কথায় উদ্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে কেউ আশ্চর্য হয়ে বলে উঠতেন না, 'ওমা, আপনি বুঝলেন কেমন করে আমি যাচ্ছি? আপনি তো দেখতে পান না!' তারা জানতেন আমার ঠাকুরমার দৃষ্টিহীনতা তাঁর সৃষ্টিকর্তা অতি সচেতন শ্রুতিক্ষমতা দিয়ে কম্পেনসেট করেছিলেন। সুতরাং সকলেই ঠাকুরমার কথার যথাযথ উত্তর দিতেন। অপরিচিত কেউ গেলে ঠাকুরমা আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতেন কে যাচ্ছে। আমি বলতাম।

ঠাকুরমার একটা কাজ ছিল সময়ের খবর নেওয়া, অর্থাৎ বেলা কতটা হলো বা সূর্যদেব ঘরে যাবার কতটা বিলম্ব আছে তার খবর নেয়া। ঘড়ি তখনো ঘরে ঘরে আসেনি। তাই মানুষের ভাষায় 'কটা বাজে?' বলা শুরু হয়নি। অতএব ঠাকুরমা বলতেন, 'ভাই দেখতো কাঁঠাল গাছের ছায়াটা এখন উঠানের কোথায় পড়েছে? কাঁঠাল গাছের ছায়ার অবস্থান শুনেই ঠাকুরমা বুঝতে পারতেন ক'টা বাজে। এটা ছিল তার সূর্য ঘড়ি। কাঠাল গাছ বড় হচ্ছে, ঋতু বদলাচ্ছে, আমার মত শিশুর ভাষা ক্ষমতা ছায়ার অবস্থান বুঝাবার ব্যাপারে ইনএডিকুয়েট, এসব নিয়ে ঠাকুরমা

মাথা ঘামাতেন না। সময় জানা মানুষের একটা শখ। সকলেই সময় জানতে চায়। তাই এই চাওয়ার জন্য কোন কারণ লাগে না। একটা গল্প মনে পড়ছে। বলে ফেলি?

একজন লোকের একটা ঘড়ি ছিল। ঘড়িটার ঘণ্টার কাঁটাটা কেমন করে জানি খুলে গিয়ে কিনারায় আটকেছিল। ঘড়িটা চলতো তবু। চলতো মানে বেচারা মিনিটের কাঁটা একাকী তার কর্তব্য করে যাচ্ছিল। লোকটি ঘড়িটা তবু পরতো। অনেকে এই বিষাদময় ঘটনাটিকে কৌতুক মনে করতো। মানুষের যা স্বভাব, অন্যকে কষ্ট দিতে পারলে আনন্দ পায়? সেই জন্য তারা লোকটিকে প্রায়শই জিজ্ঞাসা করতো ক'টা বাজে?' লোকটিও ধীরে সুস্থে কব্জি তুলে, ভাল করে ঘড়ি দেখে বলতো, 'সাত চল্লিশ, পনেরো বা পঁচিশ।' বেয়ারা জিজ্ঞাসু আবার বলতো, 'ক'টা বেজে?' এক কাঁটা চলা ঘড়ির মালিক সাড়ম্বরে সপ্রতিভভাবে উত্তর দিতেন, 'সেটুকুও যদি বুঝবার ক্ষমতা তোমার না থাকে তাহলে তোমার আর সময় জেনে কাজ নেই।' কাজ থাকুক আর নাই থাকুক মানুষ সময় জানতে চায়।

Alexander Pope এর লিখিত Essay on Criticism একটি পদ্যে লেখা প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে প্রথম দুটি ছত্র এই রকম—

It is with our watches as with our wit, none
Goes alike, yet each believes his own.

অর্থাৎ, এমন দুজন মানুষ পাবে না সংসার খুঁজে
যাঁদের ঘড়ি এক সময় দেয়
যাঁদের বুদ্ধি এক উপদেশ নেয়
সবাই চলে সংসারে নির্ভর করে নিজে নিজে।

একবার নাকি কোন অচিন দেশের রাজধানী নিশ্চিন্তপুরে রাজা রাজচন্দ্র খুব রেগে গিয়েছিলেন যার যার ইচ্ছে মত চলা ঘড়িগুলোর উপর। ঘড়িগুলোতে একটু আগে পরে রাত বারোটা বাজে। ফলে পাঁচ মিনিট ধরে চারদিকে ঢং ঢং করতে থাকে। রাজা রাজচন্দ্র ঘুমাতে পারেন না। তিনি আদেশ দিলেন সব ঘড়ির এক সাথে বাজতে হবে। আদেশ তো রাজার। কে অমান্য করবে? কার ঘাড়ে ক'টা মাথা? ফলে অঘটন ঘটে গেল। পরদিন রাতে যখন বারোটা বাজলো, সব ঘড়িওয়ালারা এক সঙ্গে ঘণ্টা বাজালো, তখন মনে হলো বুঝি ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত সব হচ্ছে। রাজধানীর সব নাগরিক মধ্যরাতে আতঙ্কে চিৎকার করে রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। রাজা পরদিন আদেশ বদলে দিলেন। ঘড়িরা আগের মত চলুক। 'রাজার আদেশ এত তাড়াতাড়ি বদলায় না' বলতে পারেন অনেকে। কিন্তু তা ঠিক নয়। রাজারা ও ডিক্টেটাররা যত খুশি আদেশ দিতে পারেন ও বদলাতে পারেন। আমার এখন আয়ুব খানের কথা মনে পড়ছে। পাকিস্তানের এই ডিক্টেটারটির ডেজিগনেশন ছিল CMLA, যার অর্থ Chief Martial Law Administrator. কিন্তু তিনি এত ঘন ঘন আদেশ জারি করতেন ও এত ঘন ঘন তা পরিবর্তন করতেন যে রসিক পাকিস্তানীরা সি এম এল এ কে বলতেন Cancel My Last Announcement।

গ্রীনিচে মেইজ হিল এ একটি চূড়ায় আছে observatory এবং planetorium. টিকিটের

ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু এখানে কেবল টিকিটই লাগে, পয়সা দিতে হয় না। ভিতরের উঠানে একটি ধাতুর পাত ফেলা আছে। এটির পূব দিকটা পূর্ব গোলার্দ্ধ (Eastern Hemisphere) ও পশ্চিম দিকটা পশ্চিম গোলার্দ্ধ (Western Hemisphere)। এখানে এসে এক সাধারণ মানুষ এক পা পূর্ব ও অন্য পা পশ্চিম গোলার্দ্ধে দিয়ে দাঁড়াতে পারেন। আমরাও দাঁড়ালাম। ভাবলাম কত দিন ধরে কত মানুষ এখানে দাঁড়িয়ে গেছেন। সেই কবে ১৪২৩ সালে গ্লস্টারের ডিউক মারফি এখানে একটা অবজারভেটরি করেছিলেন। পরে রাজা তাকে এই জায়গাটা ছেড়ে দিতে বলেন। লন্ডনের কাছে এমন উঁচু জায়গা তো আর নেই; সেইজন্য। বর্তমান অবজারভেটরি ভবনটি সপ্তদশ শতকের।

একজন পরিব্রাজক সন্ন্যাসী একবার আমাদের অধ্যাত্ম বিজ্ঞান পরিষদে এসেছিলেন। বিভিন্ন কথা বার্তার পর আমরা তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম তাঁর জীবনের কোন একটা গল্প বলতে। তিনি বলেছিলেন। গ্রীনিচে প্রাইম মেরিডিয়ানে দাঁড়িয়ে সেই গল্পটা মনে পড়ে গেল। গল্পটা এখানে প্রাসঙ্গিকও বটে। সন্ন্যাসীর বয়স তখন কম। তাঁর স্বভাব একটু একগুঁয়ে। যা করতে চান করে ছাড়েন। যেমন সন্ন্যাসী হওয়া। পড়াশোনা যখন তাঁর শেষ হলো, যখন মা বাবা তার চাকরি করে গৃহস্থ হবার স্বপ্ন দেখছেন তখন তিনি সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন। সন্ন্যাসী হয়েও তিনি পরিব্রাজকের জীবন বেছে নিলেন। একবার তার গুরু প্রণাম মন্ত্রের মর্ম উদ্ধারের প্রতি নজর গেল। অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

অখণ্ড মণ্ডল আকার মহাবিশ্ব চরাচর।
সর্ব স্থানে ব্যাপ্ত হয়ে আছে অস্তিত্ব সদা যাঁর ॥
তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন আমারে করান যিনি।
সেই গুরুদেবে আমি পরম শ্রদ্ধায় প্রণমি ॥

সন্ন্যাসী এই মন্ত্র উচ্চারণ করলেই তাঁর মনে একটি প্রশ্ন জাগে, 'সর্ব স্থানে ব্যাপ্ত হয়ে আছে অস্তিত্ব সদা যাঁর, তাঁর শ্রীচরণ' আছে কোথায়? যত বার মন্ত্র, তত বার প্রশ্ন, সন্ন্যাসী অস্থির, চঞ্চল জিজ্ঞাসু। কে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দেবে? তিনি ঘুরে বেড়ান। কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করেন না। বস্তুত জিজ্ঞাসা করবার মত মানুষ তাঁর নজরে পড়ে না। সেই অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়াবার সময়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে তিনি দিল্লী চলে এলেন। সেখানেও হাঁটতে হাঁটতে একদিন আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমের কাছাকাছি পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। মায়ের সঙ্গে এই সন্ন্যাসীর পরিচয় ছিল। আজ তাঁর মনে হল মা-কে এই প্রশ্ন করা যায়। তিনি উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু মা এখন দিল্লীতে আছেন কি? তাঁর তো কত জায়গায় কত আশ্রম। সর্বত্রই যান। এখন তিনি কোথায়? তবে দেখাই যাক না কেন? থাকতেও তো পারেন। সুতরাং গেলেন। গেটে একজনকে জিজ্ঞাসা করাতে জানতে পারলেন যে মা আছেন। তাঁর ঘরেই আছেন। একটু পরেই দেখা করতে পারবেন। এখন ক'জন গণ্যমান্য ভক্তের সঙ্গে বসেছেন। পাশে গাছে দু'টো জবা ফুটে আছে। সন্ন্যাসী ফুল দুটো তুলে নিলেন। মায়ের পায়ে দেবেন। তিনি মায়ের ঘরের দিকে গেলেন। কিন্তু দুয়ারে সন্ন্যাসী প্রহরী। তিনি যেতে দেবেন না। আস্তে বললেন, একটু পরে। এখন নয়। সন্ন্যাসী এসব বাধায় অভ্যস্ত নহেন। তিনি চোখ রাঙিয়ে ত্রিশুল তুললেন। দুয়ারী ভয়ে সরে গেলেন। দরজা ঠেলা দিতেই খুলে গেল। সারা ঘরে ভক্তগণ

বসা। মা দূরের দিকে আসনে আসীনা। মা স্মিত মুখে বললেন, বসো। সন্ন্যাসী বসে পড়লেন। মা বললেন, 'ফুল দুটো সামনে রাখ, প্রণাম কর।' সন্ন্যাসী তাই করলেন। মা বললেন, 'যেখানে ফুল দুটো রেখেছ, প্রণাম করেছ, তৎপদং ওখানেই।' সন্ন্যাসীর মুখে হাসি, চোখে জল। তিনি তাঁর প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন, কিন্তু তিনি প্রশ্ন করেন নি, করতে হয় নি।

হ্যাঁ। ঈশ্বরের পদ সর্বত্রই। ঈশ্বর নিজেই বলেছেন,—

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ গীতা (১৩-১৩)

অখণ্ড মণ্ডলাকার ব্রহ্মাণ্ডের মত গোলাকার এই পৃথিবীও। তৎ পদং এর মত এই প্রাইম মেরিডিয়ানও যে-কোন স্থানেই স্থাপন করা যেত। তবে করা হয়েছে এখানে, ব্রিটেনে, ইংল্যান্ডে, লন্ডন শহরের গ্রীনিচ বরোয়, মেইজ হিলের এই চূড়ায়, যেখানে এখন (১৬.০০ ঘ. সেপ্টেম্বর ১৩, ২০০৩) আমি আমার সঙ্গিনী বেলা, পুত্র প্রসুন ও বধূমাতা মুদিতা দাঁড়িয়ে আছি। এখানে ভীড় নেই, তবু শ' ছয়েক লোক আছেন। পটাপট ছবি উঠছে।

ভিতরে এই ছোট তিন তলা বাড়িটির কক্ষে কক্ষে দ্রষ্টব্য। এখানে সময়ের পিছনে কে কত গবেষণা করেছেন, কত সময় ব্যয় করেছেন সব দেখা যাচ্ছে। আমার ঠাকুরমার অন্ধ হয়েও সময় জানার আগ্রহ, অনিরুদ্ধ দাদার ব্রাহ্ম মুহূর্তের কাশি, আমাদের কাঁঠাল গাছটার ছায়া এখন কোথায় পড়েছে, এসব কথা আমার মনের পর্দায় উঁকিঝুকি মারছে। আমার সামনে আমি কম্পাস, পেন্ডুলাম ও ঘড়ির বিবর্তন দেখছি। সব পুরানো জিনিস এরা ঝকঝকে নতুন করে রেখে দিয়েছেন। এখানে স্যার আইজাক নিউটন, ক্যাপ্টেন কুক, গালিলির গ্যালিলিওর কথা লেখা আছে। টেলিস্কোপ কোথা থেকে কোথায় এসে পৌছেছে সেসব দেখতে পাচ্ছি। ওখানে রাখা আছে ১৭৩৯-এ তৈরি স্যার রিচার্ড হ্যারিসনের লঙ্গিচিউড ঘড়ি। এটি সম্ভবত জগতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘড়ি। ঐ বলটা ১৮৩৩ সাল থেকে প্রতিদিন অপরাহ্ন একটায় পড়ে যে শব্দ ছড়াচ্ছে তা' শুনে টেমস নদীতে ভাসমান জাহাজগুলির নাবিকগণ ঘড়ি ঠিক করতেন। এখন আর করতে হয় না। ঐ অষ্টকোণ ঘরটায় যে ঘড়িটা চলছে ওটা তৈরি করেছিলেন টম্পকিন। এটা প্রথম রাজকীয় জ্যোতির্বিদ জন ফ্লামস্টিড ব্যবহার করতেন। ঘড়ি তো এখন হাতে হাতে। কিন্তু ঘড়ি কব্জিতে গেছেতো সেদিন। আগে থাকতো পকেটে। মহাযুদ্ধের সময় মার্কিন সামরিক অফিসারগণ হাতের কব্জিতে ঘড়ি পরতে আরম্ভ করেন। পরে তাদের দেখাদেখি অন্যেরা।

গ্রীনিচে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্য 'কুইনস্ হাউস'। ঐতিহাসিক বাড়ি এটি। রাজা অষ্টম হেনরি এই বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। এই বাড়িতে তার তিন তিনটি বিয়ে হয়; বাকি তিনটি অন্যত্র হয়েছিল। বাড়ির সামনে দীর্ঘ বারান্দায় সারি সারি থাম। পালাডিয়ান শৈলীর এসব নিদর্শন সারা ইংল্যান্ডে আর নেই। পাশেই মেরিটাইম মিউজিয়াম। এই ন্যাশনাল মেরিটাইম মিউজিয়ামটি সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় এই জাতের সংগ্রহশালা। এর সংগ্রহে আছে বিশ লক্ষ সংরক্ষিত বস্তু। বিশটি গ্যালারিতে কত বিস্ময়কর বস্তুই যে রাখা হয়েছে এখানে। সমুদ্র, জাহাজ ও নৌবিদ্যা সম্পর্কিত সমস্ত বস্তুই আছে এখানে। দেখুন প্রাণভরে। তবে যদি গাড়ি নিয়ে এসে থাকেন তবে সাবধান থাকবেন, মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখবেন। সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে না তো গাড়ি রাখার?

বেরিয়ে আসা গেল। এবার খাওয়ার জায়গা খুঁজতে হয়। খাবার জায়গা তো কতই বসে আছে দরজা খুলে। সেটা কোন সমস্যা নয়। সমস্যা হচ্ছে গাড়ি রাখার। কোথায় গাড়ি রেখে খেতে যাওয়া হবে। সর্বত্র ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই। সাতাশটি মিনিট ইতস্তত ঘুরে ঘুরে তবে জায়গা একটা পাওয়া গেল। আবার দেখি ম্যাকডোনাল্ডস্ জুটেছে আমাদের। গাড়ি রেখে ভিতরে যাওয়া গেল। নীচে জায়গা নেই। গেলাম উপরে। ক'টি কালো কচি কাঁচা এত গোলমাল করছে যে বড় বিরক্ত লাগছে। অনেকক্ষণ পরে প্রসূন মুদিতা উঠে এলো খাবার নিয়ে। জনে জনে একটি করে বার্গার, চার গ্লাস কোলা। দু'প্যাকেট আলু ভাজা এবং দু'টি ছোট টমাটো কেচাপ। দক্ষিণা সাড়ে দশ পাউন্ড, অর্থাৎ আটশো বিশ টাকা। স্বদেশে এমন বহু ব্যক্তি আছেন যাদের একজন এই চারজনের খাবার খেলেও পেট ভরবে না। তবে আমাদের দুপুরের খাবার এইই যথেষ্ট। আমাদের খাওয়া শেষ হতে হতেই দেখি অনেকে উঠে আসছেন। তাদের হাতে নানা বর্ণের টুপি, মালা, ইত্যাদি। যে বাচ্চাগুলি অকারণ পুলকে গোলমাল করে বিরক্তি উৎপাদন করছিল তাদের কারো জন্মদিনের পার্টি হবে এখানে। মনে মনে বলি, বেঁচে থাক বাঁছাধন, দীর্ঘায়ু হও, মা বাপের আনন্দ বর্দ্ধন করে। পরক্ষণেই মনে মনেই বলি, ধেত্তেরি, মা বাপের আনন্দ বর্দ্ধন করবে কে? পাখির বাচ্চা যেমন পাখা গজালেই উড়ে যায়, মা বাপের খবর রাখে না, মানুষের বাচ্চাও এদেশে গোঁফ গজালেই বা তারও আগেই উড়ে যায়, নিজের বাসা বাঁধে। বাপ মায়ের খবর মনে হয় রাখে না! মনে পড়ে বাণী বৌদির কথা। কৃষ্ণ কিশোরদার স্ত্রী, বাণী বৌদি। বড় ছেলেটি বড় দুষ্ট হয়েছিল; নষ্টামির আর শেষ নেই। একদিন এসে আমার মায়ের কাছে দুঃখ করে ছেলের নষ্টামির কথা বলছিলেন। আমার মা ভাল মানুষ। বৌদিকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'দুঃখ করো না বৌমা। দুষ্ট ছেলেরা বড় হলে খুব শান্ত ও ভদ্র হয়ে যায়।' বৌদিও খুব শান্ত মানুষ ছিলেন। সেদিন বোধ হয় জ্বালা বেশি হয়েছিল, ঝামটা দিয়ে বলে উঠেছিলেন, 'রাখেন তো মাসিমা। বড় হলে শান্ত হয়। তাতে আমার কি? ভাল হলে হবে তার বৌয়ের জন্য, আমার তো জ্বলতে জ্বলতেই দিন যাবে।' কথা সত্য। শুভ্র এখন শান্ত, ভদ্র, ভব্য একজন লোক। তবে দূরে থাকলেও বাপ মায়ের খোঁজ রাখে বটে। প্রার্থনা করি কৃষ্ণদা ও বাণী বৌদি শান্তিতে থাকুন।

ইপ্সউইচ থেকে আসার সময় আমরা ব্ল্যাক ওয়াল টানেল দিয়ে, অর্থাৎ টেমস নদীর তলা দিয়ে নদীপার হয়ে এসেছিলাম। আমাদের ছোটবেলায় টেমস নদীর তলবর্ত্ম নামে এই পথটি পৃথিবীর অষ্ট আশ্চর্যের অন্যতম একটি ছিল। কিন্তু বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যায় মানুষ গত পঞ্চাশ বছরে অনেক এগিয়ে গেছে। ইংলিশ চ্যানেলের তলা দিয়ে টানেল তৈরি হয়েছে। তাই টেমস টানেলের আর আশ্চর্য পদ নেই। যা হোক ছোটবেলায় যা পড়েছিলাম আজ তার ভিতর দিয়ে ছেলের গাড়িতে বসে পাড়ি দিলাম সেটাও তো কম কথা নয়! কিন্তু টানেল দিয়ে যাওয়া হলে দেখা হয় না কিছুই। তাই গাড়ি লন্ডনের দিকে মুখ ফেরাতেই ছেলেকে বললাম টানেল দিয়ে যেওনা, কোন একটা ব্রীজ পার হয়ে চল। ছেলে রাজি হয়ে গেল। আমরা আসার সময় মিলেনিয়াম ডোম পাশে রেখে এসেছি, লন্ডন'স আই দেখে এসেছি। এবারো সেভাবেই গিয়ে টাওয়ার ব্রীজে গেলাম। গতবারও এই ব্রীজে এসেছিলাম। তখন শ্রীমান শান্তনুর সঙ্গে হেটে এই ব্রীজ পারাপার করেছি। সেকথা মনে পড়লো। লন্ডনের

অধিকাংশ ছবিতে এই টাওয়ার ব্রীজ থাকে। আজ ছেলের গাড়িতে বসে আবার ব্রীজ পার হলাম। কিন্তু ব্রীজে এবং ব্রীজের দু'মাথায় গিস গিস করছে পদযাত্রী। একটা সুতোয় বাঁধা এরোপ্লেন আকৃতির সাদা বড় বেলুন উড়ছে! তাতে নীল রঙয়ে লেখা ডেভিড ব্লেইন। রাজার মনে পড়লো লোকটির কথা। ওর কথা শুনেছে সে। লাতিন আমেরিকার এক পাগলপানা ম্যাজিশিয়ান। অদ্ভুত খেয়াল চাপে তার মনে। একবার নিউইয়র্কে একটা ত্রিশ ইঞ্চি ব্যাসের অনেক উঁচু থামের উপর দাঁড়িয়ে দু'দিন কাটিয়ে দিয়েছিল। এবার লন্ডনে এসেছে টেমস নদীর পাড়ে, টাওয়ার ব্রীজের কাছে একটা ৮'x৪'x৫' কাচের বাক্সে তাকে বসিয়ে একটা ক্রেনের মাথায় তাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে ওটায় চল্লিশ দিন থাকবে। ক্ষুধা তৃষ্ণা বা প্রকৃতির ডাক কোনটাই সে মানবে না। হাজারে হাজারে মানুষ প্রতিদিন তাকে দেখতে আসছে। তবে আমি তাকে পাগলপানা বললেও সে পাগল নয়। এই যে জীবন পণ করে বাজি রেখেছে চল্লিশ দিন ঐ কাচের খাঁচায় থাকবে, যদি এতে সে কৃতকার্য হয় তবে নাকি সে পাঁচ মিলিয়ন পাউন্ড পাবে। পাঁচ মিলিয়ন পাউন্ড, মানে উনচচলিশ কোটি টাকা।

এত লোক ওকে দেখছে। খাঁচায় বসে সে বোধ হয় এগার দিন কাটিয়ে দিয়েছে এরই মধ্যে। আমাদের এত কাছে এসে কেবল ব্রীজের উপর দিয়ে চলে গেলে চলে? তবে খোঁজ জায়গা। মুদিতার উইলিজ কোম্পানির দশ নম্বর ট্রিনিটি স্কোয়ার বাড়ির কিনার দিয়ে তিন চক্কর দেওয়া হল, পার্কিং এর জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। এক ভদ্রলোক বোধ হয় লক্ষ্য করেছিলেন আমাদের গাড়ি। তৃতীয় চক্করের সময় তিনি হাত দেখিয়ে গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন আমরা পার্কিং এর জায়গা খুঁজছি কিনা। হ্যাঁ শুনে তিনি ডিরেকশান দিয়ে দিলেন কোথায় জায়গা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। গিয়ে পেয়ে গেলাম। নাম না জানা ঐ ইংরেজকে উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জানান হল। গাড়ি রেখে হেঁটে টাওয়ার ব্রীজ পার হয়ে ওপারে গিয়ে রামঠাকুর সঙঘের পূজা দেখার মত ধাক্কা-ধাক্কি করে কাছে যাওয়া। কাছে কোথায়? ডেভিড ব্লেইন তো দেড়শো ফুট উপরে কাচের খাঁচায় আকাশ প্রদীপ হয়ে আছে। এগারো দিন হলেও তাকত আছে এখনো। মাঝে মাঝে উঠে দাঁড়াছে, বসছে, মাঝে মাঝে হাত নেড়ে উৎসাহী দর্শকদের হাত নেড়ে অভিনন্দন জানানোর জবাব দিছে। পারবে মনে হয় সে কোটি পতি হতে। হোক। আমরা শুভেচ্ছা জানাই। জায়গাটা বঙ্গভূমি হয়ে গেছে। মেলা বসে গেছে খাবারের পানীয়ের ও অন্যান্য বিচিত্র পসরার। মাঝে মধ্যে বাংলা কথা শোনা যাচ্ছে। তবে বাঙালি তো, বাংলা কথায় ইংরেজির নুন-ঝাল মেশাতে ভুলছে না। শুনলাম এক তরুণ তার পার্শ্ববর্তিনীকে বেশ গম্ভীরভাবে বলছে, প্রোব্লেমটা হচ্ছে এই যে.........। বাকিটা কানে আসেনি।

এই ডেভিড ব্লেইন একটি অসামান্য চরিত্র। একটা চমকপ্রদ কিছু করার প্রবণতা ও ক্ষমতা দুটোই যে ওর আছে সে কথা ইনি প্রমাণ করেছেন বারম্বার। তার কথা শুনলে মানুষ হা করে থাকে। মুখের হা-টা বুজাতে ভুলে যায়। পাশচাত্যে মানুষের অর্থের অভাব নেই বলে ব্লেইনএর মত মানুষের প্রায়-পাগলামো খেয়ালে মদত দেওয়ার মানুষ ও অর্থ জুটে যায়। অনেক অদ্ভুত কাহিনীর নায়ক ডেভিড ব্লেইন। বাঙালি পাঠকের জন্য ক'টি এখানে দিলে তাঁদের ভাল লাগতে পারে মনে করে ক'টি এখানে দিলাম।

বছর কয়েক আগের কথা। ব্লেইন ঠিক করলেন তিনি একটা ত্রিশ ইঞ্চি ব্যাসের দশ

তলা সমান উঁচু থামে দাঁড়িয়ে থাকবেন ছত্রিশ ঘন্টা। খাওয়া ঘুমানো বা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওরার তো প্রশ্নই উঠে না। ঐ রকম জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিলে সাধারণ মানুষের দশ জনের মধ্যে আট জন তৎক্ষণাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হবেন। জুটে গেল সব ব্যবস্থা করার লোক ও অর্থ। ডেভিড সেই থামের উপর দাঁড়িয়ে ছত্রিশ ঘণ্টা কাটালেন। লক্ষ লক্ষ লোক তাকে দেখে গেল। নিউইয়র্ক শহরে যানজট হলো তাঁর জন্য। নামবার সময় আরেক বায়নাক্কা। তিনি লাফিয়ে পড়বেন। কাগজের কার্টন, অর্থাৎ টিভি, ফ্রিজ, ইত্যাদি যেমন বাক্সে বাজারজাত করা হয় সেই রকম খালি বাক্স সাজিয়ে একতলা সমান উঁচু করা হয়। আরো নয়তলা উঁচু থাম থেকে তিনি লাফিয়ে পড়লেন। বাক্স গুড়িয়ে গেল। তাঁর হাড়গোড়ও গুড়ালো ক' জায়গায়। মাস দেড়েক হাসপাতালে থেকে সুস্থ হয়ে বেরুলেন ডেভিড ব্লেইন।

আরেক বার নিউইয়র্কেই বরফের মধ্যে কাটালেন তিন দিন। আলাস্কা থেকে স্বচ্ছ বরফ এসেছিল তার জন্য। তাতে বাইরে থেকে তাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। সব দিকে বরফ। তার মধ্যে শায়িত থাকলেন ডেভিড ব্লেইন তিন দিন। দিবা রাত্র মানুষ লাইন দিয়ে তাকে দেখে গেছে। তিন দিন পরে তাকে এই বরফের কবর থেকে বার করা হয়। পনেরো দিন লেগে যায় অসাড় হাত পা সাড় ফিরে পেয়ে স্বাভাবিক হতে। বুঝুন কাণ্ড! এরকম মানুষকে স্বাভাবিক বলবো? পাগল বলবো, না অতি-মানুষ বলবো?

রাস্তা দিয়ে হেটে যাচ্ছেন এক মহিলা। বেশ বড় লোক বলেই মনে হয়। হাতে আংটি। সোনার আংটিতে ইয়া বড়া হীরা। আলাপ করে মহিলার হাতে চুমু খেলেন। বিদেশে এসব আকছার হয়। আধুনিক ইংরেজিতে 'সতী' বলে কোন শব্দ নেই ওটি কেবল অভিধানে আছে। কিন্তু এখানে ব্যাপার অন্য। চুমুর সঙ্গে হীরের আংটির হীরে ডেভিড ব্লেইনের মুখে চলে গেল। তিনি বদন ব্যাদান করে দেখালেন তা। তারপরে পেটে চালান করে দিলেন। অপরিচিতা মহিলার কি অবস্থা! ক্রোধ? কান্না? না পুলিশ ডাকা? কিছুই করতে হলো না। ডেভিড ব্লেইন তার চোখ থেকে হীরে বার করে মহিলাকে দিলেন। অবাক মহিলা ভয়ে ভয়ে সড়ে পড়লেন।

আরেক মহিলার আংটিটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে ব্লেইনের। দেখতে চান সেটি। মহিলা হাত তুলে দেখান। ব্লেইন আংটিটি খুলেন কিন্তু হঠাৎ সেটি রাস্তায় পড়ে যায় এবং দেখতে দেখতে গড়িয়ে হাইড্রেন্ট-এ পড়ে যায়। এদিক সেদিক অনেক খুঁজে ব্লেইন একটি খালি পড়ে থাকা বোতল তুলে নিয়ে আসেন। ভিতরে দেখা যায় মহিলার আংটি। কিন্তু বোতলের মুখ এত ছোট যে আংটি বেরোয় না। বোতল ভেঙ্গে আংটি বের করে মহিলাকে দেওয়া হল। রাস্তার লোকেরা দাঁড়িয়ে বিনা টিকিটে ম্যাজিক দেখলো।

রেস্তঁরায় বসে দুজনে বিয়ার খাচ্ছে। টিন খালি। ব্লেইন এসে খালি টিন ধরতেই টিন ভর্তি। সে খেল, টিন খালি। টেবিলে রাখলো। আবার ছুঁতেই ভর্তি। অবাক দুটি বন্ধুকে ভর্তি করা বিয়ারের টিন উপহার দিয়ে ব্লেইন চলে যায়।

তাসের প্যাকেট। একটা তাস তুলে নিল। দেখালো কি তাস। প্যাকেটেই রাখা হলো আবার। কিন্তু তাসটা আব পাওয়া যায় না। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে ক'জন। এক জনের হাতে রাগবির বল একটা। চেয়ে নিয়ে কাটা হল সেই বল। ভিতরে পাওয়া গেল হারিয়ে যাওয়া ঐ তাসটি। হাত সাফাই? দিনের বেলায় পথের লোক সব হিপনোটাইজড? হবে একটা কিছু। আমরা জানি না।

স্কুল থেকে বাড়ি যাচ্ছে বছর দশেকের এক বালক। পিঠে তার স্কুল ব্যাগ। সে সাপকে বড় ভয় পায়। ব্লেইন তাকে নিয়ে যায় কাছের একটা pet shop-এ। একটা সবুজ রঙের লিক লিকে সাপ কিনে দোকান থেকে। ধীরে ধীরে লম্বা সাপটা ঢুকে যায় মুখ দিয়ে ব্লেইন এর পেটে। অর্থাৎ সে খেয়ে ফেলে সাপটাকে। অবাক বিস্ময়ে ছেলেটি সব দেখে। কিন্তু অবাক হওয়ার তখনো বাকি। সাপ বেরোয় বালকটির ব্যাগ থেকে। একটা লাভ হয়। বালকটির সর্পভয় কেটে যায়।

রেস্তঁরায় বসে খাচ্ছে লোক। ব্লেইন এসে দাঁড়ালো। বললো, 'সবাই ঐ গ্লাসটায় mind concentrate করো। সবাই করলেন। ত্রিশ সেকেন্ডে গ্লাসটা ফেটে গেল। কোনো ম্যাজিশিয়ানের স্টেজে নয়। রেস্তঁরায়। এরই নাম ডেভিড ব্লেইন। দ্য গ্রেটেস্ট লিভিঙ ম্যাজিশিয়ান অব দ্য ওয়ার্ল্ড।

রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে এক জোড়া যুবক যুবতী। ব্লেইন জিজ্ঞেস করে, মেয়েটি তোমার কে? 'গার্ল ফ্রেন্ড'। সপ্রতিভ উত্তর ছেলেটির। ব্লেইন ছেলেটির হাতে একটি চাবি দিয়ে বলে এটি ব্লেইন এর পেটের উপর ঘষ্টাতে। ঘষ্টাতেই শার্ট পুড়ে যায়। নীচে দেখা যায় মেয়েটির ছবি টাট্টু করা ব্লেইনের পেটে। কার গার্ল ফ্রেন্ড ঐ মেয়েটি?

জহুরীর দোকানের সামনে। বন্ধ কাচের জানালা। এক মহিলার হাতের ঘড়ি খুলে নিল ব্লেইন। অদৃশ্য হয়ে যায় ঘড়ি। দেখা যায় কাচের ভিতরে ঐ ঘড়িটি। একটা পত্রিকা দিয়ে ঘড়িটা ঢেকে পত্রিকার তলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ঘড়ি বার করে আনে ব্লেইন। পত্রিকা তুলে নিলে দেখা যায় কাচ অক্ষত।

ভিখারি ভিক্ষা চায়। পিছনেই লটারীর টিকিটের দোকান। স্ক্র্যাচ লটারী। ব্লেইন ভিখারিকে একটা লটারীর টিকিট কিনে দেয় এক ডলার দিয়ে। শিখিয়ে দেয় স্ক্র্যাচ করতে। ভিখারি ষোলশ' ডলার পেয়ে যায়। টাকা নিয়ে ট্যাক্সি চড়ে বাড়ি যায় ভিখারি।

'আপনারা বাঙালি?' বলে স্মিত মুখে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। আমরা ডেভিড ব্লেইন ও তার উৎসাহী দর্শকবৃন্দকে ফেলে টাওয়ার ব্রীজের উপর দিয়ে হেটে বাঁদিকে নেমে টাওয়ার হিল নামক আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশনের পাশে সূর্য ঘড়ির উপরে দাঁড়িয়ে লন্ডন টাওয়ারের ছবি তুলেছি। টেমস নদীর জল গতবারও কত পরিষ্কার ছিল এবার কি নোংরা এসব বলাবলি করছি। টাওয়ার শপ ছাড়িয়ে ওদিকের গেট দিয়ে বেরিয়ে রেখে আসা গাড়ির দিকে যাচ্ছি। হঠাৎ এই বাঙালি প্রশ্ন। দাঁড়িয়ে কথা বলা হল। প্রশ্নকর্তা ডঃ বিজন সিংহ মজুমদার। কলকাতার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিটের অধ্যাপক। বিদ্যা বিতরণ বিষয়ক বিদেশ বাস হচ্ছে মাস তিনেক ধরে। এখন আছেন ইউনিভার্সিটি কলেজ অব লন্ডনের অতিথি শালায়। শেষ হয়ে এসেছে প্রবাস। পরশু দিনই উড়ান দেবেন দেশের উদ্দেশ্যে। আমার স্ত্রীর শাড়ি শাঁখা ইনডেলিব্‌ল্ বেঙ্গলি মার্ক। তাই প্রশ্নটা বাঙলায়ই করে ফেলেছিলেন। লন্ডন টাওয়ার দেখতে যাচ্ছেন। কোথায় জানি সেটা। আঙ্গুল তুলে দেখালাম। কিন্তু এখন তো সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। আজ বোধহয় আর দেখা হলো না। এই লন্ডন টাওয়ার নিয়ে একটা কথা বলেছেন মুদিতার বস্। ব্রিটিশ মহিলা। বহু শতাব্দীর পুরানো এই টাওয়ার। কমপক্ষে পঞ্চাশ বছর পরে এবার এতে রঙ করা হয়েছে। মহিলা বলেছেন রঙ করাতে এটি ভাল লাগে না। টাওয়ারের প্রাচীন বনেদিয়ানা নষ্ট হয়ে গেছে। আজীবন শিক্ষক ধুতি পাঞ্জাবী পরা অনিল

বাবু যখন ডেপুটি ডিরেক্টর হয়ে শার্ট গুঁজে প্যান্ট পরা ধরলেন আমাদের ভাল লাগেনি। তিনি কি করবেন! তারই কি ভাল লাগে? চ্যাটার্জী সাহেব বলেছেন প্যান্ট পরতে হবে নইলে কৈলাসহরে বদলী। লন্ডন টাওয়ার যদি কথা বলতে পারতো তাহলে নিশ্চয় এই রঙ করার বিষয়ে প্রতিবাদ করতো। অনভ্যাসের চন্দনের ফোটা কপালে চড়চড় করে। টাওয়ারের গায়ে কি করছে না? বেচারা! সইতে হয় সইছে।

সূর্যদেব চলে গেছেন পাটে। এবার বোধ হয় গাড়ি এবং তার পরে বাড়ি। কিন্তু নাহ্। ওদের আরো কিছু উদ্দেশ্য আছে। ডাইনা বাঁয়া করে গাড়ি আবার থামে। নামো। চলো। ওমা। এ জায়গা তো আমাদের চেনা। ঐটা তো রাজবাড়ির ব্যক্তিগত মিউজিয়াম। ঐ কোনায় গিয়ে বাঁ দিকে ঘুরলেই বাকিংহাম প্যালেস। গেলাম! কিন্তু অন্ধকার হয়ে গেছে। আলো অনেক থাকলেও ছবি তোলার জন্য অপ্রতুল। চলো ফিরেই চলো।

রাজপুত্র বধু ডায়ানার কথা মনে হয়। বিবাহ, দাম্পত্য বন্ধনের শিথিলতা ইত্যাদি কথা মনে ভীড় করে। আজকাল ধনী বৃটিশ পুরুষ ও মহিলারা বিবাহে বিরাগ দেখাচ্ছেন। একত্রে থাকছেন কিন্তু বিবাহে যাচ্ছেন না। বিচ্ছেদে অনেক খরচ। কি দরকার ঝামেলায়। শুনে আমার মহান দেশ ভারতের সর্বাপেক্ষা মহান জাতি হিন্দুর সমাজপতিগণ কানে হাত দেবেন। পবিত্র হিন্দু সমাজে এসব নেই বলবেন। দু'টি গল্প বলি। অনেক কাল আগে স্বাধীন ভারতের একজন সাংসদ বলেছিলেন প্রথম গল্পটি। বিষয় মরালিটি। তাঁর বাল্যকাল কেটেছে বোম্বাই শহরে। তাদের পাড়ায় একটি বড় নবাববাড়ি ছিল। উঁচু প্রাচীর ছিল চারদিকে। শনি থেকে গুরুবার সেই বাড়ি থেকে নুপুরের শব্দ ও সংগীতের আওয়াজ পাওয়া যেত। বাইজি ও বোতলের আগমন হতো। শুক্রবারে সব শুন শান। সেদিন ধর্ম। সাংসদ মহাশয় তখন কিশোর। ভাবতেন বড়লোকের মরালিটির দরকার নেই। তখন ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস স্টেশনে রাতের বেলা কোন ট্রেন প্রায় আসতো না। প্ল্যাটফর্মগুলি গৃহহীন কুলি কামিনদের শয়ন ঘর হয়ে উঠেছিল। ভবিষ্যতের সাংসদ ঐ কিশোর দু'চার জন সমান বুদ্ধিমান বন্ধুসহ প্রায়ই গুড়িমেরে ওদের দেখতে যেতেন। জোড়াগুলি প্রায়ই অন্যরকম দেখতে পেতেন। ভারতের গরিবদের কোন মরালিটি নেই। গল্প বলে তিনি সাংসদদেরকে বলেছিলেন Morality is a fictitious line, rich people are above it, poor people are below it and only the wretched middle class is desperately trying to keep on it.

দ্বিতীয় গল্পটি লেখা। যিনি লিখেছেন তিনি সতের বছর একটি জেলার কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন। শ্রীকান্ত। দ্বিতীয় পর্ব। তৃতীয় পরিচ্ছেদ। "... ব্রাহ্মণ শুনিয়া সে হাতজোড় করিয়া নমস্কার করিল এবং নিজেকে রেঙ্গুনের বিখ্যাত নন্দ মিস্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিল। পাশে একটি বিগত যৌবনা স্থূলাঙ্গী বসিয়া এক দৃষ্টে আমাকে চাহিয়া দেখিতেছিল। আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। মানুষের এত বড় দুটো ভাটার মত চোখ ও এত মোটা জোড়াভুরু আমি পূর্বে কখনও দেখি নাই। নন্দ মিস্ত্রী তাহার পরিচয় দিয়া কহিল বাবু মশায় ইটি আমার পরি—

কথাটা শেষ না হতেই স্ত্রীলোকটি ফোঁস করিয়া গর্জাইয়া উঠিল—পরিবার! আমার সাত পাকের সোয়ামী বলচেন পরিবার। খবরদার বলচি মিস্তিরি, যার-তার কাছে মিছে কথা বলে আমার বদনাম করো না বলে দিচ্ছি।

আমি তো বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম।

নন্দ মিস্ত্রী অপ্রতিভ হইয়া বলিতে লাগিল, আহা! রাগ করিস কেন টগর? পরিবার বলে আর কাকে? বিশ বছর—

টগর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিল, হলোই বা বিশ বছর! পোড়া কপাল! জাত বোষ্টমের মেয়ে আমি, আমি হলাম কৈবর্ত্তের পরিবার! কেন, কিসের দুঃখে? বিশ বছর ঘর করচি বটে, কিন্তু একদিনের তরে হেঁশেলে ঢুকতে দিয়েচি? সেকথা কারও বলবার জো নেই। টগর বোষ্টমী ম'রে যাবে, তবু জাত জন্ম খোয়াবে না—তা জানো? বলিয়া এই জাতবোষ্টমের মেয়ে জাতের গর্বে আমার মুখের পানে চাহিয়া তাহার ভাটার মত চোখ দুটো ঘূর্ণিত করিতে লাগিল।' —শরৎচন্দ্র

Living together, অর্থাৎ এক সঙ্গে খাই দাই, একসাথে থাকি ভাই বিবাহের কাজ কি তাই? এ বিষয়টি পশ্চিমে নতুন হতে পারে। সমাজপতিরা কানে হাত দিতে পারেন, কিন্তু আমার দেশে নতুন নয়। সাক্ষী শরৎচন্দ্র ও তার কোটি কোটি পাঠক পাঠিকা।

ইতিমধ্যে প্রায় পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে দেখতে লন্ডন থেকে ইপ্সউইচ পৌছে গেছি।

জয় রামকৃষ্ণ।

অল্ডবরা সমুদ্র সৈকত

ইপ্সউইচে বাস আমাদের এখন। ছোট, সুন্দর, ছিমছাম পুরানো শহর এটি। রোজ এখানকার নর্থ গেট স্ট্রিটের কাউন্টি লাইব্রেরিতে যাই, পত্রপত্রিকা পড়ি, ছেলের কার্ডে বই আনি। উইক এন্ডে বাড়িতে থাকা হয় না—কোথাও না কোথাও যাওয়া হয়। এই শনিবারে, ২০শে সেপ্টেম্বর ২০০৩-এ কোথায় যাওয়া যাবে? ছেলে বললো, 'চল তোমাদের নিয়ে সী বীচ দেখিয়ে আনি। এখানে বালি নেই। কেবল নুড়ি পাথর।' কিন্তু জায়গা কাছে বলেই এটা ওটা সেটা করতে করতে বিকাল হয়ে গেল। গাড়িতে বসলাম। পথের নিশানা দেখে বুঝলাম আমরা লোয়েসটফ্টের দিকে যাচ্ছি। পড়ন্ত বিকেল, শনিবার, যাচ্ছি সাগর সৈকতের দিকে, তাই রাস্তায় গাড়ী খুব কম। চালকের পক্ষে বড় সুবিধা।

আমরা যখন পৌছলাম তখন সুর্য লাল হয় হয়। সমুদ্র পাড়ে এক সারি সুন্দর বাড়ি, সামনে রাস্তা। দেখলেই পুরীর কথা মনে পড়ে। তবে এটি অনেক ছোট জায়গা। রাস্তার পরে ফুট চারেক উঁচু দেয়াল, দেয়ালের পরে নুড়ি পাথর। দেয়াল থেকে জল পর্যন্ত—দেড়শ দু'শো ফুট এবং ডাইনে বাঁয়ে যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবল নুড়ি আর নুড়ি। লাল, কালো, ধূসর, সাদা, বহুবর্ণ ছোট ছোট পাথর। কোনটা সম্পূর্ণগোল, কোনটা ডিম্বাকৃতি, কোনটা একটু লম্বাটে, আর কোনটা অন্য অন্য আকৃতির। সবই মসৃণ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। হাটতে ঝন ঝন শব্দ হয়। পা ভিতরে ঢুকে যায়। আমরা নুয়ে নুয়ে এক দুটো সুন্দর নুড়ি তুলি এবং যেন আবিষ্কারের আনন্দে একে অপরকে দেখাই। বেলা জলের কাছে গিয়ে বসেন। আমরা তিনজন (আমি প্রসূন ও মুদিতা) হাটতেই থাকি। কিন্তু আশ মিটবার আগেই উঠে পড়তে হয়। সবাই চলে গেছেন। অন্ধকার নেমে গেছে। সমুদ্রও দেখা যাচ্ছে না, কেবল ঢেউয়ের মুখে ফেনা দেখা যাচ্ছে। তাই অতৃপ্তি নিয়েই গাড়িতে বসা গেল। শহরে পৌছে TESCO নামের দোকান থেকে অনেক জিনিস কিনে নিয়ে বাড়ি ফেরা হল।

পরদিন রবিবার। সুতরাং আবার চল অল্ডবরায়। কাল প্রাণভরে দেখা হয় নি, আজ আগে আগে চল। সময় থাকতে চল। তাই হল। সেই কালকের পথ, আজও তো রবিবার, যানবাহন কম, চালকের নির্বাধ আনন্দ। কিন্তু দেখি চালক মহাশয় অল্ডবরা ছাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। বললো, 'আজ একটু ওদিকে যাচ্ছি। ওদিকে ভাল আছে। চল না।' আমরা সম্মতি জানালাম। আমাদেব কি? আমাদের কেবল বসে বসে আনন্দ নেওয়া। গাড়ি চলে চলে যে জায়গায় থামলো সে জায়গাটির নাম অদ্ভুত Thorpeness. গাড়ি রেখে দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকি। বিরাট বড় জলাশয়, অনেক নৌকা, নৌকা বিহার করছেন অনেকে। প্রসূন বললো আমরাও নৌকা বিহারে যাব। চার জনের উপযুক্ত একটি নৌকা নেওয়া হ'ল এগারো পাউন্ড বা সাড়ে আটশো টাকারও বেশি দিয়ে আধ ঘণ্টার জন্য। ভাল লাগলে সময় বাড়ানো যাবে। নৌকায় দুটি দাঁড়। এক জনেরই দুই দাঁড় বাইবার ব্যবস্থা। প্রসূন মুদিতা দুজনে গিয়ে বসলো। কিন্তু দাঁড়তো ওরা কোনদিন ধরেনি। নৌকা একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে ঘুরে যাচ্ছে, ওরা বিবত হাসি হাসছে। আমি চেষ্টা করতে চাইছি, আমাকে দিচ্ছে না। শেষে দিল। ছেলে বেলার

অভ্যাস, দেখি ভুলিনি। বাপ ছেলে নৌকা বাইতে পারলাম। বিশাল জলখণ্ড, মাঝে মাঝে একটা দ্বীপ, তাতে একটা বড় গাছ ও তার চারপাশে আগাছা। কিন্তু জলাশয়ে জল বড় কম, তায় আবার শ্যাওলা। একটু অসতর্ক হয়ে দাঁড় ফেললেই কাদায় লেগে যায়, শ্যাওলা জড়িয়ে যায় দাঁড়ে। কিন্তু তাতে কি? যত ভুল হয়, ততই হাসি, ততই যেন আনন্দ। ওদিকে দেখি তিনটে কামানের মুখ দেখা যায়? হ্যাঁ, কামানই তো! এটা একটা দুর্গ ছিল। এখন এটা জঙ্গলে ঢেকে চুপ চাপ বসে আছে। বিশাল দু'টি শঙ্খশুভ্র রাজহংস শ্যাওলার মধ্য থেকে কি যেন খুঁজে খাচ্ছে। রাজহাঁসের ব্যাপারই আলাদা; ওরা দুধে জলে মিশিয়ে দিলে নাকি দুধটুকু খেতে পারে কেবল। 'হংস যথা ক্ষীরম্ অম্বুমধ্যাৎ।' কালো বিরাট একটি হাঁস, কত বালি হাঁস, সাঁতরাচ্ছে। শত শত হাঁস ও অন্যান্য পাখী আকাশে উড়ছে। আকাশ কোথাও নীল, কোথাও সেই নীল সাদা মেঘে ঢাকা। আমরা ও অন্যান্য অনেকে নৌকা বাইছি। এই এই সামলে। নৌকা ঐ নৌকায় লেগে যেতে পারে। নৌকার সামনের দিকে তো দাঁড়ির পিঠ! মাঝিও নেই। তাই। সামলে চল। না। আর ভাল লাগে না। চল ফিরে যাই। চল্লিশ মিনিট চালিয়ে ফিরে গেলাম। ছেলেটি আর অতিরিক্ত পয়সা চাইলো না। ১৯৫৫ সালে ইতনা ছেড়েছি। তারপরে আর নৌকা বেয়েছি বলে মনে পড়ে না। ২০০৩ সালে অন্ডবরার থর্পনেসে আজ আবার বাইলাম। ভালই লাগলো। কিন্তু গায়ে তো জোর নেই। হাঁপিয়ে উঠি অল্পেতেই।

আবার অন্ডবরায়, সৈকতে; লক্ষ কোটি মসৃণ প্রস্তরখন্ড আচ্ছাদিত সৈকত। বসি আমরা জলের কাছে। প্রসূন গাড়ির বুট থেকে ফুটবল নিয়ে আসে কিন্তু একলা খেলে কি আর আনন্দ পাওয়া যায়? আমাদের কাছে এসেই বসলো। বেলা এখানে খুব বই পড়ছে। আজ তার শরচন্দ্রের 'দেনাপাওনা' শেষ হল। মুদিতা তাকে গল্পটা বলতে বললো। সানন্দেই সে ভৈরবী ষোড়শীর গল্প শোনালো। গল্প শুনতে শুনতে থলে ভর্তি করে আনা কাজু, চীনা বাদাম, পটেটো চিপস্, কোলা সব শেষ হয়ে এলো। অন্ধকারও পড়ে আসছে। এবার ফেরা যাক।

(ভাগ্যিস্ যাওয়া হয়েছিল, নইলে এবার আর হতো না। পরদিনই বৃষ্টি হয় আর তাপমাত্রা তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে যায়। আমাদের মাঘেরও বাড়া। কে যায় সমুদ্রের পাড়ে ঐ ঠাণ্ডায়?)

আমাদের দেশের মত দেশ থেকে যাঁরা ইউরোপে আমেরিকায় বেড়াতে আসেন তাঁদের প্রধান সমস্যা হয়ে যায় অর্থ। আমাদের টাকাগুলি কোন এক ইন্দ্রজালে কমে যায়। একটি পাউন্ডের মূল্য এখন আটাত্তর টাকারও উপর। পঁচিশ হাজার টাকা দিলে ব্যাঙ্ক থেকে তিনশ কুড়ি পাউন্ড দেয়! সুতরাং, যখনই কোন জিনিস কিনি বা কেনা হয় তখনই ভারতীয় টাকায় দামটা কত হল তা মুহূর্তে মস্তিষ্ক অঙ্ক কষে বলে দেয়। ফলে মনে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে উদ্বেগ বলা চলে। পুত্র অবশ্য যখনই আমি ক্যাশ মেমোটা দেখি তখনই মুচকি হেসে আমাকে বারণ করে অঙ্ক কষতে। কিন্তু স্বভাব যায় কোথায়? যারাই এদেশে আসেন তারাই এমত করেন বোধ হয়। অন্ডবরায় কবিতা উৎসব হচ্ছে ২০০৩ এর ৩১শে অক্টোবর থেকে ২রা নভেম্বর। এরা সুন্দর একটি ব্রোশার করেছেন। ব্রোশারে চব্বিশ জন কবির ডাকটিকিট সাইজের ছবি দিয়ে একটু একটু পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। এক ডজন কবিতাও ছাপা হয়েছে। ঐ কবিগণ আসবেন। এই কবিতাগুলি পঠিত হবে উৎসবে। ব্রোশারটি বিনামূল্যে দেওয়া হল। ব্রোশারে সাদর আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে সকলকে, ডেলিগেট হয়ে আসার জন্য।

ডেলিগেট ফি বাহাত্তর পাউন্ড, অর্থাৎ পাঁচ হাজার ছ'শো টাকারও বেশি। আপনার থাকা ও খাওয়াতো হোটেলেই হবে। সে খরচ তো নিশ্চয়ই আলাদা। ব্রোশারে অনেক হোটেলেরই বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। আমরা অক্টোবরের মাঝামাঝিই চলে যাব বলে খুব ভাল লাগলো। অল্ডবরার কবিতা উৎসবে দুজনে গেলে কত খরচ পড়তো সেই হিসাব করে আমাদের গলদঘর্ম হওয়ার প্রয়োজন রইল না। আমার এই কথা শুনেই বন্ধুবর অমরেন্দ্র ভৌমিক মন্তব্য করবেন, আপনার চিন্তা কেন? প্রসূন এত জায়গা দেখিয়েছে এটাও দেখাতো নিশ্চয়। তবে আপনাদের টিকিটের মেয়াদ শেষ হয়ে যায় আগেই সেটাও ভালই হয়েছে। নইলে তো ফিরতে আরো দেরি হয়ে যেতো। তাছাড়া অক্টোবরের শেষে ইংল্যান্ডের ঠাণ্ডাটাও মনে রাখতে হবে। কনকনে ঠাণ্ডায় পোয়েট্রি ফেস্টিভাল খুব জমতো বলেও মনে হয় না।"

সব কথা সত্যি। তবু মনে হয় থাকতে পারলে ভাল লাগতো। কবিতা উৎসব তো ভারতেও হয়। কলকাতায় হয়, এমন কি আগরতলায়ও হয়। সেখানে তেমন দক্ষিণাও লাগে না। কিন্তু ওখানে আমি ব্রাত্য জন, যাওয়ার সুযোগ ঘটে না। এখানে....।

শ্রীমৎ নিম্বার্কাচার্যের সাথে এবার ঢাকাতে

'তিনি আলোর মত ছড়িয়ে আছেন, ধরতে গেলে যায় না ধরা। তাঁর ইচ্ছেতেই জগৎ সৃষ্টি তাঁর ইচ্ছেতেই ভাঙা-গড়া। তাঁর ইচ্ছেতেই সব হয় সত্য কিন্তু আমাদের মনে থাকে কি? থাকে না। সবই মনে হয় আমিই করছি। আমিই বা কম কি? আমার ইচ্ছেমত, আমার সুবিধামত কাজ হলে তবে সুখ আনন্দ; আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধ মত, আমার অসুবিধা হয় সেমত কাজ হলে দুঃখ হয়, ক্ষুব্ধ হই, ক্রুদ্ধ হই, কত না কিছু হয়। আমার যোগ্যতার অধিক পেয়ে গেলে একবারও মনে হয় না যে আমি অধিক পেলাম। কিন্তু যখন তখনই মনে হয় বুঝি কম পেলাম, তখন ঐ যাঁর ইচ্ছেতে জগৎ সৃষ্টি তাঁর বিচার অনুচিত মনে করি। আমার ঔদ্ধত্যের সীমা পরিসীমা নেই। নিজের নয়, কেবল অন্যের দিকে তাকিয়ে থাকি। অন্যের সৌভাগ্যে আমার হৃদয় জ্বলে, অন্যের প্রভায় আমি নিষ্প্রভ হয়ে পড়ি। দত্ত কবি সত্যিই গেয়েছেন, 'মাৎসর্য বিষদশন কামড়ে রে অনুক্ষণ, না বুঝিলি না শুনিলি এবে রে পরাণ কাঁদে।'

William Wordsworth তাঁর জীবন প্রভাত স্মরণ করে লিখেছেন—

Our birth is but a sleep and a foregetting.
The soul that rises with us, our life's star,
Hath had elsewhere its setting
And cometh from afar;
Not in entire nakedness,
Not in utter forgetfulness,
But trailing clouds of glory, do we come,
From God who is our home.

এই জীবন এক সুষুপ্তি এক স্মৃতিভ্রংশতা বটে,
যে আত্মাটি আমার সঙ্গে উঠে, আমার জীবনের তারকা
তার অবস্থান অন্যত্র ছিল,
সে আসে বহুদূর থেকে,
তবে একেবারে দিগম্বর হয়ে নয়,
সম্পূর্ণ স্মৃতিভ্রংশ হয়েও নয়,
সে আসে যশের আলোকপুচ্ছ পশ্চাতে নিয়ে,
সেই ঈশ্বর থেকে যিনি আমাদের আলয়।

কিন্তু হোক না সুষুপ্তি বা স্বপ্ন, আমার তো তা মনে হয় না। স্বপ্নকালে কি মনে থাকে যে আমি স্বপ্ন দেখছি? স্বপ্নেও কত ভালবাসাবাসি, কত ঝগড়াঝাটি, কত বাসনাপূরণ, কত নিরাশা, কত কিছু হয় না? ভয়ে দৌড়ে ঘেমে নেয়ে হাঁপিয়ে ঘুম ভাঙে আশ্বস্ত হই বা কত কিছু পেয়ে আনন্দিত হয়ে ঘুম ভাঙলে নিরাশ হই। কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণে বলেছেন না? "নিশির স্বপনে লোকে নিধি পায় হাতে। আঁখি কচালিয়া উঠে নিশির প্রভাতে।' সারাটা

জীবনই একটা স্বপ্ন, স্বপনটা সেই স্বপনের ভিতরে স্বপন; সিনেমার মধ্যে নায়ক নায়িকার সিনেমা দেখার মত। একেই জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য বলেন,

শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তো গ্রন্থ কোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা জীব ব্রহ্মৈবনাপরম্ ॥

তবু সংসার চলছে! আমরা সব সত্য বলেই মনে করছি এবং যার যার ভূমিকায় অভিনয় যার যার ক্ষমতা মত করছি। কখনো হাসা কখনো কাঁদা চলছে। অহংকারের বেলুনটা একবার যদি ফুলে ঢোল হয়ে উঠছে তো অন্যবার মিইয়ে বাসি লুচি হয়ে যাচ্ছে। সকল কাজে সময় পাচ্ছি কিন্তু তাঁরে ডাকতে পাচ্ছি নে। কিন্তু তিনি যে সর্বদা আমাকে পথ দেখাচ্ছেন তার প্রমাণও মাঝে মাঝেই পাচ্ছি।

একটা সৌভাগ্য গত ক'বছর ধরে অহৈতুকী হয়ে এসে পড়ছে। শ্রীমৎ নিম্বার্কাচার্যের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে যাওয়া হচ্ছে, একটা দু'টো দিন তাঁর দর্শনের আলোচনা শোনা হচ্ছে। বিশিষ্ট বিদ্বজ্জনের সান্নিধ্য লাভ হচ্ছে। জ্ঞাননিষ্ঠ আলোচনার আলোকে মনের তমসা স্বল্প সময়ের জন্য হলেও বিদূরিত হচ্ছে। বারাণসী, চেন্নাই, শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি বিশিষ্ট স্থানে গিয়ে সেই সেই স্থানের ও অন্যান্য স্থান থেকে আসা বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গের নিম্বার্ক দর্শন সম্পর্কিত চিন্তনের অমৃতরস পান করা হচ্ছে। আর এসব সম্ভব হচ্ছে কলকাতা (সুখচর)-এর কাঠিয়াবাবার আশ্রমের মহন্ত শ্রীমৎ ডক্টর বৃন্দাবন বিহারীদাস কাঠিয়াবাবাজীর নিরলস প্রচেষ্টার ফলে।

ডাকতে হয়। ভাল কাজেও ডাকতে হয়, মন্দ কাজেও ডাকতে হয়। মন্দ কাজে প্রথম প্রথম ডাকতে হয়। পরে নেশা ধরে গেলে আর ডাকতে হয় না। তখন নেশাখোর নিজেই যায়, বরং অন্যকে সে নিজেই ডেকে আনে। ভাল কাজে নেশা খুব কম লোকেরই হয়। হ'লে তাঁরাও ডাকেন। তাদেরকে আমরা সন্ত বলে থাকি। ডাকার কি আর অন্ত আছে? সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠার জন্য ডাকতে হয়। 'উঠ শিশু মুখ ধোও পর নিজ বেশ। আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ।' খাবার পরিবেষণ করে মায়েদের বারম্বার স্বামী পুত্রকে ডাকতে হয় খেতে আসার জন্য। ছেলেকে মায়ের সন্ধ্যেবেলা ডেকে আনতে হয় খেলা থেকে। ডাকতে হয় সৎ সঙ্গেও। ডাকলেও কি সবাই আসেন? আসতে চান? বিরক্ত হন। আমাদের জানা এক বৃদ্ধা একটি আশ্রমে বাস করেন। সেখানে রবিবার সন্ধ্যেয় সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠ ও আলোচনা হয়। জনাকয় শ্রোতাও আসেন। তিনি কোনদিন আসেন না। নিজের ঘরে বসে থাকলেও গ্রন্থাদির কথা তাঁর কানে পৌঁছে যায়। সুতরাং, আবহাওয়া বিশেষ খারাপ না থাকলে তিনি রবিবার সন্ধ্যেয় বাড়িতেই থাকেন না!

ডাকতে হয়। ভাল জিনিসের জন্যও ডাকতে হয়। গোস্বামী তুলসীদাসজী বলে গেছেন সেই কত কাল আগে, 'গো-রস ঘর ঘর যায়, সুরা বৈঠি বিকায়।' দুধওলা বাড়ি বাড়ি আসে, মদওলা থাকে ঘরে বসে। দুধ সকলে রাখেন না। বাকিতেও দিতে হয়। টাকা আদায় সর্বদা সহজ হয় না। মদের দোকানে বাকি পাওয়া যায় না। অনেক সময়ই উচাটন ক্রেতা বড় টাকা দিয়ে বোতল নিয়ে দৌড়ায়, বাকি পয়সা নিতে ভুলে যায়। যে বইয়ে নিষিদ্ধ কথা লেখা থাকে তা খুব বিক্রি হয়। যে বই সদুপদেশ দেয় সেগুলি খুব কম কেনে লোকে।

ডাকতে হয়। ঈশ্বরের নাম ডেকে ডেকে দিতে হয়। ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ শত চেষ্টা করেও পিতাকে দিতে পারে নি। ভীষ্ম পিতামহ শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে সম্বোধন করলেও পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে প্রণাম করলেও জরাসন্ধ শিশুপালেরা বারম্বার তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছে, তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে। শ্রীমদ্ভবদ্গীতার উপদেশ ক'জন নিয়েছে? শ্রীচৈতন্যকেও ডাকতে হয়েছে। সকলেরই ডাকতে হয়, জনে জনে জানাতে হয়, প্রচার করতে হয়। দক্ষিণেশ্বরের পরম পুরুষ ডেকে ডেকে জনে জনে বলেছেন, শ্রীমা বলেছেন, স্বামীজী কম্বুকণ্ঠে বিশ্বে প্রচার করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসীগণ আদর্শ জীবন যাপন করে, পরহিতব্রতে রত থেকে সুলভ মূল্যে সদগ্রন্থাদি দিয়ে প্রচার করছেন। প্রচার করতে হয়।

ডাকতে হয়। প্রচার করতে হয়। শ্রীমৎ স্বামী ধনঞ্জয়দাসজী কাঠিয়াবাবা লিখেছেন, 'শ্রীগুরুদেব যখন আমাকে নিম্বার্কাশ্রমের মহন্ত করিয়াছিলেন, তখন আমাকে বলিয়াছিলেন—"আমার বাবার নাম প্রচার কর।" আমি বলিলাম—"আপনার বাবার নাম প্রচার করার আমার কি সামর্থ্য আছে? আপনি যদি আমার দ্বারা করাইয়া লয়েন তবেই তাহা হইতে পারে।" তখন তিনি বলিয়াছিলেন—"শ্রীশ্রী ঠাকুরজী ও আমার বাবা (শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়াবাবা) তাহা করাইয়া লইবেন।" এই 'করাইয়া লইবেন' ভবিষ্যবাণী যে সফল হয়েছে তা সকলেই জানেন। বহুমুখী প্রতিভাবান সন্তপুরুষ স্বামী ধনঞ্জয়দাসজী তাঁর প্রতিভা, সম্পূর্ণ প্রতিভা কাজে লাগিয়ে তাঁর গুরুদেবের আদেশ, 'আমার বাবার নাম প্রচার কর' পালন করেছেন। শাস্ত্র গ্রন্থাদি ও তার সহজ ব্যাখ্যা মুদ্রণ ও প্রকাশ, স্থানে স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা এবং সবার উপরে তাঁর অমৃত স্বরূপ প্রবচন ও উপদেশ দানের দ্বারা তিনি সেই প্রচার করার আদেশ পালন করে গেছেন। তাঁর সময়ে প্রকাশিত অনেক গ্রন্থই এখনো উপলব্ধ, তার প্রবচন শুনেছেন এমন বহু ভাগ্যবানই এখনো জীবিত। তাঁরা যখন স্বামীজীর স্মৃতি রোমন্থন করেন তখন তাঁদের চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠে।

ডাকো। প্রচার কর। এই আহ্বান চিরকালীন। কবে কোন সভ্যতার প্রভাতকালে ভারতবর্ষের ঋষি ডেকে বলেছিলেন, 'শৃণ্বন্তো বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থৌ..... ইত্যাদি। তাঁরা আহ্বান জানিয়েছেন, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রতো প্রাপ্য বরান নিবোধত।' এই ডাক ক্রমাগত হচ্ছে। এরই এক সংস্করণ, 'আমার বাবার নাম প্রচাব কর।' এরই ফল ধনঞ্জয়দাসজীর সারাজীবন ধরে প্রচার চেষ্টা।

সেই প্রচার চেষ্টা চালাচ্ছেন কলকাতার কাঠিয়াবাবার আশ্রমের মহন্ত ডক্টর বৃন্দাবন বিহারীদাসজীও। আউট অব প্রিন্ট হয়ে যাওয়া গ্রন্থগুলির পুনর্মুদ্রণ হচ্ছে ; গঙ্গার পশ্চিমতীরে বালিতে ও রাণাঘাটে আশ্রম হয়েছে, প্রবচনাদি চলছে। দেশে ও বিদেশে বহু বিদ্বজ্জন সমাবেশে আমন্ত্রিত হচ্ছেন তিনি। সেখানে সর্বদাই সংস্কৃতে, হিন্দীতে, বাংলায় ও ইংরেজিতে অধ্যাত্ম আলোচনা ও নিম্বার্ক দর্শন আলোচনা করছেন। শ্রোতারা মুগ্ধ হচ্ছেন, অনুপ্রাণিত হচ্ছেন, আধ্যাত্মিক উন্নততর স্তরে আরোহণ করছেন। 'বাবার নাম প্রচার' হচ্ছে।

ডঃ বৃন্দাবন বিহারীদাসজী তাঁর নিম্বার্ক দর্শন ও কাঠিয়াবাবার ভাব এবং আদর্শ প্রচারে এক সম্পূর্ণ নতুন ডিমেনশান এনেছেন, নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। এমনটি আগে আর কোথাও দেখা যায়নি, শোনা যায় নি। রামকৃষ্ণ মিশন কালচারাল ইনসটিউট স্থাপন করে

যা করছেন ইনি একাকী তাঁর ক্ষমতামত তাই করতে চেষ্টা করছেন। He is a one man mobile cultural institute. তিনি একজন এক ব্যক্তিক ভ্রাম্যমাণ সংস্কৃতি শিক্ষায়তন। সন্তদাসজী তাঁর শিষ্য সদ্য মহান্তপদপ্রাপ্ত ধনঞ্জয়দাসজীকে বলেছিলেন, আমার বাবার নাম প্রচার কর। তাঁর শিষ্য বৃন্দাবনবিহারীদাসজী যেন ধরেই নিয়েছেন যে গুরুর অপ্রকট হওয়ার পর তাঁর উপরে বর্তেছে সেই আদেশ। তিনি পরমানন্দে পালন করছেন সেই আদেশ। অর্থের অকুলান, অন্তর দিয়ে কাজ করার লোকের অভাব ইত্যাদি কোনো বাধাই তাঁকে আটকাতে পারছে না। নিম্বার্ক দর্শনের রথে চড়ে রামদাস কাঠিয়াবাবার নাম প্রচার হচ্ছে।

এ এক অভিনব প্রচার। ডক্টর বৃন্দাবনবিহারীদাস কাঠিয়াবাবা নিম্বার্ক দর্শনের উপর সেমিনার সংগঠন করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে, শ্রীমৎ নিম্বার্কাচার্যের আবির্ভাবতিথি উপলক্ষে। সেমিনার হয়েছে মুম্বাই, দিল্লী, বারাণসী, চেন্নাই, শ্রীক্ষেত্র ও ঢাকায়। মুম্বাই ও দিল্লী'তে আমার যাওয়া হয়নি। পরবর্তীগুলিতে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য আমারও হয়েছে। সে কথাই বলার বাসনা। ভক্তজনের শ্রীচরণে প্রণাম করে আশীর্বাদ প্রার্থনা করি, তাঁরা বর দিন, আমি যেন কথা সকলের প্রীতির জন্য বলতে পারি।

প্রতিটি সেমিনারের বিষয় নিম্বার্ক দর্শন। স্থান বিশ্ববিদ্যালয়। বারাণসীতে হিন্দু বিশ্বদ্যিালয়ের ধর্ম ও দর্শন বিভাগ, চেন্নাইতে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব বৈষ্ণবিজম্ এবং পুরীতে জগন্নাথ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বদর্শন বিভাগ। বলাই বাহুল্য যে প্রতি জায়গাতেই অংশগ্রহণকারী বিদ্বজ্জনের সিংহ ভাগই থাকেন স্থানীয়। কিন্তু প্রত্যেক জায়গাতেই বক্তা ও শ্রোতা আসেন বারাণসী, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম এবং নেপাল থেকেও। মাসাধিক কাল ধরে প্রস্তুতি নেওয়া হতে থাকে, তার পর তিন দিন ধরে যজ্ঞ পূজা সেমিনার ইত্যাদি চলে। এতগুলি মানুষের থাকবার ব্যবস্থা, স্থানীয় পণ্ডিতবর্গের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা, সন্ধ্যায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ব্যবস্থা, ইত্যাদি হয়। অন্যান্য অঞ্চল থেকে আসা ভক্ত ও দর্শনার্থীদের নিকটবর্তী গুরুত্বপূর্ণ স্থান পরিদর্শনের ব্যবস্থাও হয়ে যায়। কেমন করে এসব হয়ে যায় তা আমি জানি না। তবে হয় তা জানি। কোনো কোনো জায়গায় ঠাকুর রামকৃষ্ণের উপদেশ মানা ভাল। আম যখন পাওয়া যাচ্ছে খেয়ে নাও। কার গাছের আম সে খবর জানাটা খুব জরুরি নয়। বারণসীতে বাবাজীর সঙ্গে চলে গিয়েছিলাম বিন্ধ্যাচলে। বিন্ধ্যাচলবাসিনী'র মন্দিরে প্রণাম করতে পেরেছি। গিয়েছিলাম সেখানে মা আনন্দীময়ীর আশ্রমেও। সেখানে বহির্ভাগে দর্শনীয় ফল ভারে নুয়ে পড়া বড় আমলকী গাছটি। কি বড় বড় ফল! এক একটি আমলকীতে মুঠো ভরে যায়। আশ্রমের অন্তর্ভাগে আছে সেই গর্ভগৃহ-মন্দিরের নীচে ধ্যান মন্দির। এই গর্ভগৃহে বসে ধ্যান-তপস্যা করেছেন শ্রীমৎ ধনঞ্জয়দাসজীও। হামাগুড়ি দিয়ে সেই স্থানে প্রবেশ করে দু'মিনিট সেখানে বসবার দুর্লভ সৌভাগ্য হয়েছিল আমাদেরও। চেন্নাইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথিশালায় বাস, শ্রীমান পাপ্পুর (ইঞ্জিনিয়ার অশোক চক্রবর্তী) সস্নেহ সদাজাগ্রত নিরলস অভিভাবকত্ব, শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কৃষ্ণ ও শুভ্র সরস কৌতুক; পুরীতে এম. এ., এম. ফিল. পি. এইচ. ডি. বিভাগে পাঠ ও গবেষণারত অর্দ্ধশতাধিক শিক্ষার্থীর সেবা, সর্বদর্শন বিভাগের অধ্যাপকদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা, বাবার সঙ্গে বারম্বার জগন্নাথ মন্দিরে প্রসাদ গ্রহণ, রামকৃষ্ণ মিশনে যাওয়া, সবই মনের মণিকোঠায় সযত্নে সঞ্চিত রাখার সামগ্রী

বটে। চেন্নাইতে সেই সেমিনারে এসে পড়েছিলেন ও আমাদের অনুরোধে সংক্ষিপ্ত ভাষণ রেখেছিলেন সাংসদ সুশ্রী বৈজয়ন্তীমালা বালী। বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল ধরে পাঠ নিয়েছেন, গবেষণা করেছেন ডক্টর বৃন্দাবনবিহারী দাসজী। বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম ও দর্শন বিভাগের প্রধান ডক্টর গঙ্গাধর তাদের ছাত্র বৃন্দাবনবিহারীদাস সম্বন্ধে কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, We are proud of him.

কিন্তু মুম্বাই, দিল্লী, বারাণসী, চেন্নাই, পুরী, সবই তো দেশে। সংগঠন যতই কঠিন হোক সবই দেশের মধ্যে। ঢাকা তো বিদেশ। ২০০২ সালের ডিসেম্বর মাসে বাবা যাবেন ঢাকা। আমাদেবকে সঙ্গে যেতে বললেন। তাঁর কথায় রাজি হয়ে চল্লিশ বছর পর ঢাকা গেলাম। 'রাজেন্দ্র সঙ্গমে দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে।' বাস হলো নারিন্দায় মাধ্ব গৌড়ীয় মঠে। অজিতকৃষ্ণ প্রভুর অভিভাবকত্বে। যাওয়া হলো ঢাকেশ্বরী মন্দিরে, মহানাম অঙ্গনে—সব ঢাকায়। বাইরেও গিয়েছিলাম একটুখানি। একদিন বারুদিতে, সেই মন্দিরে যেখানে মহাপ্রয়াণ হয়েছিল মহাপুরুষ লোকনাথের। বাবাব ভাষণ হলো নারায়ণগঞ্জের লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে। আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন অবসবপ্রাপ্ত মেজব জেনাবেল চিত্তরঞ্জন দত্ত, বীরোত্তম মহাশয়ও। তিনি বড় মানুষ। বাঙলাদেশের হিন্দুদের তিনি অবিসম্বাদী অরাজনৈতিক নেতা। আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা সম্ভাষণ জানালাম। মাত্র তিন দিনের তো প্রবাস। সুতরাং বেশি দেখা সম্ভব হয়নি। আমাদের সঙ্গে ছিলেন শাশ্বত দাসজীও। তিনি তো কেঁদেই ফেললেন ঢাকেশ্বরী মন্দিরে গিয়ে। এই মন্দিরে পুরোহিত ছিলেন তাঁর পিতামহ! তিনদিনেই প্রীতিভাজন হয়ে গেলেন গাড়ির চালক লোকমান। স্নেহেব ঋণে বদ্ধ হলাম উৎপলবাবুরও। সারাক্ষণ অন্যের ঝামেলা নিজের কাধে তুলে নিয়ে তার সুরাহা করাব চেষ্টা করাব এক বিরল নবকুমাব সুলভ চরিত্র এই উৎপলবাবুটির। ঈশ্বব তাকে ভাল রাখুন। বুদ্ধ মন্দিরে গিয়ে দেখা হয়েছিল প্রিয়ব্রত ব্রহ্মচারীজীর সঙ্গে ও শ্বেতবর্ণ অতি স্থূল পাটেব বস্ত্র পবিধানে তাঁর। শ্রীমান ডাক্তাব সুজিত রায় এই ঢাকা যাত্রার ব্যবস্থা কবেছিল। সে সর্বদা সকল স্থানে আমাদের সঙ্গী ছিল। সুজিত একবার নিয়ে গেল ঢাকা স্টেডিয়ামের অফিসে, ঢাকায় শহীদ স্মরণ স্মৃতি স্তম্ভে এবং বাজারেও। এক সন্ধ্যায় বাবা গেলেন মোদী মহাশয়দের বাড়িতেও। এদেব বাড়িতে বিত্ত ও ভক্তির মহামিলন ঘটেছে। বহু মন্দির ভজনালয় এদেব বিত্তায় সহযোগিতা লাভ করে থাকে।

সেই সময় ঢাকায় পরবর্তী নিম্বার্ক আবির্ভাব তিথি পালনেব কথাটা বাবার মনে আসে। শ্রীমান সুজিত সোৎসাহ ধারণা প্রচাব করতে থাকে। উৎপল বাবুরাও খুব উৎসাহ বোধ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিমচন্দ্র ভৌমিক মহাশয়ের বাড়িতে যাওয়া হল। তিনিও সকল রকম সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন। অনেকেই সাহায্য করাব প্রতিশ্রুতি দিলেন। উৎসাহেব গাড়ি গড়গড়িয়ে চললো। ডাক্তার সুজিত, উৎপল বাবুদেবকে আগরতলা যাবার আমন্ত্রণ জানানোর পর আমাদেব প্রবাস শেষ হয়। (দুঃখের বিষয় ওরা আগরতলা যখন এলেন তখন আমরা ইংল্যান্ড-ফ্রান্স-সুইজারল্যান্ডে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমি ঢাকায় ওদের আতিথ্য গ্রহণ করে এসেছি। কিন্তু ওরা আগরতলা এলে আমি কিছুই করতে পারিনি।)

তবে আমাদের যেমন শরীরের শক্তি কম তেমনি মনের সাহসও কম। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য...বারম্বার বলা হয়েছে শাস্ত্রে, অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধি ইত্যাদি গুণের কথা বলা হয়েছে।

প্রশান্তাত্মা বিগতভীঃ হতে বলা হয়েছে। আমাদের পড়াও আছে। কিন্তু পড়লে কি হবে? ভয়টা যে ছাড়ে না! পুথির বিদ্যা জীবনে কাজে লাগে কই? বলা আছে না? পুথিগত বিদ্যা পরহস্ত গতং ধনম্। কার্যকালে সমাজগ্মু ন তৎ বিদ্যা ন তৎ ধনম্।। বাবার কল্পনা, সুজিতের উৎসাহ, উৎপলবাবুদের সাহসদান, অধ্যাপক নিমচন্দ্র ও অন্যান্যদের সম্পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস সত্ত্বেও আমার ভয় কাটে না। নিম্বার্কজয়ন্তী পালন করা ও সেমিনার আয়োজন করা যে কি কঠিন কাজ দেখে আসছি তো গত ক'টা বছর ধরে! নিম্বার্কাচার্যের বড় চিত্র থেকে শুরু করে যজ্ঞের কাষ্ঠ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতা থেকে নির্দিষ্ট স্থানে। দেখেছি রাত এগারোটায় মান্যবর অতিথিকে বিমান বন্দর থেকে এনে তার ঘরে বসিয়ে রেখে পাপ্পু ছুটেছে দুধ আনতে। তিনি এত রাতে দুধ ছাড়া আর কিছু খাবেন না। দেখেছি এই বিরাট কর্মযজ্ঞের হোতা ডক্টর বৃন্দাবন বিহারীদাসজীকে দুদিন ধরে সকলের শয়ন ভোজন ইত্যাদির ব্যবস্থা হাসিমুখে ওভারসী করতে এবং নিজে অভুক্ত থাকতে। (খেলে শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ে যে!) বলা বাহুল্য পাপ্পুরা আমাকে সর্বদা চোখে চোখে রাখে। আমার কাজ কেবল ভয় করা, কি জানি কি হয় সেই উদ্বেগে আতঙ্কে থাকা। ঢাকায় ২০০৩ সালের নিম্বার্কজয়ন্তী উৎসব পালন হবে, সেখানে সেমিনার হবে শোনা থেকেই আমার ভয় শুরু হয়ে গেল। বিদেশ, ভারত থেকে যারা যাবেন তাঁদের প্রত্যেকের পাসপোর্ট ও ভিসা লাগবে। পরে অবশ্য বাংলাদেশে সরকার আরো একটু যোগ করেছে। ভারত থেকে যাঁরা বাংলাদেশে যাবেন তাঁদের প্রত্যেকের পাঁচশ টাকা করে ভ্রমণ কর দিতে হবে। সবিনয়ে জানাই যে সকলে যখন ঢাকার আয়োজনে ব্যস্ত আমি সহধর্মিণীসহ তখন ইংল্যান্ড ফ্রান্স সুইজারল্যান্ড ভ্রমণানন্দে রত উদ্বেগহীন।

তবু ঢাকায় তিন দিন ধরে নিম্বার্ক জয়ন্তী পালিত হল। সেমিনার হল। বর্তমান যুগেও যে নিম্বার্ক দর্শন প্রাসঙ্গিক সেকথা বলা হ'ল। ঢাকেশ্বরী মন্দিরের পাশে বড় নবনির্মিত ভবনে, জাতীয় প্রেস ক্লাবে, স্বামীবাগের লোকনাথ মন্দির প্রাঙ্গণে, নারিন্দার মাধব গৌড়ীয় মঠের বিশাল নাটমন্দিরে অগণিত ভক্তজনের উপস্থিতিতে আমাদের উৎসব হয়ে গেল। পাপ্পুরা তো আমা... ...নো কাজ করতে দেয় না, আমি চিন্তাটাই কেবল করি। নিম্বার্কচার্যের ইচ্ছায় আমার উদ্বিগ্ন চিন্তা অমূলক প্রতিপন্ন হল। ঘটনা পরম্পরা আবার প্রতিপন্ন করলো যে আমি একজন উইপিং ফিলোসোফার বটে। ঢাকার অধ্যাপক, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি, শিক্ষকগণ সহ বহু ভক্ত সকল উৎসব স্থানে উপস্থিত ছিলেন। যোগদানকারী ভক্ত গিয়েছিলেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, বারাণসী, বিহার, আসাম ও ত্রিপুরা থেকে। বাংলাদেশের সিলেট, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ থেকে এসেছিলেন। হাঁটুতে ব্যথার জন্য মাটিতে বসতে পারেন না অঞ্জলি সাহা। কিন্তু আগরতলা থেকে এসেছিলেন ঢাকায়। হঠাৎ প্রচণ্ড জ্বর হয়ে পড়ায় পাঁচ তারিখে আমাদের সঙ্গে আসতে পারেন নি শুক্লা দাস। কিন্তু ভগবদিচ্ছায় জ্বর কমে গেলে তিনিও এসে পড়লেন সাত তারিখে। আগরতলার যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ভারতের সুপ্রীম কোর্টের এডভোকেট কল্যাণ নারায়ণ ভট্টাচার্য, ত্রিপুরার চিফ এঞ্জিনিয়ার বিদেশ চন্দ্র সাহা, ডাঃ রামগোপাল সাহা প্রমুখ। আগরতলার শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ সর্বজন প্রিয় শ্রদ্ধেয় ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিকমল বৈষ্ণব মহারাজ এবং নন্দদুলাল মহারাজও। শ্রীমান ডাক্তার সুজিত রায়ের কথা তো বলাই বাহুল্য। সে তো বড় কর্মী বাবার। সুজিতের সঙ্গে

এসেছিল যোগাসন শিক্ষক শ্রীমান নিরঞ্জন ভট্টাচার্য। সকলে তার যোগাসনের প্রশংসা করেছে। কলকাতা থেকে গিয়েছিলেন স্বনাম প্রতিপন্ন পরম বাগ্মী পুরুষ দু'জন—ডক্টর রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও প্রজ্ঞাভারতী ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী। আগরতলা থেকে এসেছিলেন অধ্যাপক ডঃ সীতানাথ দে মহাশয়ও। আগরতলার ডাক্তার মণিলাল ধর আসার সময় বাবার আদেশ মত এক বাক্স ঔষধও নিয়ে এসেছিলেন। এই তরুণ ডাক্তারটি অল্প বয়সেই বেশ সুনাম অর্জন করেছে। কেমন করে জানি তার কথা ঢাকায়ও প্রচার হয়ে যায়। গৌড়ীয় মঠের সাধু ক'জন এবং বেশ আরো কিছু নরনারী তার বাক্স হাসপাতালে ভীড় করতে থাকে। ডাক্তারও পরম উৎসাহে নাওয়া খাওয়া ভুলে রোগী দেখায় লেগে যায়। (ঢাকার উৎসব শেষে সে আমাদেরকে চট্টগ্রামে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানেও তাকে রোগী দেখতে দেখলাম।)

কাজের কি আর অন্ত আছে? ভূগোলের বইয়ে লেখা আছে যে সমুদ্রে ভাসমান হিমশৈলের এগারো ভাগের একভাগ মাত্র জলের উপরে ভাসে, দশভাগ জলের নীচে থাকে। ভাসমান অংশটি আনুপাতিকভাবে ক্ষুদ্র বলেই দুর্ভাগা টাইটানিকের নাবিকগণ বেশি দূর থেকে হিমশৈলটি দেখতে পান নি। যখন দেখতে পেয়েছিলেন তখন বড় দেরি হয়ে গেছে, তখন আর দ্রুতগামী এই বিশাল জাহাজটির দিক বদলাবার সময় ছিল না। টাইটানিক তার ভবিতব্য মত ঐ হিমশৈলে আছড়ে পড়ে। পরের কথা তো ইতিহাস। হিমশৈলের উপমা সর্বত্রই প্রযোজ্য। স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজীর মত কোনো বক্তা যখন কোনো বিষয়ে বক্তৃতা করে শ্রোতৃমণ্ডলীকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখেন, তখন তাঁর পাণ্ডিত্যেরও হিমশৈলের মত একাদশ ভাগের এক ভাগের ছটাই কেবল আমরা দেখতে পাই। বাকিটা জ্ঞান সমুদ্রের তলায় নিমজ্জমান থাকে। বড় কাজেও তাই। এই যে বছর বছর বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নিম্বার্ক জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিদ্বজ্জনেরা নিম্বার্ক দর্শন আলোচনা করছেন, ভেদাভেদবাদের উৎকর্ষ ব্যাখ্যা করছেন, সে তো সমগ্র আয়োজনের একাদশ ভাগের এক ভাগ। নিমজ্জমান দশভাগের মধ্যে আছে সেমিনারের স্থান নির্বাচন, কর্তৃপক্ষের অনুমতি আদায়, বক্তাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ও তাঁদের অঙ্গীকার নেওয়া, ভক্তবৃন্দকে অভিজ্ঞাপন প্রদান, সম্ভাব্য সংখ্যক যোগদানকারীর থাকার ব্যবস্থা করা, তাঁদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া, তাঁদেরকে থাকার জায়গা থেকে সেমিনার স্থানে নিয়ে আসা ও দিয়ে আসার ব্যবস্থা করা, আরো কত কি! শ' দেড়েক আমন্ত্রিত অভ্যাগতের স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা রাখা কি সোজা কথা? হোটেলে, লোকনাথ মন্দিরে, গৌড়ীয় মঠে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সবাই ছিলেন। সবচেয়ে কৃচ্ছ্র ব্যবস্থা মহন্তজী ডঃ বৃন্দাবনবিহারীদাসজীর। গৌড়ীয় মঠের দোতলায় একটুখানি ঘর 'সাধনকক্ষে' তাঁর স্থান। সঙ্গী শ্রীমৎ গোপালজী, রসুইয়ের সরঞ্জাম, যোগানদার শাশ্বতদাসজী, গুরুজীকে ছেড়ে অন্য কোথাও যাবে না বলে শ্রীমৎ ইঞ্জিনিয়ার পাপ্পু মহারাজজী এবং আরো দু'একজন। যদি হয় সুজন তেঁতুলপাতায় ন'জন; প্রবাদটি সত্য কিনা পরখ করতে হলে সুখচরের মহন্তজীর সঙ্গে প্রবাসে যেতে হবে।

সাতই নভেম্বর বিকেলে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে গিয়ে কালীমাতাকে প্রণাম জানিয়ে, পাশে দুর্গামন্দির প্রাঙ্গণে বাংলাদেশের মহানগর সর্বজনীন পূজা কমিটির আয়োজিত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া গেল। এই পূজা কমিটি অনেক সংগ্রাম করে সে দেশে পূজা করার অধিকার রক্ষা করে আসছেন। কমিটির প্রেসিডেন্ট শ্রী অনিলচন্দ্র নাথ, সম্পাদক শ্রী বাসুদেব ধর,

আমাদের উৎপল বাবু, এরা সকলে শ্রীনিম্বার্ক জয়ন্তীর পালনে সর্বতোভাবে আয়োজন করেছেন। দুর্গামন্দির প্রাঙ্গণে অনেক স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত। শ্রী অজিত কুমার চক্রবর্তীর মঙ্গলাচরণ পাঠের পর কার্যক্রম আরম্ভ হয়। প্রধান বক্তব্য রাখেন সম্বর্ধনাদাতাদের পক্ষে মেজর জেনারেল সি আর দত্ত, বীরোত্তম (অবসর প্রাপ্ত), এবং আমাদের পক্ষে শ্রীমৎ বৃন্দাবনবিহারীদাস কাঠিয়াবাবাজী। অনুষ্ঠানের পরে যাই বিশ্ববিদ্যালয় হোস্টেলে। সেখানে সকলে দেখলাম সংখ্যালঘুদের ভজনালয়—বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, হিন্দু ইত্যাদির জন্য। অবাক লাগলো। এভাবেই ধর্মীয় রাষ্ট্রের বিশেষতা দেখা যায়। অমুসলমানদের পৃথক রাখার স্থায়ী বন্দোবস্ত! সদ্য পরিচিত একজন মুসলমান শিক্ষিত ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'প্রফেসার ধর! ভারত তো সেকুলার দেশ। কতটা সেকুলার আপনারা কার্যতঃ?' সবিনয়ে বলি, 'আপনি একটি ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিক, আপনার পক্ষে আমার উত্তর হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হবে। তা ছাড়া একজন বিদেশী পাসপোর্টধারীর পক্ষে এসব কথা সবিস্তারে বলাটা ঠিকও নয়। আমি অতি সংক্ষেপে বলছি, দয়া করে বোঝবার চেষ্টা করুন। বর্তমানে ভারতের রাষ্ট্রপতি একজন মুসলমান, বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী তিনি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিন্দু। আমাদের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ও চিফ ইলেকশান কমিশনার খ্রিস্টান। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার চালাচ্ছেন ত্রিশটিরও বেশি রাজনৈতিক দলের একটি জোট। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সরকার চালাচ্ছেন আধা ডজনেরও বেশি রাজনৈতিক দল। এমন বৈচিত্র্য পৃথিবীর কোনো দেশে কোনো কালে ঘটেনি।' ভদ্রলোক শুনলেন। তিনি কোন মন্তব্য করলেন না। আমি যোগ করলাম, 'এই সেমিনার হলো মহান মর্যাদায়।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ আনিসুজ্জমান জানালেন যে তাঁর বিভাগে নিম্বার্ক দর্শন পাঠ্যতালিকায় আছে। ঐ প্রথম অধিবেশন হয়েছিল জাতীয় প্রেস ক্লাবে। সারা হল ভর্তি ছিল। বেশ কিছু অভ্যাগত দেরিতে আসায় তারা বারান্দায় দাঁড়িয়েই অংশগ্রহণ করলেন। মাধ্ব গৌড়ীয় মঠে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে প্রভাসচন্দ্র ধর তার লিখিত ভাষণে দ্বৈতাদ্বৈতবাদের সমন্বয়ের উপর জোর দেন। অধ্যাপক আনিসুজ্জমান এই সমন্বয় কথাটির কথা তুলে মৃদু আপত্তি জানান ও সমন্বয়ের পরিবর্তে সহাবস্থানের কথা বলেন। শ্রীমৎ বৃন্দাবনবিহারীদাসজী তাঁর বক্তৃতায় বাংলাদেশে নিম্বার্ক দর্শনের প্রভাব ও প্রচারের কথা বলেন। সীতাকুণ্ডের শঙ্কর মঠ থেকে আগত সাধুজিও নিম্বার্ক দর্শনের কথা বলেন। শ্রীযুক্ত সি আর দত্ত বলেন যে ছোটবেলায় পিতার হাত ধরে তিনি নিম্বার্ক আশ্রমে গিয়েছেন। কিন্তু বাংলাদেশে নিম্বার্কের তেমন প্রচার নেই। হলে ভাল হয়। স্বামীবাগের লোকনাথ আশ্রমে বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরার তিন গুণী সন্তান—কল্যাণ নারায়ণ ভট্টাচার্য, সীতানাথ দে এবং রবীন্দ্রনাথ দাস শাস্ত্রী। এখানে বড় আকর্ষণ ছিল দেশখ্যাত শিল্পীদের ভজন গানের আসর।

এইভাবে নিম্বার্ক দর্শন প্রচার হচ্ছে দেশে বিদেশে স্বামী বৃন্দাবনবিহারীদাস মহন্তজী দ্বারা। তাঁর প্রয়াস ফলবতী হউক। প্রার্থনা জানাই। আমাদের ঢাকা ভ্রমণ মূলত ঈশ্বরের খোঁজে। আজকাল আমার ত্রিপুরায় ঈশ্বরে আস্থাশীল লোককে বহু অন্য মানুষ মুর্খ ও নির্বোধ ভাবে। সেই নির্বোধদের জন্য এখানে একটি গল্প তুলে দিলাম। এটি একটি সত্য ঘটনা-গল্প। ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করে আমার পুত্র লন্ডন থেকে ই. মেলে পাঠিয়েছিল। সমমনোভাবাপন্নদের সঙ্গে এই নান্দনিক আনন্দ ভাগ করে ভোগ করার ইচ্ছায় এটি এখানে দিলাম—

অ্যাশ্, কিম্বদন্তিপ্রতিম উইম্বল্‌ড্‌ন্ খেলোয়াড় আর্থার অ্যাশ, এক কঠিন রোগে ভুগে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। সারা পৃথিবীতে আছে তাঁর কত ভক্ত। আসছে চিঠি হাজার হাজার। একজন লিখেছেন, 'ঈশ্বর এমন ভীষণ রোগ তোমাকেই দিলেন কেন?

আর্থার অ্যাশ এই চিঠিটির উত্তরে লিখলেন—

সারা পৃথিবীতে
পাঁচ কোটি ছেলে মেয়ে টেনিস খেলতে শুরু করে,
পঞ্চাশ লক্ষ টেনিস খেলা শিখে,
পাঁচলক্ষ টেনিসকে বৃত্তি হিসাবে নেয়,
পঞ্চাশ হাজার প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়,
পঞ্চাশ জন উইম্বলডনে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে,
চার জনে সেমিফাইনাল খেলে,
দুজন ফাইনালে যায়।

যখন কাপটি হাতে পেয়েছিলাম ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিনি, "আমাকে কেন?"
আজ যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে জিজ্ঞাসা করতে পারিনা, "আমাকে কেন?"

সুখ তোমাকে মাধুর্যে রাখে,
অ-সুখ তোমাকে শক্তিমান রাখে,
দুঃখ তোমাকে মানবিক রাখে,
অকৃতকার্যতা তোমাকে বিনয়ে রাখে,
কৃতকার্যতা তোমাকে যশোদীপ্ত রাখে,
কিন্তু কেবল ঈশ্বর তোমাকে বাঁচিয়ে রাখে।

চট্টগ্রাম, কক্স বাজার, মহেশখালি

তীব্র চিৎকার করে সাইরেন বাজছে, আমি মনে মনে তৈরি গাড়ির জন্য, অগ্নি নির্বাপণের গাড়ি বা শান্ত্রী পারিষদ পরিবেষ্টিত মন্ত্রীর গাড়ি। কিন্তু কোনোও গাড়ি এলো না। ঋতা বলে উঠে, 'জাহাঙ্গীর, তুমি পাশে কোথাও গাড়ি থামিয়ে ইফতার করে নাও।' জাহাঙ্গীর গাড়ি না থামিয়ে আরও দশ বারো মিনিট চালিয়ে একেবারে সমুদ্রের কাছে নিয়ে গিয়ে থামায়। সে ইফতার করতে যায়। আমরাও নেমে সমুদ্রপাড়ের বাঁধের পাশে গিয়ে দাঁড়াই। দূরে থেমে থাকা জাহাজের শ্রেণি আলোর মালায় ঝকমক করছে। কিন্তু সমুদ্রতীর এখানে শ্রীহীন, কুৎসিতই বলা চলে। ভূমিখণ্ডকে রক্ষা করার জন্য কংক্রিটের বড় বড় চৌকো খণ্ড বিপজ্জনক ভাবে অসমান করে ফেলে রাখা। সামনে কর্দমাক্ত ভূমি। একেবারেই ভাল লাগে না। চল, যাই। জাহাঙ্গীরও ইফতার সেরে চলে এসেছে। সুতরাং, পা চালিয়ে গিয়ে গাড়ীতে বসি। 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনও খানে।

ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম চলে এসেছি। একেবারেই মানসিক প্রস্তুতি ছিলো না। শ্রীমান মণিলাল কিন্তু মন স্থির করেই এসেছিল। সুতরাং, তার দার্ঢ্যের কাছে শির নত করে বাংলাদেশের অন্যতম ভাল ট্রেন সুবর্ণা-তে নভেম্বরের দশ তারিখে ২০০৩ চট্টগ্রাম যাওয়াই স্থির হলো। ঢাকা রেল স্টেশনে বসে বসেও উদ্বেগ। আমাদের ডাক্তার পার্থ টিকিট কেটেছে। সে-ই টিকিট নিয়ে আসবে। তার দেখা নেই। মিনিটগুলি চলে যাচ্ছে। ডাক্তার আসতে আসতে গাড়ি চলে যাবে না তো? নাহ্, ডাক্তার গাড়ি ছাড়ার আগেই এসেছে, আমাদেরকে 'ঠ' কম্পার্টমেন্টে বসিয়ে দুটো কথা বলে নেমে গেছে। সময় হয়ে গেল গাড়ি ছাড়ার। সে বাসে আসছিল। যানজটে বেসামাল হয়ে বাস থেকে নেমে রিক্সায় বসেছে। শেষমেশ শ্রীচরণ নির্ভর করে দৌড়ে এসে 'সুবর্ণা'কে ধরেছে। কী কাণ্ড বলুন! আমরা এখন খুব বেড়াই। দিল্লী, কলকাতা, মুম্বাই, চেন্নাই, লন্ডন, প্যারিস সর্বত্রই যানজট দেখেছি। কিন্তু এই বিষয়টিতে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা অসাধারণ। এখানকার যানজট অতুলনীয়। এত রিক্সাও বোধহয় পৃথিবীর আর কোথাও নেই! এখানে ভরসা করা যায় একমাত্র পা দুটির উপরই। ডাক্তার পার্থকে আজ তাই করতে হলো। এমনই হয়। বহুদিন আগে একটা গল্প শুনেছিলাম। তখন পূর্ব পাকিস্তানে কয়লার বড় অভাব। রেলগাড়ি চালাতে কাঠের ব্যবহার হচ্ছিল। গাড়ি চলছিল ধীরে ধীরে। সেই সময় আখাউরা থেকে সিলেটগামী গাড়িতে দরজার কাছের আসনে বসেছিলেন এক দারোগা সাহেব। রেল লাইনেব পাশ দিয়ে হাটছিলেন এক দিদিমা, বয়সের ভারে ন্যুব্জপৃষ্ঠ, তাতে আবার একটি ঝুড়ি কোমরের কাছে হাত দিয়ে ধরা। মাথার চুল শনের গোছা, খোলা পিঠের চামড়া শত কুঞ্চিত। দারোগা সাহেবের করুণা হয়। তিনি বুড়িকে বলেন, 'ও দাদি, উইঠ্যা পড়'। দাদি কিন্তু উঠলেন না। বললেন, 'নাগো, আমার তড়াতড়ি আছে'। ঢাকা শহরে গাড়ি পেট্রোলেই চলে। কিন্তু যানযটের জন্য মাঝে মাঝেই এমন থেমে থাকে যে যার 'তড়াতড়ি আছে' সে হেটেই জট পার হয়। আজ দন্ত চিকিৎসক পার্থকে তাই করতে হলো। দৌড়ে পৌঁছলো সে ঢাকা রেল স্টেশনে। পার্থের মাতৃদেবী ঋতা পুত্রের

শরীরের অস্থি চর্মসার অবস্থা দেখে বড় চিন্তিত। তিনি পুত্রকে হাড্ডিমন্ত্রী বলেন। তাকে গল্প শোনাই জর্জ বানার্ড শ' এর। সারাটা জীবন তিনি ঐ হাড্ডিমন্ত্রী চেহারা নিয়ে যাপন করেছেন। সত্তর বছর বয়সে তাঁর স্বাস্থ্যের রুটিন চেক আপের পর চিকিৎসক সার্বিক মন্তব্য করেছিলেন, 'Abnormally normal'. বলি, শরীরে মাংস থেকে লাফিং বুদ্ধার মতো চেহারা হওয়া কোনও কাজের কথা নয়। সুস্থ স্বাস্থ্য ও মেদ মাংসহীন দেহই আসল বস্তু। বলি আমাদের পুত্র প্রসূনের কথা। পিলানীতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময় ফোন করে হ্যালো শুনেই সে এক শ্বাসে মাকে বলতো, 'মা, ভাল আছি। দুধ খাই। রোজ মাথায় তেল দিয়ে স্নান করি।' মাতো এসব কথাই জিজ্ঞাসা করে অনর্থক পয়সা খরচ করবে' তাই এইসব অবান্তর রুটিন প্রশ্নের উত্তর প্রশ্ন করার আগেই সে দিয়ে যেত। একবার আরও মজা করেছিল। গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ি এসেছে। তার মা ও ঠাকুরমা তাকে দেখেই একযোগে বলে উঠে, 'ইস্ কি চেহারা করেছ? ওরা খেতে দেয় না?' সে হেসে বলে, 'শুনে এসেছি, আমজাদখান বাড়িতে গেছে আর তার মা ও ঠাকুরমা বলছে এই কথা।' প্রসূনের মা ও ঠাকুরমা একথা শুনে হেসে ফেলেন। ওঁরাও চিত্রাভিনেতা স্থূলবপু আমজাদখানকে চিনতেন। 'শোলে' সিনেমার দৌলতে আমজাদ খান, অমিতাভ বচ্চন আর হেমা মালিনীর জনপ্রিয়তা তখন তুঙ্গে!

ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের দূরত্ব ৩১২ কিলোমিটার। সুবর্ণা নামক ট্রেনটি একটু অভিজাত। সারাটা গাড়ি 'শোভন' শ্রেণির। ভাড়া ১৬৫ টাকা করে। স্টেশনের প্লাটফর্মে বসে একজন অপেক্ষমান যাত্রীর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে দিলাম। তিনি জানালেন যে গাড়িটি প্রথম প্রথম খুবই ভাল ছিল। ঢাকা থেকে বিকেল পাঁচটায় ছেড়ে পাঁচ ঘণ্টা চলে রাত দশটায় চট্টগ্রাম পৌঁছতো। অনেক দিনই পনেরো বিশ মিনিট আগে পৌঁছে যেতো। এখন সাড়ে চারটেয় ছাড়ে। ছ'ঘণ্টা চলে রাত সাড়ে দশটায় পৌঁছে যাওয়ার কথা। প্রায় দিনই এগারোটা বেজে যায়। তবু এখনো এটাই চট্টগ্রাম যাওয়ার সবচেয়ে ভালো ট্রেন। নন স্টপ তো! গাড়িটি ভালোই। তবে চেয়ারগুলি এখন অনড়। চেয়ারের সাদা কভারগুলো ছাই রঙা হয়ে গেছে। ধুলে বড় ভাল হতো। গা ঘিন ঘিন করে। কিন্তু একটা জিনিস খুব ভাল লেগেছে। চায়ের কাপগুলি বড় বড়। কাপ ও ডিশগুলি ঝক ঝক করছে। কিন্তু যাত্রী বড় কম। ১৫% আসনও ভর্তি হয় নি। কারণ দুটি। প্রথমত রমজান মাসে লোকে ভ্রমণ করে কম। দ্বিতীয়ত বাসের সঙ্গে ট্রেন প্রতিযোগিতায় হেরে যাচ্ছে। লোকের এখন পয়সাও প্রচুর। ২৯০ টাকা ভাড়া দিয়ে মানুষ এসি বাসে চলে যায়। বাস যখন তখন পাওয়া যায়। ট্রেনের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অপেক্ষা করে কে?

রাত এগারোটায় চট্টগ্রাম স্টেশনে গাড়ি থামে। মণিলালের অগ্রজ হেডমাস্টারমশাই স্টেশনে আসার কথা। আমরা স্টেশনপ্রান্তে এলাম। কিন্তু জহরলালকে দেখতে পেলাম না। তবে মণি নিশ্চিত যে তিনি এসেছেন। আমাদেরকে দাঁড়াতে বলে সে আবার পেছন দিকে যায়। ক'মিনিট পরেই দাদাকে নিয়ে ফিরে আসে। স্টেশন থেকে বেরিয়ে অটো নিয়ে রাত সাড়ে এগারোটায় তাদের বাড়ি। বাংলাদেশ টাইম। ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম থেকে আধ ঘণ্টা বেশি। ভারতে তখন রাত এগারোটা। একটু হাতমুখ ধোওয়া, একটু বসা, খাওয়া, গল্প, তারপর শয্যা। রাত একটা। ঋতা সেই মধ্য রাতেও পরিপাটি খাওয়ালো। বললো যে আমাদের

বিব্রত বোধ করার কোনও কারণ নেই। ছেলেরা বড় হয়েছে, বাইরে থাকছে, বাড়িতে এখন ওরা দুজনই। কিন্তু দুজনের নৈশাহার করতে প্রায় প্রতিদিনই মধ্যরাত হয়ে যায়। মুম্বাই এর মত এই চট্টগ্রামেও মানুষ রাত সাড়ে দশটায় এগারোটায় বেড়াতে আসে যায়। আমরা অভ্যস্ত নই। রাতের খাওয়া সাড়ে নটায় শেষ করি। ইংল্যান্ডে ছেলের বাড়িতেও দশটার মধ্যেই খেতে চেষ্টা করতাম।

সাকচিতে থাকা কালে কলেজের কোয়ার্টার্সে থাকার সময়ে আত্মজন ও নিকট প্রতিবেশি ছিলেন অধ্যাপক কৃষ্ণকিশোর (চক্রবর্তী) দা। দাদার মা ও আমার মা বন্ধু হয়ে পড়েছিলেন। ওরা চট্টগ্রামের লোক। তবে কথাবার্তা তো হতো স্থানীয় বাংলায়। খুব উৎসাহী হয়ে পড়লে মাসিমা অজান্তে চটুল ভাষায় কথা বলে ফেলতেন। তখন আমরা বুঝতে পারতাম না। ফ্রান্সে সুইজারল্যান্ডে ওই দেশীদের কথাও বুঝতে পারতাম না। তাতে কিছু মনে হতো না। এসব তো না বুঝারই কথা। ইংল্যান্ড আমেরিকায় ইংরেজিও বুঝতে না পারলে খুব বিব্রত বোধ করতাম। বত্রিশ বছর কলেজে ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজী পড়িয়েছি, হায়দরাবাদ এর সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউটে দুবছর থেকে এই ভাষার ট্রেনিং নিয়েছি। তাও বুঝি না। সব দুঃখ চলে গেল চট্টগ্রামে এসে। ডাঃ সমীর দাসের বাড়ীতে বসে যখন রিঙ্কু, সুলেখা, বেবি, ঋতাদের কথা শুনছিলাম তখন মাতৃভাষা বাংলার একটি শব্দও বুঝতে পারছিলাম না। ইংরেজি ফ্রেঞ্চ, জার্মান, রোমান্স না বুঝলে কী আসে যায়? মনে পড়ে সৈয়দ মুজতবা আলীর কথা।

বাংলার বরেণ্য সন্তান সৈয়দ মুজতবা আলী। 'দেশ' পত্রিকায় তার লেখা বের হতো। পত্রিকাটা এলে ওঁর লেখাটা সবচেয়ে আগেই পড়তাম। তারপর সপ্তাহভর অপেক্ষা, পরের কিস্তির জন্য। তাঁর একটা গল্পের কথা বলি। অনেকদিন আগে পড়া। কিঞ্চিৎ ভুলচুক হতে পারে। সুধীজন ক্ষমা করবেন। কায়রো শহর। আলী সাহেব খাঁটি মিশরীয় পোশাক পরে রাস্তায় হাঁটছেন। তাঁর পোশাক খুবই দুরস্ত। তিনি ভাবছেন যে এখন তাঁকে দেখলে তাঁর আম্মাজানও চিনতে পারতেন না। ভাবামাত্রই তাঁর পায়ের উপর কি যেন একটা পড়লো। তিনি দেখলেন, একটি লোক তাঁর পায়ের উপর পড়ে সিলেটি ভাষায় কি যেন বলছে। আলী সাহেব নিজে নিজের কান টানলেন, গালে থাপ্পড় মারলেন এবং আম্মাজানও তাকে চিনতে পারবেন না' ভাবার মতো গোস্তাকী করার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেন। পোশাকে কি হয়। তাঁর গায়ে যে সিলেটি গন্ধ। অচেনা দেশের ভাই শকুর মামুদ তাকে ঠিক চিনতে পেরেছে। এবার লোকটিকে জিজ্ঞেস করে জানলেন যে তিনি সীমান। আলেকজান্দ্রিয়ায় জাহাজ রেখে তিনি কায়রোতে স্ফূর্তি করতে এসেছিলেন। মৌতাত একটু বেশিই হয়ে পড়েছিল। তিনি ফিরে গিয়ে দেখেন জাহাজ চলে গেছে। মিঞার মাথায় হাত। পাশপোর্টও জাহাজে। ফিরে এলেন কায়রোয়। গেলেন ব্রিটিশ অফিসে। ওরা ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কী করেন? আলী সাহেব ওকে নিয়ে গেলেন সেখানে। গিয়ে দেখেন অফিসার রবার্ট ওঁর চেনা মানুষ। কিন্তু সঙ্গের মিঞাকে দেখেই রবার্ট রেগে গেলেন। বললেন যে ওটা মিথ্যেবাদী। রবার্ট কলকাতায় চৌদ্দ বছর ছিলেন। বাংলাটা ভালই জানেন। কিন্তু ঐ লোকটা পনের মিনিট ধরে কথা বললো, ধ্যান তেনানি করলো, বললো ও বাঙালি। অথচ রবার্ট ওর কথা একটাও বোঝেন নি। ওটা-মিথ্যেবাদী নয়?

আলী সাহেব—তুমি ওয়েলস্ এর লোকদের কথা শুনেছ?

রবার্ট—হ্যাঁ

আ. সা—ওদের কথা বুঝ?

রবার্ট—না।

আ. সা—ওরা কোন ভাষায় কথা বলে?

রবার্ট—ওরা তো বলে ইংরেজিই বলে।

আ. সা—সিলেট বাংলার ওয়েলস্। কলকাতায় চৌদ্দপুরুষ নয়, তোমার ফোরটিন জেনারেশান থাকলেও সিলেটি বুঝবে না। ওর সিলেটিটাও বাংলা। ও মিথ্যে বলে নি। ওকে কাগজ পত্র দাও।

চট্টগ্রামে রিঙ্কুর গাড়িতে বসে রিঙ্কু, সুলেখা, বেবী, রমা, ঋতার কথা শুনে আমারও সেই অবস্থা। কিছুই বুঝছিলাম না। অথচ ওরা বাংলাই বলছিল। বাংলা ভাষার চট্টল ডায়ালেক্ট। চট্টগ্রাম চন্দ্রনাথ, আদিনাথ এর স্থান। মহাদেবগণ চট্টল ডায়ালেক্ট বুঝেন তো?

রাতে রিঙ্কুর গাড়িতে এক চক্কর মারা গেল। মোক্তার আহমেদ এর বাড়িতে দীর্ঘক্ষণ বসা গেল। ঋতাদের সঙ্গে খুব ভাব। মোক্তার এর স্ত্রীর নাম শামসেদ বেগম রীণা। একেবারে বাচ্চা মেয়ে। আমাদের সন্তানদের চেয়ে অনেক ছোট। ইতিমধ্যেই দুটো মেয়ে। বড়টির নাম নিশি। ছোটর কী নাম জিজ্ঞেস করাতে নিশি জানায় ওর নাম কালা ভুতি। তার কী হাসি! পরে জানা গেল নিশির বোনের নাম ইশি। সেদিন কথায় কথায় ডঃ আনিসুজ্জমানের কাছে শোনা দুটো কথা মোক্তার আহমেদের সঙ্গে কথা বলে একটু ঝালিয়ে নিলাম। দুটোই নামাজ সম্বন্ধীয়। প্রচলিত মতে আমরাও জানি নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত পড়া হয়—ফজর, জোহর, আসর, মগরে ও এসা। কিন্তু বিশেষ ভক্ত মুসলমানের আরও একটি নামাজ আছে। সেটির সময় হিন্দুর ব্রাহ্ম মুহূর্ত-রাত সাড়ে তিনটা। তাহাজ্জুদ-এর এই নামাজ সকলের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। সময়টা সাধারণ মানুষের গভীর ঘুমের। সেইজন্য এই নামাজটির জন্য আজানও নেই। আরেকটি কথা আজান সম্পর্কিত। ফজরের নামাজ ভোর রাতে। লোকে তখন ঘুমোয়। কিন্তু আজান নিদ্রিত মানুষকে জাগিয়ে তুলে বলে, ঘুমের চেয়ে নামাজ ভালো। মাহে রমজানে আরও একটি বিশেষ নামাজ পড়া হয়। এটির নাম তারাবির নামাজ। ডঃ আনিসুজ্জমানের বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। তার চিন্তার ঋজুতা মানুষকে মুগ্ধ করে। চট্টগ্রামের রাস্তার হাঁটার সময় দেখা হয়ে যায় রহমান সাহেবের সঙ্গেও। কেমন করে জানি কথা সাম্প্রদায়িকতায় চলে যায়। রহমান সাহেব বলেন যে চিটাগাংএ সাম্প্রদায়িকতা প্রকট নয়। ইলেকশানের সময় হিন্দুগণ চিহ্নিত হয়ে যান। সবাই মনে করে হিন্দুরা আওয়ামী লীগকে ভোট দেবে। তাই এসে হিন্দু এলাকায় বলে যায় ভোটের দিনে, আপনাদের ভোট দিতে যেতে হবে না। আপনাদের ভোট আমরা পেয়ে আছি। কথাটায় শাসনী থাকে। আমি বলি, এসব ভারতেও হয়, আরও বেশি হয়, খুনোখুনি হয়। তবে ভারতে হয় দলের নামে, মজহবের নামে নয়। রহমান বলেন যে কথাটা ঠিক নয়। হিন্দুরা সবাই আওয়ামী লীগ, এই ধারণাটা অসত্য। বহু হিন্দু বি এন পি কে ভোট দেয়। হিন্দু বি এন পি মন্ত্রী হয়। কিন্তু বললে কী হবে।

মানুষের ভুলের প্রতি বিশ্বাসই বেশি হয়। সংবাদ বিশ্বাস না করলেও মানুষ গুজব বিশ্বাস করে। সুসংস্কারের প্রতি আকর্ষণ মানুষের শিখিয়ে পড়িয়েও করানো কঠিন, কিন্তু কুসংস্কারের প্রতি মানুষ কেউ কিছু না বললেও ঝুকে পড়ে। শতবার বোঝালেও সে বোঝে না।

এগারোই নভেম্বর (২০০৩) স্নানাদি ও প্রাতরাশ সেরে চালক জাহাঙ্গীরের অভিভাবকত্বে ছোট গাড়ি করে বেরিয়ে গেলাম। মণিলাল, ঋতা, বেলা ও আমি এই চারজন যাত্রী। প্রথমে গেলাম শ্রীমৎ রামঠাকুরের স্মৃতি পূত কৈবল্যধামে। সমগ্র বাঙালি সমাজে রামঠাকুর একটি শ্রদ্ধাস্পদ পরিচিত নাম। অনেক প্রায়-অবিশ্বাস্য কাহিনী প্রচলিত আছে এই মহাসাধকের নামে। ভক্তগণ রামঠাকুরকে ভগবান মনে করেন। ঠাকুরের জীবৎকালে যত অলৌকিক-প্রায় কথা ও কাহিনী প্রচলিত হয়েছিল তার মধ্যে ঠাকুরের একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা হওয়ার কথা সবচেয়ে বেশি প্রচলিত হয়েছিল। সেগুলি বিভিন্ন পুস্তকে নথিভূক্ত হয়েছে। পরম শ্রদ্ধায় মানুষ সেগুলি পড়েন ও আলোচনা করেন। রামঠাকুর ব্যবহারে পরম বিনয়ী ছিলেন, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে তিনি সম্মান সূচক 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন। লজ্জিত, সঙ্কুচিত শিষ্যবর্গের শত আবেদনেও তাঁর ভাষার পরিবর্তন হতো না। সেই রামঠাকুরজীর আশ্রম এই কৈবল্যধাম। মণিলালের আগ্রহাতিশয্যে চট্টগ্রাম আসা এবং শ্রীমতী ঋতার সৈনাপত্যে আজ বেরিয়ে পড়া এবং এই কৈবল্যধাম দর্শন। এখানকার একজন সেবাইত আমাদেরকে ঠাকুরের কথা বললেন। তিনি এরকম পীঠস্থানের পক্ষে ছিলেন না। কিন্তু শিষ্যবর্গের অনুরোধে তিনি রাজি হন এবং তাঁদের সঙ্গে ভারত ভূমির নানা পবিত্র স্থান পরিদর্শন করেন। কিন্তু কোন জায়গাই তাঁর মনঃপুত হয় না। পরে বঙ্গদেশেও অনেক জায়গা দেখে তবে জঙ্গলাকীর্ণ মনুষ্যবাস শূন্য এই টিলাভূমিটি তিনি পছন্দ করেন। চট্টগ্রাম নগর এলাকার অদূরে তবে গড়ে উঠে 'কৈবল্যধাম'। ভক্তগণ শ্রম ও অর্থদান করে স্থানটিতে একটি সুদৃশ্য এবং শান্তিময় তীর্থ গড়ে তুলেছিলেন। বড় ভাল লাগলো। দেখা হয়ে গেলো আমাদের শহরের কিছু জানাশোনা মানুষের সঙ্গে। ওরা এখানে থাকবেন ক'দিন। আগরতলা শহরেও রামঠাকুরের বড় মন্দির কমপ্লেক্স গড়ে উঠেছে। সেখানে বন্ধুবর্গ দীপক সেন, বিদেশচন্দ্র সাহা প্রমুখ মান্যগণ্য নাগরিকগণ ক্লান্তিহীন পরিশ্রম করছেন। কৈবল্যধামে তীর্থ পরিক্রমা শেষ করে জাহাঙ্গীরের গাড়ি আবার চলে। এবার গন্তব্য স্থল সীতাকুণ্ড। কুণ্ডটি একটি পুকুর, সঙ্গে একটি ছোটো মন্দির-ভৈরববাড়ি। কুণ্ডটির নাম ব্যাসকুণ্ড। পুকুরের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গায়ে পবিত্র বারির পরশ নিলাম। মণিলাল রাস্তার ওপারে 'শঙ্কর মঠে' গিয়ে টিকিট কিনলো আমাদের মধ্যাহ্নে প্রসাদ পাবার। টিকিট কেনা থাকলে মধ্যাহ্নের পরিবর্তে অপরাহ্ন হয়ে গেলেও প্রসাদ পাওয়া যাবে। আবার গাড়িতে বসে অনতিদূরে ভবানী মন্দিরে যাওয়া হলো। দেখলাম মন্দিরটি সংস্কার করেছেন চুয়াডাঙ্গা ও ঢাকার মোদী ভ্রাতাগণ। এরা বহু জায়গায় এরকম কাজ করছেন। এবার গাড়ি রেখে সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠা গেল স্বয়ম্ভু শিব মন্দিরে প্রণামাদি সেরে এবার মন তৈরি করা পরবর্তী গ্র্যান্ড পিলগ্রিমেজ এর জন্য।

স্বয়ম্ভু মহাদেবের বাড়ি থেকেই গ্র্যান্ড পিলগ্রিমেজ বা চন্দ্রনাথ মন্দিরে যাত্রা আরম্ভ হয়। পাহাড়ের চূড়ায় মন্দিরটি এখান থেকেই দেখা যায় ছোট্ট খেলনার মত বসে আছে। পায়ে হেঁটেই উঠতে হয় মন্দিরে। উঠা কষ্টকর। পথের দুরতিক্রম্যতা সম্বন্ধে নানা গুজব তৈরি

করে মানুষ পথটিকে অনর্থক ভয়াবহ করে তুলেছে। ঢাকাতেই আমাকে দুজনে বলেছে যে সিঁড়ির সংখ্যা বাইশ শো। সীতাকুণ্ডে শোনা গেল সিঁড়ি সতেরো শো। কিন্তু পথ সঙ্কীর্ণ, পড়ে গেলে মৃত্যু অবধারিত। ভবানী মন্দিরে বসা একজন জানালেন দস্যুর কথাও। তাঁর পরামর্শ একজন গাইড নিয়ে যাওয়া। শ'দেড়েক টাকা দিলেই একজন গাইড পাওয়া সম্ভব। হাবে ভাবে বুঝা গেল তিনি নিজেই গাইড হতে সম্মত হতে পারেন যথাযোগ্য দক্ষিণা দিলে এবং মাত্রাতিরিক্ত অনুরোধ করলে। সব শুনে আমরা স্বয়ম্ভু মন্দিরে পৌঁছলাম। বেলা শ্বাসকষ্টের রোগী, হাতে ইনহেলার। আমি হৃৎপিণ্ডের ইসকেমিয়া নিয়ে ঘুরে বেড়াই, প্রতিদিন আইসো সরবাইড মনোনাইট্রেট ও অ্যাসপিরিনের নৈবদ্য চড়াই। ঋতা ও তেমন শক্ত নয়। সে বার দশেক বোধ হয় স্বয়ম্ভু শিবের মন্দিরে এসে শির নত করেছে, চন্দ্রনাথে উঠার পায়তারা কষেছে, কিন্তু সাহস করেনি। এই তো কিছুদিন আগেও ললিতা জবাদেরকে নিয়ে এখানে এসেছিল, উপরের দিকে তাকিয়ে করজোড়ে নমস্তে জানিয়ে চলে গেছে ফিরে। ঈশ্বরেচ্ছায় সুস্থ ও সাহসী মণিলাল। সে কাজ করে চুপচাপ, কথা বলে কম। সুস্মিত মুখে সে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি ভীতু, সর্বজনবিদিত। নায়গ্রার চূড়ায় উঠিনি বেলা উঠেছে, প্রসূন মুদিতা উঠেছে। প্যারিসে ঐ গির্জাটির সামনে দাঁড়িয়ে প্রণাম করেছি, দুজনের কেউই উঠিনি। আমেরিকায় শেনানডোয়া পথে ব্লুরিজ মাউন্টেনের ফুট ট্রেল থেকেও আমি বিদায় নিয়েছিলাম। একটু বেশি উপর দিকে হাটলেই বুক ব্যথা দিয়ে জানান দেয়, ভাল হচ্ছে না ব্যাপারটা। আজও আমি রণে ভঙ্গ দিলাম। বেলা দৃঢ়-সঙ্কল্প উঠবেই। হাতে ইনহেলার নিয়ে এগুলো। ঋতা মণিও যাবে। আমি মিনিট কয়েক সঙ্গে গিয়ে ফিরে এসে বসলাম স্বয়ম্ভুর সামনের নাট মন্দিরে। দু'এক জন আসছে ও উপরে যাচ্ছে। এক আধজন নামছে লাকড়ি বা মুলি বাঁশের বোঝা কাঁধে নিয়ে। আমি বসি, দাঁড়াই, হাঁটি আর ঘনঘন কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখি। এক, দেড়, দু'ঘণ্টা পার হয়। আমার উদ্বেগ বাড়ে। এবার ইংল্যান্ডে পুত্র প্রসূনের এপার্টমেন্টটি ছিল তিন তলায়। প্রায় প্রতিদিন তিন তলা সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠে ইনহেলার এর দুটো পাফ নিয়ে বেলা বলতো, 'তোমার বাড়িতে লিফট থাকলে ভাল হতো বাবা।' আজ তাকে ৩০/৪০ তলা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে দিলাম! না জানি মণি ও ঋতা আজ বেলাকে নিয়ে কি বিপদেই পড়েছে। আমার তো সাহস নেই উপরে গিয়ে দেখি কী হচ্ছে। আড়াই ঘণ্টা যায়। ওরা ঠিক বারোটায় বেরিয়েছে এখন আড়াইটা বাজে। এক জনকে জিজ্ঞেস করি কতক্ষণ লাগে উঠতে নামতে। তিনি জবাব দেন, তিন চার ঘণ্টা। আমার মন আরও খারাপ হয়। মিনিটগুলি পার হয়। দু'টি ছেলে আসে অসুস্থ মাকে নিয়ে। মায়ের বড় আকাঙ্ক্ষা পাহাড়ে উঠার। কিন্তু অসুস্থ যে, যায় কেমন করে? তবু যাবে। যতটা পারে যাবে। সেখান থেকেই ফিরে আসবে। আমার ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করে নিজেকে। ওদের সঙ্গেই যাব। পা বাড়াই। মণি ফিরে আসে। হাতে লাঠি, মুখে শ্রান্তির চিহ্ন। বলে বাবা! ওরা আসছে। তোমার ক্ষুধা লেগেছে না?' একটা আপেল দেয় থলে থেকে খুলে। হাত বাড়িয়ে নিই। মণি আবার ফিরে যায় ওদের আনতে। আমিও এগোই। একটু এগুতেই দেখি ওরা নামছে। বিধ্বস্ত চেহারা। সঙ্গের যুবকটি মাতৃ সঙ্গীত গাইছে। চেহারা বিধ্বস্ত হলেও ঋতা মা এবং বেলার মুখে বিজয়িনীর

হাসি, সমস্ত সংসাবেব তৃপ্তি। ওবা চন্দ্রনাথে উঠেছে প্রণাম কবেছে ও পূজো দিয়েছে। মাতৃ সঙ্গীত গাযক ঐ যুবকটি চন্দ্রনাথ মন্দিরেব পুবোহিত প্রত্যেকদিন সে নীচে স্বযম্ভু মহাদেবেব বাড়ি থেকে আবো নীচে তাব বাড়ি থেকে চন্দ্রনাথ মন্দিবে উঠে আসে ঠাকুবেব নিত্য পূজা দেয আব এমন সময নেমে যায দর্শনার্থী বেশি থাকলে তাব আসতে দেবি হয ভাযেব কথা, চোব ডাকাতেব কথা পা হডকে পডে গেলেই অবধাবিত মৃত্য, ইত্যাদিব কথা, একেবাবে বানানো। আসলে মানুষ অন্যকে ভয পাইযে দিতে পাবলে খুশি হয তবে এখানে অন্যা না জেনে আমাদেব ক্ষতি কবেছে। ওদেব গুজবকথাতে তীর্থযাত্রী বহু তীর্থযাত্রী, সত্যি সত্যি স্বযম্ভু মহাদেবেব মন্দিব পর্যন্ত এসেও ফিবে যান আমি নিজেব দিকে তাকাই আমিও সেই দলেবই একজন নাকি ভেবে। আমাদেব নেতৃ শ্রীমত ঋত নেতৃজনোচিত ভাষায বলেন ঠিকই তো, তা ছাড়া মা আছে (বেলাব কথা বলছে) দেখলাম মা যদি ষাট বছব বযসে ইনহেলাব হাতে নিযে এগিযে যায সাহস কবে আমি তবে কোন মুখে পিছু হটি? জয বাবা চন্দ্রনাথ বলছি কিন্তু পাহাব বাবা বিশ্বাস কবতে চাইছ না যে সত্যি সত্যি আমি চন্দ্রনাথ মন্দবে উঠে প্রণাম কবে এসেছি।

দিন দুই পবে শ্রীমান জহবলাল আমাদেবকে নিযে যান চটগ্রাম শহবে আন্দব দীঘিব পশ্চিম পাড অঞ্চলে বামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে সেখান থেকে আমাবই অনুবোধে কিনে দেন সদ্য (মাচ মাস ২০০৩) ঢাকা থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ বাংলাদেশে শ্রীবামকৃষ্ণ ও তাব পার্ষদবৃন্দ'। আমবা এখানে বড ভাল আছি কিন্তু তুলনা ডলাব যা এনেছি শ্রীমান মণি তা সযত্নে বেখে দিযে আমাদেব খাদ্য পানীয আশ্রয (হোটেল) যাব যা বাযনাক্কা যেমন ঐ বইটি কিনে দাও সব মেটাচ্ছে এখন অবশ্য মণি আসেনি এসেছে আমাদেব বড়ো পুত্র জহব মণি জহব ঋতা এবা পাল্লা দিযে আমাদেব আদব কবছে সকল আবদাব সহ্য কবছে এবং বাবা' মা ডেকে ডেকে আমাদেব বিহ্বল কবে দিচ্ছে হোমাবএব মহাকাব্য ওডিসি তে একটি লোটাস ল্যাণ্ড এব কথা আছে। সে দেশে গেলে ঐ লোটাস ফল খেলে মানুষ তাব নিজেব দেশে যাওযাব কথা ভুলে যায এমন ভাব লেগে যায লোটাস ল্যাণ্ড। আমাদেব জন্য চট্টগ্রামে জহব ঋতাদেব এমত স্নেহ যেন দেশ ভুলানো লোটাস ল্যাণ্ড হযে উঠেছিল। বুড়ো শিশুদেব কত যে আদব পাওয়া সম্ভব তা জানতে হলে চট্টগ্রাম যেতে হবে জহব ঋতাব আশ্রযে। তাব শুধু কী ওবা? ওদেব স্বজনেবা এমনি স্নেহশীল। যে ডাক্তাব বাজাবদেব সঙ্গে পবিচয হলো সেতো স্নেহাৎই ছেলে মানুষ। কিন্তু তবও স্নেহেব ধাবা আমাদেবকে স্নাত কবেছে। ঠাকুব সকলকে ভাল বাখুন কামনা কবি

বই থেকে জানতে পাবি যে ১৯০১ সালে এপ্রিল মাসে স্বামী বিবেকানন্দ চন্দ্রনাথ পাহাডেব পাদদেশে অবস্থিত স্বযম্ভু শিবেব মন্দিরে এসেছিলেন এবং সেখান থেকেই চন্দ্রনাথকে প্রণাম কবেন। চন্দ্রনাথ শৃঙ্গেব উচ্চতা প্রায ১২০০ ফুট। এ শিখবে আবোহণ কবা সে সময বেশ কষ্ট সাধ্য ছিল। পর্বতেব গাযে জডানো লতা বা অন্যান্য গাছেব মূলই তীর্থযাত্রীদেব আবোহণেব সহাযক ছিল। এখন বোঝা যায সিঁডি তৈবি হযেছিল আবো পবে। তবে সে সিঁডি বেশিব ভাগ জাযগাতেই ভেঙ্গে গেছে। গত অর্দ্ধ শতাব্দীতে কোন সংস্কাব হয নি। তবে আজ দিগ্বিজয হযে গেল। মণিলালেব সঙ্গে হেটে ঋতা ও বেলা

উঠে গেল চন্দ্রনাথে এবং প্রণাম শেষে ফিরে এল। জয় চন্দ্রনাথ, জয় শিব শম্ভু ! (আমি শুধু ভাবি, কেমন করে ইট কাঠ পাথর বয়ে নিয়ে ওখানে তুলে মন্দির তৈরি হলো!) ওরা ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। আমরা সকলে ক্ষুধার্ত। গাড়িতে বসে সীতাকুণ্ড। যেহেতু টিকিট কাটা আছে তাই প্রসাদ পাওয়া গেল। আমাদের ভাগ্য প্রসন্ন। প্রণাম করা গেল শঙ্কর মঠের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী জ্যোতিশ্বরানন্দজী মহারাজকে, শোনা গেল সামান্য ক'টি কথা। তার পর ঘরে ফেরা-চট্টগ্রামে। দেখে এলাম ঝকঝকে নতুন চট্টগ্রাম বিমান বন্দর, সাগর বন্দর এবং পোতাশ্রয়। এখন রমজান, ঈদ আসছে। চট্টগ্রাম রাতে ঘুমায় না। শহর আলোয় আলোময়। সব দোকানী পসরা সাজিয়ে বসে আছে। ক্রেতার ভীড় মধ্যরাত্রেও কম নয়! মাহে রমজান না?

জহর আমাদেরকে চট্টগ্রাম শহর, বিশেষ করে দেবী চট্টলেশ্বরীর মন্দির, রামকৃষ্ণ আশ্রম এবং আরো কটি ভাল জায়গায় নিয়ে গেল। আমরা বলাই বাহুল্য, খুব প্রীত হলাম। তারপর গেলাম কক্সবাজারে। সৌদিয়া লাইনস এর বাস আমাদেরকে নিয়ে কক্সবাজারের দিকে রওয়ানা দেয় সকাল ন'টায়। তারপর প্রায় দুঘন্টা ধরে শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যাত্রী সংগ্রহ করে এবং শহর থেকে বার হওয়ার চেষ্টা করে কর্ণফুলি নদীর উপর দেওয়া প্রায় সত্তর বছর বয়সী সঙ্কীর্ণ ব্রীজ দিয়ে। অনেকক্ষণ পর ব্রীজে উঠার অনুমতি তো পাওয়া গেল। কিন্তু ব্রীজের অপর মুখের প্রায় কাছে কাজ হচ্ছে। মানুষ, কোদাল, গাইতি, চিৎকার, চেচামেচি, গরম ও থেমে থাকা। রমজানের মাস, তৃষ্ণায় বুক ফেটে গেলেও এবং বোতলে জল থাকলেও খেতে লজ্জা করে, অভদ্র ঠেকে। পাশের মানুষগুলি যে রোজায় আছেন। অবশেষে গেরো কাটে। কাজ শেষ হয়। গাড়ি ছাড়ার অনুমতি মেলে। গাড়ী চলে।

পৌছতে পৌছতে শেষ বিকেল। বাস থেকে নামা যায় না। ছিনে জোকের মত ধরেছে রিক্সা চালকের দল। বেশিরভাগই কিশোর। বাঁচবার দায়ে রিক্সা নিয়ে বেরিয়েছে। কিন্তু ছোট জায়গা। যাত্রী সংখ্যা সীমিত। ঐ যে ক'টি হোটেল, যাদের জায়গা দিল্লী, মুম্বাই, সিডনী, সিঙ্গাপুর, রিয়াদ ইত্যাদি যে-কোন জায়গায় হতে পারে, ওগুলোতে যারা বুকিং করে আসে তারা রিক্সা চড়ে না , ওরা ঝক ঝকে গাড়ি করে ঘুরে বেড়ায়। আর ঐ ক'টি হোটেলের চারপাশে যে হত দরিদ্র পঞ্চাশ বছর আগের ঢেউটিনের ছাউনী দেওয়া কালো কুচ্ছিৎ ঘরগুলি, যাতে পাখির বিষ্ঠার সাদা কদর্য দাগ, এগুলিতে যারা থাকে তারাও রিক্সা চড়ে না। তাদের জন্য জন্মদিনের উপহার খোদার দান দু'টি পা-ই আছে স্থান থেকে স্থানান্তরে যাওয়ার। একটু দূরে আছে মধ্যবিত্তের শহর, ছোট শহর। ওরা রিক্সা চড়ে, দর কষাকষি করে। আবহমান কাল ধরে ওরা কেবল "ইস্, কী দাম বেড়েছে দেখছেন?" বলে। যিনি বলেছেন তাঁর বাবাও একথা বলেছেন, ওর পিতামহও। আমি ওদের দলেই পড়ি। তবে কক্সবাজারে আমি মুক্ত পুরুষ। পুরুষ না বলে ছেলে মানুষ বলাই ভাল। সঙ্গে আছেন আমাদের বাবা মা, জহর ও ঋতা। আমাদের শুধু ওদের আঙ্গুল ধরে চলা। আমাদের জামায় পকেট নেই, সুতরাং ওয়ালেট নেই, সুতরাং পয়সা নেই, সুতরাং কোন ঝামেলাও নেই। আমাদের সব ফরসা।

পকেটের প্রসঙ্গ উঠাতে মনে পড়লো ছেলে বেলার কথা। আমাদের গ্রামে তখন সোয়া দুইজন সেলাইকল ওয়ালা লোক ছিলেন। আমরা তাদেরকে দরজি বা খলিফা বলতাম। এক মনু কাকা, দুই শৈলেন দা ও পোয়াজন আবদুল ভাই। আবদুল ভাই কাটাকুটি জানতেন

না। তিনি সেলাইকলটি মাথায় নিয়ে বাজারে বাজারে ঘুরে ঘুরে বসতেন আর সোজা কাজ লুঙ্গি বা তবন সেলাই করতেন। আজ বলবো শৈলেনদার কথা। তার কাছে খদ্দের আসতো গরিব গুর্বা। এরা নীচে ধুতি, পাজামা বা লুঙ্গি পরতো আর উপরে ফুলহাতা শার্ট বা পাঞ্জাবী পরতো। পরতো না, কাঁধে ভাজ করে রাখতো। একটা ফুল শার্টের সেলাই খরচ ছিল চৌদ্দ আনা। বেশির ভাগই খদ্দের দরিদ্র হলেও চালাক ছিল। কথোপকথন হতো এই রকম—

খদ্দের—আমার জামাটা হইচে?

দরজি—হ্যাঁ। ঐ যে। নেও। পয়সা কই?

খদ্দের—বারো আনা দিলাম। দুই আনা পরে ....।

দরজি—হুনো। ডাইনের জেবডা লাগাইছিনা। বাঁয়েরটার মদ্যে রাখছি। ফালাইও না। পয়সা নিয়া আইও, লাগাইয়া দিমু।

বলাবাহুল্য পয়সা বের হত, জেব লাগানো হত। জেবে পয়সা থাকে, তবে তা লাগাতেও পয়সা লাগে। কক্স বাজারে আমাদের জেব ছিল, তা খালি ছিল। তবে সঙ্গে মুস্কিল আসান বাবা-মা-রাও ছিল। সুতরাং আমাদের আবেদন নির্বাধ ছিল।

কক্সবাজারে জহর (লাল ধর) প্রধান শিক্ষক হিসাবে বেশ ক'বছরই কাটিয়ে গেছেন। তাই এখানটায় তাঁর সহকর্মী বন্ধু অনেক। তাছাড়া জহরলাল সহজ সরল আমুদে মানুষ, অঢেল কথা ও প্রাণখোলা হাসি হাসতে পারেন বলে কর্মক্ষেত্র বিদ্যালয় বা শিক্ষাবিভাগের বাইরেও তার প্রচুর পরিচিত মহল। বন্ধু ও বান্ধবের সংখ্যা সে মহলে কম নেই। সুতরাং আমরা দুজন নবার্জিত পিতা মাতাকে নিয়ে তাঁরা দুজন এক রাতের জন্য কক্সবাজার আসছেন এই সংবাদ ফোনে দেওয়ার পর আমাদের জন্য সুন্দর ব্যবস্থা করে রেখেছেন ওরা। একটি গেস্ট হাউসে আমাদের ব্যবস্থা হয়েছে। আমি বেলা, জহর, ঋতা, ঋতার এক বোন রমা ও শ্রীমান ডাক্তার মণিলাল। সুন্দর ব্যবস্থা। তবে এখানে রান্নার ব্যবস্থা নেই। থাকলেও তেমন কিছু ফারাক পড়তো না। এখন রমজান মাস। দিনের বেলা খাদ্য পানীয় জোগাড় করা সহজসাধ্য নয়। তবু যিনি সেবার ভার নিয়ে রেখেছেন তিনি বেশ করিৎ কর্মা দেখলাম। আমরা নাহান থেকে গোসল করে বেরুনোমাত্রই চায়ের জোগাড় এসে পড়লো এবং অনতি বিলম্বেই আহারের ব্যবস্থাও হলো। বিশ্রাম করে বেরিয়ে পড়া গেল কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত (বীচ) দেখতে। দৈর্ঘ্যে এই সৈকত নাকি এশিয়ার দীর্ঘতম। তবে তেমন জলুষ নেই। আমরা এ পর্যন্ত বহু সৈকত দেখেছি। ভারতে দ্বারকা, মুম্বাই, ত্রিবান্দ্রাম, রামেশ্বরম, পণ্ডিচেরি, মাদ্রাজ, পুরী ; আমেরিকায় বাল্টিমোর, ওল্ড টাউন আলেকজান্দ্রিয়া, আটলান্টিক সিটি, নিউইয়র্ক; ইংল্যান্ডে অল্ডবরা, লোয়েসফট ইত্যাদি। বেশিরভাগ সৈকতের আকর্ষণ বালি। অল্ডবরায় নুড়ি বা Shingles. কিন্তু কক্সবাজারে বাংলার স্নেহের পলি জমে বালি শক্ত হয়ে গেছে। সুদীর্ঘ সৈকতভূমি কালো পলিতে জমাট বাঁধা। কেউ সাঁতার কাটছে না সূর্যাস্ত কালে। সূর্যাস্তের কথায় মনে পড়লো ফটোগ্রাফার ও ছবির কথা। অনেক ছবি তোলা হল। একটা ছবি স্মরণ রাখার মতো। একজন বালক ছিল আমাদের সঙ্গে। তাকে হাত পেতে কিছু নিচ্ছে এমন করে দাঁড় করিয়ে ছবি নেওয়া হলো। ছবিতে দেখা যাচ্ছে সে অস্তগামী সূর্যকে হাতে নিয়ে দঁড়িয়ে আছে। সুন্দর!

তারপর গেস্ট হাউস। রাত কাটিয়ে সকাল ন'টায় বেরিয়ে পড়া গেল। গেস্ট হাউসটি ভাল। প্রধান কথা এই যে টয়লেট বিছানা ব্যবহারযোগ্য। মশারী খাটানোর মতো দড়ি জোগাড় হলো। আর কি চাই? গেস্ট হাউসে একটি বড় রঙীন টি.ভি. সেট আছে। কিছুই দেখা যায় না। তবু গেস্ট হাউসের এটেন্‌ডেন্ট অতি কষ্টে কি জানি দেখে, শুনে। সেটটি ভালো ছিল, কেবল লাইনও ছিল। সবাই আনন্দ করে দেখতো। কিন্তু একদিন ইন্সপেক্টার এলেন। তখন বি.বি.সি.র একটা কি জানি দেখানো হচ্ছিল। তরুণ ইন্সপেক্টার সাহেব কঠোরভাবে ইসলামী। তিনি টি.ভি স্ক্রিনে বে-আব্রু আওরত দেখে ক্ষেপে যান। টি.ভি.সেটে লাথি মেরে পায়ের আঙুলে ব্যথা পান, পটাপট সব তার ছিঁড়ে ফেলেন এবং বেশ ঘোরতর বে-আব্রু ভাষায় গালি গালাজ করে টি.ভি.র বারোটা বাজিয়ে ফেলেন। ভাবি, সারা বাংলা দেশে এমন কঠোর ইসলামী ইন্সপেক্টার কত জন আছেন? আর তার নিজের বাড়িতে টিভি আছে কী না। থাক গে। ইন্সপেক্টার বেঁচে থাকুন, টিভির শক্ত গায়ে লাথি মারাতে তার কোমল পদাঙ্গুলিতে যে ব্যাথা হয়েছিল তা আশা করি সহজেই সেরে গেছে। এমন কঠোর ইসলামী হওয়াতে তার হয়ত প্রমোশন হয়েছে চাকুরিতে।

আমরা ভারতবাসীরা ধর্ম নিয়ে তেমন মাথা ঘামাই না। আমরা স্বাধীনতা লাভ করার সময় হিন্দু ও মুসলমানেরা যাতে চিরকাল ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে বেসামাল হয়ে থাকতে পারি ইংরেজ সেজন্য ধর্মের নামে আমাদেরকে ত্রিখণ্ডিত করে স্বাধীন করে গেছে। আমরা ইংরেজের ক্যালকুলেশন মত মাঝে মাঝে দাঙ্গা ফাসাদ করেও বেঁচে বর্তে আছি। মুসলমানগণ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান পেয়েছিলেন। কিন্তু অনতিকাল মধ্যে প্রমাণিত হলো যে ধর্ম শান্তিতে বাস করার কোন রক্ষা কবচ নয়। (পশ্চিম) পাকিস্তানী মুসলমান নির্বিচারে বাংলাদেশের মা বোনদের ইজ্জত লুটতে লাগলো, বাংলাভাষায় কথা বলতে চাইলো বলে বাঙালি ঈমান ছাত্রদেরকে হত্যা করতে লাগলো। ফলে তথা কথিত পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ হয়ে গেল কিন্তু আচারশীল এবং বিচার ক্ষমতা শূন্য ইন্সপেক্টররা এখনো আছেন। এরা টিভিতে লাথি মেরে, তার ছিঁড়ে অনর্থক অন্য মানুষকে কষ্ট দেন। এবং ধর্মান্ধতার জন্য সমাজের প্রভূত ক্ষতি করেন। এরা বিনা কারণে অস্বস্তিকর প্রশ্ন করে বিব্রত করতে চান। এইতো সেদিন। আমাকে ঢাকায় এক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রশ্ন করেন, "প্রফেসার ধর, হিন্দুস্থানকে আপনারা সেকুলার বলেন। কতটুকু সেকুলার আপনারা? আমি বিনিতভাবে বলি, "আমরা সেকুলার জন্মলগ্ন থেকেই। কথাটা আমাদের সংবিধানে প্রবেশ করেছে ১৯৭৫ সালে, প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীজীর আমলে। বেশি কথা তো বলতে পারবো না, আর বললে আপনি বুঝতেও পারবেন না। সংক্ষেপে বলি শুনুন। এখন আমার দেশ ভারতের রাষ্ট্রপতি একজন মুসলমান। আমাদের প্রধানমন্ত্রী একজন হিন্দু এবং আমাদের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও মুখ্য নির্বাচন কমিশনারগণ খ্রিস্টান। আপনি আশা করি আমরা কতটা সেকুলার তা কিছুটা আন্দাজ করতে পারছেন?"

কোথা থেকে কোথাই চলে যাই। কথার খেই হারিয়ে ফেলি। অন্য কথায় চলে যাওয়াটা আমার মুদ্রাদোষ। মনে রাখার চেষ্টা করি যে কিছুতেই বেলাইন হবো না। কিন্তু মনে রাখা আর হয় না। মনই আমাকে বারবার পরাস্ত করে। চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্। তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম।" আজকে আমাদের যাওয়া হবে নতুন এক জায়গায়।

রিক্সা করে এসে সমুদ্রের পাড়ে যেখানে নামলাম, সে জায়গাটা বড়ই নোংরা, দুর্গন্ধময় ও কর্দমাক্ত। তখন ভাটার সময়। এখানে মাছ ধরার লোকেরা আছেন শতে শতে। মাছের গন্ধে বমি আসে। কাদার উপর দিয়ে সরু নড়বড়ে পুল। পুল পার হয়ে গিয়ে উঠে বসলাম স্পীড বোটে। এক একটা বোটে নয় দশ জন যাত্রী নেবে। যাব মহেশখালি দ্বীপে। সময় লাগবে পঁচিশ মিনিটের মতো। ভাড়া মাথা পিছু পঞ্চাশ টাকা। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। থ্রিলিং। পৌঁছে গেলাম গন্তব্য স্থলে। উঁচু বড় প্রশস্ত পাকা রাস্তা চলে গেছে দিগন্ত ভেদ করে। দুপাশে উপকূল রক্ষাকারী ম্যানগ্রোভের জঙ্গল। রিক্সা আছে। অনেকেই বলাবলি করছিলেন। শুনলাম যে এই রাস্তা মোহাম্মদ এরসাদ করিয়েছেন। আগে দুর্ভোগের সীমা পরিসীমা ছিল না। রিক্সা গিয়ে থামলো একটা ছোট্ট পাহাডের গোড়ায়। সামনে যতটা উঁচুতে পাহাড় চূড়ায় আদিনাথ মহাদেবের মন্দির, ডান দিকে ততটাই নীচে সাগর। ভেঙ্গে যাচ্ছিল পাহাড়। নীচে একটু মেরামতি করে আটকানো হয়েছে সমুদ্র গ্রাস। দূরে দূরে ছোট ছোট দ্বীপ মালার সবুজ শ্যামলিমা আর চারদিকে সমুদ্রের নীলিমা। মনে পড়ে কালিদাস—

দুরাদয়শ্চচক্রনিভস্য তন্বী তমালতালী বনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্ধারা নিবদ্ধেব কলঙ্করেখা ॥

নীচে দোকান থেকে নারকেল ও ডাব কিনলেন ঋতা ও রমা। সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠা গেল নাতি উচ্চ পাহাড় চূড়ায় আদিনাথ মহাদেবের মন্দির প্রাঙ্গণে। প্রণামাদি সেরে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো। বেশি বড় নয় চত্বর। পাশেই আরো একটি চূড়া। যাওয়া গেল সেখানেও। আলাপ করা গেল ভক্তরা যারা এসেছেন তাদের সঙ্গে। ছোট মন্দির, ছোটই নাট মন্দির। মন্দিরের পিছনে এই পাহাড় চূড়ায়ও আছে একটি পুকুর, আছে টিউবওয়েলও। যাত্রী আসে কম। মন্দিরের আয় সামান্য। অসচ্ছল এই মন্দির ভক্তগণ। অবশ্য সবই অনুমান। এসব কথা জিজ্ঞাসা করতে হলে একটু বেশি সময় থাকতে হয়, একটু আলাপচারিতায় নৈকট্য আনতে হয়। হঠাৎ করে কি এসব জিজ্ঞাসা করা যায়? তবে প্রসাদ পাওয়ার সময় দারিদ্র্য আরো প্রকট হয়। মুগের ডাল ছাড়া বাকি সবই স্বচ্ছন্দ বনজাত শাকাদি মাত্র। কিন্তু স্নেহ ও ভালবাসায় দারিদ্র্য ঢাকা পড়ে যায়। নিকটবর্তী স্থান থেকে আসা ভক্তদের মধ্যে আছে মঞ্জুও (নাম ঠিক নয়)। সে দ্বীপে সরকারি অফিসে কাজ করতে রোজই ৫০ × ২ = ১০০ টাকা স্পিড বোট ভাড়া দিয়ে আসে। শুনে আশ্চর্য হই যে মঞ্জু M.A. পাশ। কথা বলে ভাল লাগে। শুনে আরো ভাল লাগে যে মঞ্জুর অফিস কাছেই, তার প্রতিদিনই মন্দিরে আসতে ইচ্ছে করে, কিন্তু আসে না। দূর থেকেই প্রণাম সারে। সে কালে ভদ্রে মন্দিরে আসে কারণ এলেই পুরোহিত মহাশয়দের স্নেহের আবদারে প্রসাদ পেতে হয়। বিনা খরচে এই প্রসাদ গ্রহণে তার লজ্জা হয়। অথচ পয়সা দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আমার বড় ভাল লাগে মেয়েটির আত্মসম্মান বোধ ও ভদ্রতা দেখে। আদিনাথ দেবের কাছে ওর কল্যাণ কামনা করি। ভাল রেখো ওকে, বাবা!'

প্রসাদ নেওয়ার পরে আর অপেক্ষা নয়। আমাদের তাড়া আছে। আদিনাথ বাবার ঘরে প্রাচীন ভারতবর্ষের অরণ্যবাসী মুনির আশ্রমের মত অতি দরিদ্র আয়োজনের প্রসাদ অমৃতের

মত খেলাম আমরা। তার পরেই প্রণাম সেরে অবতরণ। রিক্সা আছে। জহর আগেই বলে রেখেছিল বোধ হয়। রিক্সা দিয়ে স্পিড বোটের ঘাটে যেতে যেতে লক্ষ্য করি, আসার সময়ও চোখ পড়েছিল বটে, কতগুলি দোকানের নামের সঙ্গে যুক্ত একটি শব্দ-রাখাইন। আমি ভাষা তত্ত্বের ছাত্র। শব্দটির ব্যুৎপত্তি জানার জন্য মন আকুলি বিকুলি করে। কিন্তু জানা আর হয় না। পরে জেনেছিলাম 'রাখাইন' শব্দটি 'মগ' জনগোষ্ঠীর নতুন অভিধা। 'মগ' কথাটি ওদের মনঃপুত নয়। ওরা নিজেদেরকে 'রাখাইন' বলেন। আরো ভালোভাবে জানবার সুযোগ এবার ঘটেনি। যদি আবার সুযোগ কখনো হয় দেখবো।

স্পীড বোটে উঠার আগে দেখি কলার ভীড়। সবুজ রঙের সিঙ্গাপুরি কলা এসেছে বাইরে থেকে দ্বীপে। পাহাড় প্রমাণ কলা দেখে অবাক হই। মাত্র হাজার বারো অধিবাসী বাস করেন দ্বীপে। এত কলা! ভাবি, হয়ত অনেক দিন পরে পরে আসে তাই প্রতি ক্ষেপে বেশি করে আসে। আর এখন ফল ফলাদি রোজাদার মুসলমান সন্ধ্যেবেলায় ইফতারে একটু বেশিই খান। যার যার সাধ্য মত বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করেন। ইফতারের উপকরণ সাজিয়ে বাড়িতে বাড়িতে পাঠানোরও রেওয়াজ আছে। এইসবে কলা ও অন্যান্য ফল এবং ছোলাসেদ্ধ অপরিহার্য বস্তু। সুতরাং কলার এমন সমাগম। একটি কলা দেখলাম অতিকায়। এমন আর দেখিনি বোধহয়। কলাটি দুই কিলো হবে। মনে হয় তিন চারটি কলা একত্রে জুড়ে গেছে। এমন হয়?

সন্ধ্যের পরে গেস্ট হাউসে ফিরে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে বাস স্টেশানে যাওয়ার আগে জহরের এক পরিচিতের বাড়িতে যেতে হল। বিরানব্বই বছরের মতিন (নাম বদলানো) সাহেবকে দেখে বড় ভালো লাগলো। নয় পুত্রের পিতা আদর্শ একান্নবর্তী পরিবারের প্রধান। পুত্রেরা উচ্চশিক্ষিত। বধুমাতাগণও। উকিল, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসার। দুজনেই বিদেশে শিক্ষিত। অর্ধেকই ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রামে থাকেন। ক'দিন বাদেই ঈদ। সকলে আসছেন। বড় ইফতারের আয়োজন ছিল। তবে আমরা নিরামিষাশি, মিষ্টিও চলে না। তবু বেশ আনন্দে সন্ধ্যা কাটলো। এবার দৌড়াও বাস স্টেশানে। বাস সৌদিয়ার। পথে দুবার পুলিশ বাস আটকায়। বার্মার মাল পাচার হচ্ছে কিনা দেখে। বাক্সসহ চারজনকে নামায়। আমার ভয় ও হাসি পায়। ভয়, কারণ বিদেশ বিভুঁই, পুলিশী ঝামেলা। হাসি পায়, কারণ কক্সবাজারে বড় বড় হোর্ডিং আছে বার্মিজ পণ্যের।

পরদিন সকাল বেলায় ট্রেন। ভোর রাতে ঋতা রমা আমাদের ভোজন তৈরি করে ফেলেন। খাওয়ার পর স্টেশনে নিয়ে চলেন। ঋতার ভাই রেলের অফিসার। তিনিও আমাদেরকে সী অফ্ করতে আসেন স্টেশানে। সবার চোখে জল। বিচিত্র এই দেশ, সেলুকাস। দেশ তো বাংলাদেশ হয়ে গেছে। মানুষ বদলায় নি! 'স্বপ্ন দিয়ে তৈরি এ দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।'

উজ্জয়িনীর কুম্ভ মেলায় অমৃতের সন্ধানে

তোমার কর্ম তুমি করাও মা, লোকে বলে করি আমি।' কে গেয়েছেন? ঠিক মনে করতে পারছি না। তবে তাঁর নামটা মনে কবা তেমন গুরুত্বপূর্ণও নয়। কোটি বাংলাভাষী এই গান শুনেছেন, লক্ষ লক্ষ জন ঐ ভক্ত গায়কেব নাম জানেন। সুতরাং সেটা এখানে উল্লেখ করাটা তেমন অপরিহার্য নয়। অনেক সময জানা জিনিসও মনে আসে না। ঐ যে গুপ্তদের বাড়িতে বাসন মাজতো যে স্ত্রীলোকটি, সুধীবের মা, তাব ছেলের নামের যখন দরকার পড়লো তখন দেখা গেল সেই নাম কেউ জানে না। পরদিন সে যখন বাসন মাজতে এলো তখন জানা গেল যে ছেলের নাম সুধীব বটে। নামটা আসল কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে গানের কলিটি। বিশ্বাসীর বিশ্বাসেব কথা। মা-ই সব কবান, আমি কিচ্ছু কবি না। আসল কথাও সকলের জন্য নয়। কথার কথা। নেহাৎ বিপদে না পড়লে সকলেই মনে করেন আমিই করি। সুখচরের আশ্রমে রাতের প্রসাদ নিতে বসেছিলাম। কথায় কথায় জানা গেল যে প্রায় সকলের পরিচিত এক সজ্জন দুর্ঘটনায় পা ভেঙেছেন। সবাই সহানুভূতি জানাচ্ছেন। আমার পাশে যিনি বসে আছেন তিনি বড শুষ্ক কণ্ঠে বলে উঠলেন, "তাঁব ইচ্ছা ছাড়া তৃণটিও নড়ে না।" ইনির ভাই অন্য কোন আশ্রমেব মহন্ত বলে সকলে ওকে সমীহ করে। আমার এত কথা মনে থাকে না। মুর্খেব মত বলে ফেললাম, "তা ঠিক। তবে প্রসাদ পাওয়ার জন্য যখন ঘণ্টা বাজে তখন তো তাঁব ইচ্ছাব জন্য অপেক্ষা কবেন না, সবার আগে এসে বসে পড়েন।" এরপরও আমাদের দেখা হয়েছে। তিনি আর কোনও দিন আমার পাশে বসেন নি। তবু 'তোমাব কর্ম তুমি করাও মা' বিশ্বাসটি স্মবণাতীত কাল থেকে হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত। শ্রীমদভগবদ গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণও একই কথা বলেছেন। অর্জুন যদি মনে করে থাকেন যে যুদ্ধ তিনি কববেন না, যদ্ধ কবা না কবা তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, তবে এই অহঙ্কার তাঁর টিকবে না। স্বেচ্ছায় যুদ্ধ না কর‍লে অবশ হয়ে (ঈশ্বর ইচ্ছায়) যুদ্ধ তাঁকে করতে হবে।

যদহঙ্কাবমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসাযস্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি ॥

দু'হাজার চারের এপ্রিল মাসে উজ্জয়িনীতে কুম্ভস্নান ও মেলা হচ্ছে সে তো সকলেরই জানা। আমরা ইউরোপ ভ্রমণ সেরে আগরতলা ফিরেছি ৩০শে অক্টোবর, ২০০৩। নভেম্বর মাসে নিম্বার্কাচার্য জয়ন্তী করতে গেলাম ঢাকায় এবং পবে চট্টগ্রামে। বাড়ি ফিরেই আবার যেতে হল কলকাতা ও চেন্নাই, চোখের উপর জুড়ে বসা পর্দা সরাতে। ৩০শে জানুয়ারি বাড়ি ফিরে এসেই এক আজব দুর্বলতা বোগে পড়লাম। রক্তচাপ এতটাই নীচে নেমে গেল যে চিকিৎসক কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হলেন। সুতরাং, বাবাজী সুখচব কাটিয়া বাবার আশ্রমের মহন্ত মহারাজ ডঃ বৃন্দাবন বিহারী দাসজী ফোনে আহ্বান জানালেন উজ্জয়িনীতে কুম্ভমেলায় যেতে তখন 'হ্যাঁ' বলতে পারলাম না। তিনি আমাদের সব খবরই রাখেন। তবু সব বললাম এবং যোগ করলাম যে টাকা পয়সারও তেমন ব্যবস্থা নেই। বাবা মানলেন। ইঞ্জিনিয়ার বিদেশ বাবু, ডাক্তার রামগোপাল বাবু, শ্রীমান সুজিতকেও প্রায় একই কথা বললাম। আর ওঁরা আমার

অসুখের কথাও বিশদ জানেন। তাই আমার নিবেদন গ্রহণ করলেন। কিন্তু মার্চ মাসের শেষের দিকে বাবার কাছ থেকে আবার ডাক আসার পরে আমার সহধর্মিণী বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলেন। স্বামীর অসুখও কমছে মনে হচ্ছে, সুতরাং টিকিট পাওয়ার সমস্যা, উজ্জয়িনীর দুর্বার গ্রীষ্ম, মানুষের ভীড়, ইত্যাদি কোনও সমস্যার কথাই তাকে নিরস্ত করতে পারলো না। তিনি অভিমান, ক্রোধ, অসহযোগ ইত্যাদি অস্ত্র সকল একে একে এবং একত্রে প্রয়োগ এবং রেলওয়ে ও এয়ারলাইনের কাউন্টারে যাতায়াত করতে লাগলেন। মোল্লা নাসিরুদ্দিন নাকি বলেছিলেন যে তাদের দাম্পত্য প্রীতি কখনো কমে না কারণ প্রতিটি বিষয় নিয়ে তাঁরা দুজনে বসে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করেন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই মোল্লার বিবির প্রস্তাবই সিদ্ধান্তে পরিণত হয়। বিশ্ববিখ্যাত মোল্লা সাহেবের পথ লক্ষ্য করে সকল বিবির মিঞারই চলা উচিত। এ অধম তো কোন ছার? সুতরাং পরম নিস্পৃহতায় এবং কিঞ্চিৎ ক্ষোভ সহকারেই সহধর্মিণীর ধর্মেচ্ছার সঙ্গী হলাম।

৯ থেকে ১১ই এপ্রিল আমতলীতে আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনের বড় মহারাজ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী রামকৃষ্ণ-সারদামা-স্বামী বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সম্মেলন করলেন। হাজার খানেক ভাবানুরাগীর এমন সুন্দর, সুষ্ঠ নিয়মানুগ সম্মেলনে স্নাত হয়ে আমরা যেন দৈহিক ও মানসিকভাবে কুম্ভমেলার জন্য প্রস্তুত হলাম। ১২ তারিখে বাড়িতে থেকে ১৩ই সকাল বেলার উড়ানে কলকাতা এলাম। কলকাতায় আমাদের থাকার জায়গা নেই। তাই অনেক জায়গা। টালিগঞ্জে বন্ধুবর শেখরগুপ্তের বাড়িতে তো সর্বদাই উঠছি কত বছর ধরে। ইদানীং বালিগঞ্জে সোমা-অলকদের বাড়িতে উঠছি। কন্যার আদরে সোমা-চুমকি আমাদেরকে রাখছে। সঞ্জীবই কি কম? মেসোর খাবার তৈরি হয়েছে জেনে প্রতিদিন দুবার করে মোটর সাইকেলে সে মেসোকে নিয়ে গিয়ে ইনসুলিন ইঞ্জেকশান দিয়ে এনেছে দিনের পর দিন : রোদ বৃষ্টি ঝড়ে। সর্বদা সে সকল ফরমায়েশ পালনের জন্য এক পায়ে খাড়া। আছে গোপালদা-সুকোমল সরকার মশায়ের বাড়িও। তবে এসব বিষয়ে মহাজনদের সতর্কবাণী স্মরণ রাখা কর্তব্য। শ্লোকবদ্ধ হয়ে আছে সেই বাণী—

হবির্বিণা রবির্যাতি বিনা পীঠেন মাধব।
কদন্নৈঃ পুণ্ডরীকাক্ষো প্রহারেণ ধনঞ্জয় ॥

গল্পটি এই রকম। শ্বশুরবাড়ি এসেছেন চার জামাতা। নাম তাদের রবি, মাধব, পুণ্ডরীকাক্ষ ও ধনঞ্জয়। জামাতা তো? চাকরি বাকরি বা ছুটি-ছাটার চিন্তা নেই। বাড়ি ফেরার চিন্তাও নেই। কিছুদিন পরে বাড়ির বধূগণও তাদের যত্নের বিষয়ে কিছুটা ঢিলে ঢালা হয়ে পড়েন। একদিন ভোজনের সময় ঘি দিতে ভুলে যান তাঁরা। রবি নামের জামাতাটি বুঝতে পারেন যে আদরে ভাটা পড়ছে। তিনি বাড়ি চলে যান। হবির্বিনা রবির্যাতি। দিন যায়। কদিন পরে সম্বন্ধী পত্নী ভাতের থালা নিয়ে এসে পড়েন বসবার আসন না দিয়েই। এসেই জিভে কামড়। জামাতা ত্রয় নিজেরাই আসন নিয়ে বসেন ভোজনে। ত্রস্ত মাধব নামের জামাতাটি সেদিন বাড়ি ফিরলেন। বিনা পীঠেন মাধব। আরো কদিন পরে দেখা গেল যে অন্নের গুণগত হেরফের হয়েছে। অর্থাৎ সরু চালের পরিবর্তে মোটা চাল এসেছে। পুণ্ডরীকাক্ষ নামের

জামাতাটি সেদিন পালালেন। কদন্নৈঃ পুণ্ডরীকাক্ষ। কিন্তু কোনও কিছুতেই ধনঞ্জয়ের কোনও বিকার নেই। তাকে প্রহার করে ভাগাতে হল। প্রহারেণ ধনঞ্জয়। বেচারা। সকলেই জানেন যে কয়লা, লোহা, গ্যাস, পেট্রোল ইত্যাদি ধরিত্রী মাতার গর্ভে সঞ্চিত সম্পদের পরিমাণ অসীম নয়। তেমনি স্নেহও অসীম নয়। সুতরাং স্নেহের ব্যাঙ্কে অবুঝের মত চেক কাটতে নেই। এবার আমরা গৌরদাসের বাড়িতে এসে উঠেছিলাম। ছেলে গৌতম ও আত্মীয় পুত্র পঙ্কজ এখানে আছে। দুদিন থেকে চলে গেলাম উজ্জয়িনী। ফিরে এসে দেখি রত্না ও জয় এসেছে। বিকেলে গৌর এবং তার সঙ্গে একজন এসেছে। আমরা বিব্রত। আমাদের বিব্রত হওয়ার কারণ রত্না নিজে সকাল থেকে সারাদিন নিজ হাতে স্নেহ উজাড় করে দিচ্ছে আমাদের উপব। এই চা তো ঐ জলখাবার সারাদিন চলছে সকাল সাড়ে ছটা থেকে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত। কিন্তু বেলা শত চেষ্টা করেও কিছুতেই ওকে সাহায্য কবতে পারছে না। রত্না দিচ্ছে না। নিজেই সব করছে।

এমত স্নেহের আধিক্যে বিব্রত হতে হয়েছে ঈশ্বর ইচ্ছায় আমাকে বার বার। মনে পড়ে বোসের কথা—অধ্যাপক অমলকুমার বসু। প্রায় সারাটা জীবন একাই কাটিয়ে দিলেন আগরতলার মহারাজা বীর বিক্রম কলেজের ব্যাচেলার্স এপার্টমেন্টে। বোসের স্ত্রী মহাশয়া তাঁদের একটি মাত্র কন্যা রুবিকে নিয়ে গৌহাটির এক ত্রিকোণ পার্কে রেলের কোয়ার্টার্সে থেকে রেলের চাকরি করে গেলেন। বোস প্রতি গ্রীষ্মের ও পূজোর ছুটিতে গৌহাটি যেতেন. তবে ওখানে থাকতেন কমই। চলে যেতেন সকলে বিভিন্ন স্থানে বেড়াতে। আমাদেরও বেড়ানোর ঘোড়া রোগ ছিল। প্রায় প্রতি ছুটিতেই ভারত দর্শনে গিয়েছি। সেবার ঠিক করলাম মাকে কামাক্ষ্যা দেখিয়ে দক্ষিণে নিয়ে যাব। বোস কথাবার্তাব সময় সামনেই ছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন গৌহাটিতে কোথায় থাকবো। বললাম, হোটেলে। তিনি বললেন, "কেন অনর্থক হোটেল ভাড়া দেবেন? আমাদেব কোয়ার্টার্স খালি পড়ে থাকবে। আমরা জব্বলপুর চলে যাব। পাশের কোয়াটার্সে চাবি দিয়ে যাব। স্বচ্ছন্দে থাকবেন।" মেনে নিলাম প্রস্তাব। আমরা দুজন, ছেলে মেয়ে, আমার মা ও আমাদের পুত্রসম নান্টু, মোট ছ'জন যখন ত্রিকোণ পার্কের বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম তখন দেখি বোস তাঁর স্বভাবসুলভ ভুবনভুলানো হাসি ও চোখে বিদ্যুৎ ঝলক নিয়ে এগিয়ে আসছেন। কোথায় বিহারে দুর্ঘটনা ঘটেছে, রেলগাড়ি বন্ধ, তাঁরা যান নি। আমরা বিব্রত। পরে এক সপ্তাহ ধরে স্নেহের বন্যা। রাস্তার ওপারেই দোকান। বোস যে কতবার দোকানে গিয়ে চানাচুর, ঠাণ্ডা পানীয় বা মিষ্টি নিয়ে আসতেন তার হিসেব বলতে পারবো না। খেতে বসেছি, বেগুন ভাজা পাতে। বোস বেরিয়ে গেলেন ও এলেন। ভাজা দেখে মনে হয়েছে মাখন হলে ভাল হয়; নিয়ে এলেন। বাজারে গিয়ে সেরা মাছটি আনতেন রোজ। অথচ এই অধ্যাপক অমল বসু এমন সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতেন আগরতলায়, যে সকলে তাঁকে কৃপণ বলতো। আছেন এখন গৌহাটির পাণ্ডবপুরে। অমল বসু ও বসুপত্নীর, এমন কি কিশোরী রুবির স্নেহের কথা মনে হলেই বিশ বছর পরেও অবাক হই।

হায়দরাবাদে সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব ইংলিশ এন্ড ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজেস্ এ সতীর্থ ছিলেন অগাস্টিন লেসলী। সে ওয়ালটেয়ারে সেন্ট জোসেফস্ গার্লস কলেজে পড়াতেন। তাঁর স্নেহের আতিশয্যে একবার ওয়ালটেয়ারে ওর বাড়িতে থেকে ছিলাম। ওর বাবা তামিল, মা তেলুগু।

ধর্ম খ্রিস্টান। ওর মা ও স্ত্রীর স্নেহের কথা ভুলবার নয়। কত জনের কথা বলি। ঈশ্বর নিয়ে গেছেন স্নেহের ঝর্ণা ধারাটিকে। দিয়েছেনও কত! শিখা, কবিতা, মিতা, রূপা, বুলা, সোমা, চুমকি, রত্না, পুতুল—এক মেয়ে নিয়ে কত মেয়ে দিয়েছেন তিনি। বন্ধুপত্নী শিবানীর স্নেহের তুলনা হয়? 'ধন্য তুমি ধন্য হে। তোমারি গেহে পালিত স্নেহে....।'

সেই স্নেহই আমাদের উজ্জয়িনী কুম্ভ স্নানে যাওয়ারও কারণ। শ্রীমৎ স্বামী বৃন্দাবন বিহারীদাস কাঠিয়াবাবাজীও অহেতুক তাঁর দ্বিগুণ বয়সী আমাদেরকে অঢেল স্নেহ করেন। তাই শত বাধা থাকা সত্ত্বেও তাঁর ডাক আসাতে আর 'না' বলা চললো না। পৌছান গেল উজ্জয়িনী। 'জয় বাবা ভোলা নাথ', 'হর হব মহাদেও।' উজ্জয়িনীতে নামলাম ট্রেন থেকে সকাল বেলা দশটা নাগাদ, সতেরোই এপ্রিল ২০০৪। উঠেছিলাম ১৫ই এপ্রিল রাত সাড়ে দশটায় হাওড়া স্টেশানের নয় নম্বর প্ল্যাটফর্মে। ট্রেনটি ছিল একটি 'উজ্জয়িনী কুম্ভ মেলা স্পেশাল'। তবে মোটামুটি ভালই চলেছে এবং প্রায় ঠিক সময়ে এসে পৌছে গেছে সে গন্তব্যস্থলে। স্টেশনের ভিতরে ও বাইরে গণপতির প্রজাগণ গিস্ গিস্ কবছে। প্রখর রোদে দাঁড়িয়ে মোহনরাম তিন টাকা কাপ চা বিক্রী করছে—কাচের গ্লাসেব এক তৃতীয়াংশ, চায়েরই মত বর্ণের গন্ধহীন উষ্ণ একটি তরল পদার্থ। তবে 'বিনা শক্কর' বললেও দিতে রাজি হল এবং দিল। তা গলায় ঢেলে অপেক্ষা।

অপেক্ষার কারণ আছে। বাবাজী বলে দিয়েছিলেন খবর দিয়ে অপেক্ষা করতে। গাড়ি এসে আমাদের নিয়ে যাবে। নেমেই ফোন করে আমাদের পৌছ সংবাদ দিয়েছি। যিনি ফোন ধরেছিলেন তিনি বলেছেন গাড়ি নিয়ে আসছেন, একটু বিলম্ব হচ্ছে বটে। যিনি ফোন ধরেছিলেন তিনি একটি অসাধাবণ মানুষ, নেতৃত্ব বিলাসী। বাবাজী বা অন্য কেউ কোন কাজেব কথা বললে তিনি তৎক্ষণাৎ সেই কাজের ভাবটি অন্য কাউকে দিযে দেন। তবে গাড়ি কবে কোথাও যাওয়া, ফোনে কথা বলা বা কারও উপব তম্বি কবার কাজ হলে তিনি নিজেই তা করেন। সেই ব্যক্তি আসছেন বলেছেন। একটু দ্বিধাগ্রস্ত হযেছিলাম। তবে তিনি এলেন। সমবেত জন সমুদ্রের ভিতর দিয়ে আমাদের গাড়ি আমাদেরকে নিয়ে ভৈববগড় বোডে, ১২৮ নং প্লটে, শ্রীশ্রীধনঞ্জয়দাস চ্যারিটেবল ট্রাস্টের শিবিরে এসে পৌছল। বাবাজীকে প্রণাম করে তাঁর আদেশে প্রথমেই চলে গেলাম মধ্যাহ্নের প্রসাদ গ্রহণে। যাঁরা এসছেন তাঁদের দেখলাম, যাঁরা আসবেন তাঁদেব কথা শুনলাম। পরশুদিন উনিশে এপ্রিল শাহীস্নান। শ্রীমতী বেলা কি কম হুজ্জোতি করে আসতে পেরেছে? ফেরার টিকিট নেই। করেছে টিকিট নর্মদা এক্সপ্রেসে বিলাসপুর পর্যন্ত। পরের দিন জ্ঞানেশ্বরী, অর্থাৎ কুর্লা হাওড়া ডিলাক্সএ চড়বে সেখান থেকে। দেখা যাক ঠাকুর কি করেন। আপাতত উজ্জয়িনীর সিংহস্থ কুম্ভ।

কুম্ভ স্নান ও কুম্ভ মেলার কথা কে না জানে, দেবেন্দ্র ও দেবগুরু বৃহস্পতির বিবাদ। দেবগুরুর অন্তর্ধান। দেবগণের শক্তিহীনতা ও অসুররাজ বলির স্বর্গজয়। দেবগণের বিষ্ণুর সহায়তা প্রার্থনা, সমুদ্র মন্থন, মন্থনে বিয ও অন্যান্য বস্তুর উত্থান এবং সবশেষে ধন্বন্তরীব অমৃত কুম্ভ নিয়ে আসা, এসব কথা আছে গ্রন্থে। সেই কুম্ভ, দেবাসুর যুদ্ধের সময়, চার স্থানে মাঝে মাঝে বাখা হয়—উজ্জয়িনী, নাসিক, প্রয়াগ ও হরিদ্বাব। বারো বছর পর পর এসব স্থানে কুম্ভ মেলা হয়, স্নান হয়। কোটি পুণ্যার্থী এসে পড়েন তখন। উজ্জয়িনীতে যদি দুরন্ত

গরম, হরিদ্বার বা প্রয়াগে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। কিন্তু পুণ্যার্থীর কমতি নেই। ঢল নামে মানুষের, বন্যা মানুষের। এবার চারদিন বড় স্নান এপ্রিলের পাঁচ, উনিশ ও বাইশ আর মে মাসের চার তারিখে। আমরা সতেরোই এপ্রিলে এসে পৌঁছেছি। উনিশ তারিখে রাম ঘাটে স্নান করেছি। বেলা বাইশ তারিখে রাম ঘাটে একবার ও সিদ্ধবটে আবার করলো। আমি সিদ্ধবটেই দুবার সারলাম। এ এক অতুলনীয় অভিজ্ঞতা। সুখচরের মহন্তজীর ডাক আসায় এসব হলো। নইলে অসুখ নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম যে অন্য কিছু নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ ছিল না।

উজ্জয়িনী। কত নাম তার—অবন্তিকা, কনকশৃঙ্গা, কুশস্থলী, উজ্জয়িনী, পদ্মাবতী, কুমুদবতী, বিশালা, ও অমরাবতী। এই দেশে সাতটি মোক্ষদায়ী তীর্থ আছে সেগুলি হল—অযোধ্যা, মথুরা, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা, পুরী ও দ্বারাবতী। সাঁতের মধ্যে এক অবন্তিকা বা উজ্জয়িনী। প্রসিদ্ধ সম্রাট বিক্রমাদিত্যের ইষ্টদেবী হরসিদ্ধির প্রাচীন স্থল এই স্থান। জ্যোতিষ শাস্ত্রসহ বিভিন্ন বিদ্যার কেন্দ্র ছিল উজ্জয়িনী। আর্যভট্ট ও বরাহমিহির এখানে ছিলেন। বারো বছর পর পর এখানে কুম্ভমেলা হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরাম ও তাঁদের সখা শ্রীসুদামা এখানেই সান্দীপনির গুরুকুলে শিক্ষাগ্রহণ করেন। বামন পুরাণে আছে যে ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ ক্ষিপ্রা (শিপ্রা) নদীতে স্নান করে শ্রীবিষ্ণু ও শ্রীমহাকালেশ্বর দর্শন করেন। মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অবন্তী নরেশ বিন্দ ও অনুবিন্দ অক্ষৌহিনি সৈন্য নিয়ে দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। বুদ্ধদেবের সময় মগধবংশী প্রদ্যোত এখানে রাজত্ব করতেন। তাঁর কন্যা বাসবদত্তা ও বৎসরাজ উদয়নের কাহিনী ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। ২৭৩ খ্রিঃ পূর্বাব্দে মৌর্য সম্রাট বিন্দুসার তাঁর পুত্র অশোককে এখানকার গভর্নর করে পাঠিয়েছিলেন। এখানে থেকেই অশোকপুত্র মহেন্দ্র ও পুত্রী সংঘমিত্রা সিদ্ধবটের পবিত্র শাখা নিয়ে ধর্ম প্রচারে শ্রীলঙ্কা গিয়েছিলেন। বিদেশী মুঘল ও আফগানদের দ্বারা উজ্জয়িনী বহুবার আক্রান্ত, বিজিত ও বিধ্বস্ত হয়েছে। সে ইতিহাস একদিকে দুর্ভাগ্যের অন্যদিকে চরম নিষ্ঠুরতার।

আধুনিক উজ্জয়িনী শিপ্রা বা ক্ষিপ্রা নদীর তীরে অবস্থিত। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ১৬৭৮ ফুট। শহরটির ভূপৃষ্ঠে অবস্থান ২৩.৫০ উত্তর অক্ষাংশ ও ৭৫.৫০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে। এর জলবায়ু চরম রকমের। ২০০৪ এর এপ্রিলের সতেরো থেকে বাইশ তারিখ পর্যন্ত আমরা এই তীর্থে ছিলাম। দিনে রোদ এত প্রখর যে চোখ মেলে তাকানো যায় না। তাপ এত বেশি যে সাদা শরীর না ঢেকে বেরুলে চামড়া যেন পুড়ে যায়। রাত দশটার পর বেশ আরামদায়ক। আর রাত দুটো থেকে পাঁচটা পর্যন্ত কম্বল গায়ে দিতে হয়। বুঝুন অবস্থা! প্রবল বর্ষণের পর শিপ্রা নদীতে এত জল হয় যে তিনি সত্যিই স্রোতস্বিনী হয়ে উঠেন এবং শুকনা ঋতুতে নদী প্রায় শুকিয়ে যায়। আমার বিনয়দা রসিক মানুষ। বাড়ি আনুড় গ্রামে। গ্রামটি জয়রামবাটি থেকে ১০ কিমি. ও কামারপুকুর থেকে প্রায় ৩ কিমি. দূরে। তিনি গিয়েছিলেন উজ্জয়িনী, মার্চ-এপ্রিল মাসে। তখন কোনও কুম্ভ-টুম্ভ ছিল না। কিন্তু দাদার উজ্জয়িনীর শিপ্রায় স্নান করার বাসনা হলো। গেলেনও। কিন্তু হাটুই ডুবে না; ডুব দেবেন কোথায়। তাই অগত্যা চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন নদীবক্ষে। স্নাত হলেন অধ্যক্ষ বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ডি. লিট.। এই চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন বলতেই মনে পড়লো বিনয়দার একটি রসিকতার কথা। সচ্চিদানন্দ মহারাজকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বিনয়দা সবিনয়ে

মহারাজের নামটির ব্যাসবাক্য করে বুঝিয়ে দেন আমাকে অস্যার্থ। 'সদাই চিৎ হয়ে শুয়ে থাকাতে যাঁর আনন্দ, তিনিই সচ্চিদানন্দ। যাক গে, আমার গাড়ি সদাই বেলাইনে চলে যায়। আমি বলতে বসেছি আধুনিক উজ্জয়িনীর কথা। বলছি এবার।

উজ্জয়িনী ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভূমি অতি উর্বরা। স্বনামে প্রতিপন্ন কবি কালিদাস ও বাণভট্ট এই নগর ও চতুস্পার্শস্থ অঞ্চলকে ইন্দ্রজাল ও বশীকরণ (hypnosis) এর দেশ বলেছেন। কালিদাস বলেছেন যে সমুদ্র রত্নাকর নয়, রত্নাকর তো উজ্জয়িনী, সকল রত্নের আকর এই স্থান। মহাকবির ভাষায় স্বর্গের উজ্জয়িনী মর্তে নেমে এসেছে আকাশের স্বর্গকে সঙ্গে নিয়ে। এখানকার অধিবাশীদের প্রায় সকলেই হিন্দী জানেন, কিন্তু মালভী নামক ডায়লেক্টটিই এখানকার স্থানীয় লোকের মাতৃভাষা।

উজ্জয়িনীর ইতিহাস কেবল বহু রূপান্তরণের ইতিহাস। পবিত্র শিপ্রা নদী এই নগবীর বহু উত্থানপতনের নীরব সাক্ষী। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অগণিত মানুষ এখানে স্নান করে পবিত্র হয়েছেন। যাঁরা এখানে একবার অবগাহন করে গেছেন তাঁদের মনে সারা জীবন শিপ্রার ঘাটগুলির মনোমুগ্ধকর দৃশ্যাবলি মুদ্রিত হয়ে থাকে। যুগ যুগ ধরে কার্তিক মেলা, সিংহস্থ কুম্ভ ও অন্যান্য স্নান তিথিতে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী এখানে স্নান করছেন।

পবিত্র শিপ্রা নদী দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উজ্জয়িনীতে প্রবেশ করেছেন। এর তীরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মন্দির কত। একটু উজানেই ত্রিবেণীতে আছে নবগ্রহ মন্দির। সেখানে সতত চলছে কাল সম্বন্ধে নানা গবেষণা ও হিসাব নিকাশ। পাশ দিয়ে যাচ্ছে একটি ছোট রাস্তা। সেটি নিয়ে যায় চিন্তামণি গণেশ মন্দিরে।

শিপ্রার ঘাটে ঘাটে ছায়া পড়ে মহাকাল ও হরসিদ্ধি মন্দিরের। শিপ্রা যখন উচ্ছল হয়ে উঠেন তখন তার জল গোপাল মন্দিরের দোরগোড়ায় পৌছে যায়। একটু এগিযে দুর্গাদাস ছত্রী পার হযেই নদী বাঁক নিয়েছে এবং সুপ্রাচীন মঙ্গলনাথ মন্দির, ভর্তৃহরি গুম্ফা, পীর মৎস্যেন্দ্রনাথ এবং গড় কালিকা ছুঁয়ে বয়ে যাচ্ছে। মঙ্গলনাথ মন্দিরের নিকটেই আছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অতুলনীয় সান্দিপনী আশ্রম ও রাম জনার্দন মন্দির। আবার বাক নিয়ে শিপ্রা ছুঁয়ে গেছে সিদ্ধবট ও কালভৈরব মন্দির। এই সিদ্ধ বটেব শাখা নিয়েই অশোকের পুত্র ও কন্যা শ্রীলঙ্কা গিয়ে ছিলেন। বিদেশী আফগান শাসক এই সিদ্ধ বট বৃক্ষটি উপড়ে ফেলে দিয়ে তার উৎপত্তি স্থলে মোটা লোহার ঢাকনা দিয়েছিল। উজ্জয়িনী তো 'মহাকাল' এর স্থান। মহাকাল কে তা আমরা গীতায় শ্রীভগবানের কম্বু কণ্ঠে বিঘোষিত হতে শুনেছি—

> কালো হস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
> ঋতেহপিত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে যেহবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ১১-৩২ ॥

"আমি লোকক্ষয়কারী অতি ভীষণ কাল; এক্ষণে (সমবেত) এই লোকদিগকে সংহার করতে প্রবৃত্ত হয়েছি। তুমি যুদ্ধ না করলেও বিপক্ষদলে যারা আছে তারা কেউ বাঁচবে না।" 'মহাকাল' এর সম্যক পরিচয় এখানেও পাই। কোথায় সেই দুর্বৃত্ত বিদেশী নৃশংস শাসক আজ? সিদ্ধবট আবার লোহার ঢাকনা ফুড়ে উঠেছেন ও অগণিত ভক্তের প্রণাম নিচ্ছেন। আমরাও কনিষ্ঠ কৌন্তেয়ের উচ্চারিত মন্ত্রে তাঁকে অভিবাদন করি—

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ।। গীতা ১১/৩৮

"হে অনন্তরূপ, তুমি আদিদেব, তুমি অনাদি পুরুষ, তুমি এই বিশ্বের একমাত্র লয়স্থান, তুমি জ্ঞাতা তুমিই জ্ঞাতব্য, তুমিই পরম ধাম। তুমি এই বিশ্বব্যাপী অবস্থান করছ।"

মহাকাল ভারতের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের একজন। তিনি স্বয়ম্ভু। ইনি দক্ষিণামূর্তি বা দক্ষিণ মুখী। তন্ত্র ঐতিহ্যে এই অবস্থান অনন্য। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে একমাত্র মহাকালেশ্বরই দক্ষিণামূর্তি। দোতলায় প্রতিষ্ঠিত আছেন ওঙ্কারেশ্বর আর তিন তলায় নাগচন্দ্রেশ্বর উজ্জয়িনীর আদিদেব। একাধিক সংস্কৃতভাষার কবি ও সন্তকবি তুলসীদাস মহাকালেশ্বরের তাৎপর্য ও মাহাত্য লিখে গেছেন। যুগে যুগে বহুবার এই মন্দির সংস্কার করা হয়েছে। রঞ্জোলী সিন্ধিয়ার রাজত্বকালে মালোয়ার সুবেদার রামচন্দ্র বাবা শেনভি এই মন্দির সংস্কার করিয়েছিলেন।

শ্রীমহাকালেশ্বর মন্দিরের প্রবচন হলের অদূরে একটি মন্দিরে শ্রীগণেশজীর সুন্দর সৌম্য বিশাল মূর্তি আছে। এর নাম বড়ে গণেশ। মহর্ষি সান্দীপনির বংশজ প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী শ্রীমৎ পণ্ডিত নারায়ণজী ব্যাস এইস্থানে তপস্যা করতেন। বড়ে গণেশ তাঁর স্থাপিত বিগ্রহ। সংস্কৃত ও জ্যোতিষ শিক্ষার বিখ্যাত কেন্দ্র এই স্থান থেকে সহস্র শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করে ভারতের স্থানে স্থানে সসম্মানে অবস্থান করেছেন ও করছেন। এখানকার কার্যালয় থেকে 'শ্রীনারায়ণ বিজয়' নামে একটি পঞ্জিকা প্রকাশিত হয়। মন্দিরে পঞ্চমুখী শ্রীহনুমানজীর মূর্তি আছে। নবগ্রহেরও মূর্তি আছে এখানে।

শিবপুরাণে আছে যে দক্ষের যজ্ঞস্থলে প্রাণত্যাগকারিণী সতীর জ্বলন্ত দেহ নিয়ে যখন ক্রোধোদ্দীপ্ত উদ্‌ভ্রান্ত শিব ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তখন দেবীর বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ স্থানে স্থানে পড়ে তীর্থস্থান তৈরি হচ্ছিল। (ত্রিপুরার উদয়পুরে ত্রিপুরেশ্বরী ও মেদিনীপুরের তমলুকে বর্গভীমা মায়েদের স্থানের মত।) উজ্জয়িনীতে সতীর কনুই পড়ে। সেখানে হয় হরসিদ্ধির মন্দির। এখানে তপস্যা করে রাজা বিক্রমাদিত্য বেতালসিদ্ধ হয়েছিলেন। রুদ্রসাগর দীঘির পাড়ে মাতা হরসিদ্ধির মন্দির একটি প্রসিদ্ধ স্থান। কাছেই চিন্তামন গণেশের মন্দির।

এখানে কাল ভৈরবের মন্দির আছে। অষ্ট ভৈরবের প্রমুখ শ্রীকালভৈরবের এই মন্দিরও বহু প্রাচীন ও চমৎকারিক। এই মন্দির প্রসিদ্ধ এই কারণে যে এই কালভৈরব মূর্তির মুখে ছিদ্র নেই। কিন্তু ইনি মদিরা পান করেন। পূজারী মদিরাপাত্র ওঁর মুখে লাগিয়ে ধরেন আর সবার চোখের সামনে পাত্র খালি হয়ে যায়। স্কন্দপুরাণে অবন্তীখণ্ডে এই কালভৈরবের কথা আছে। এর নামেই এই এলাকাটির নাম ভৈরব গড় হয়েছে। মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন রাজা ভদ্রসেন। কালে ঐ মন্দির ভেঙ্গে পড়লে রাজা জয়সিংহ বর্তমান মন্দির তৈরি করান। প্রাঙ্গণে শংকরী ও গভীর গুম্ফায় পাতালভৈরবীর মন্দিরও আছে। কালভৈরবের মন্দিরের সামনের রাস্তা দিয়ে গেলে বিক্রান্তভৈরবের মন্দিরে পৌঁছে যাওয়া যায়। দু'টি স্থানই তান্ত্রিক উপাসকের জন্য সিদ্ধ স্থান হিসাবে পরিচিত। শিব ও ভৈরব একই দেবতার দুই রূপ।

আমরা উজ্জয়িনী গিয়েছিলাম সিংহস্থ কুম্ভ উপলক্ষে। তখন শহরের লাগোয়া অঞ্চলে শহরের চেয়েও বড় তাঁবু শহর গড়ে উঠেছিল। একটি মাস ধরে ওখানে কোটি নরনারী

গিয়েছে এসেছে। তাঁবু শহরে শত শত তাঁবু পড়েছে, জল সরবরাহ ও আলোর ব্যবস্থা হয়েছে, শিবিরে শিবিরে স্নানের ও প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার স্বাস্থ্য সম্মত ব্যবস্থা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য একমাস ধরে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিসের সরবরাহ ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। ঘৃত-লবণ-তৈল-তণ্ডুল-বস্ত্র-ইন্ধন ইত্যাদির কোনটারই অপ্রতুলতা ছিল না। সর্বত্র সরকারি ও বেসরকারি ডেয়ারির দুধ, দই, ঘোল, আইসক্রিম ছিল; ফলের দোকান, ভাজাভুজির দোকান, ভাতরুটির দোকান ছিল। বিশাল বিশাল শিবিরে যাঁরা এসেছিলেন তাদের জন্য সেখানেই প্রাতঃকালীন চা; আটটা সাড়ে আটটায় বালভোগ; সাড়ে বারো থেকে দেড়টায় মধ্যাহ্নের প্রসাদ, বিকাল পাঁচটায় আবার চা এবং রাতে নটায় নৈশাহারের ব্যবস্থা ছিল। আগেই বলেছি যে এখানে এই সময়ে শিপ্রা বড়ই ক্ষীণতোয়া হয়ে পড়েন, জল প্রায় থাকেই না। স্নান-পুণ্য-প্রত্যাশী শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ মুখার্জীকে শিপ্রা বক্ষে 'চিদানন্দ' হতে হয়েছিল। কিন্তু সিংহস্থ কুম্ভকালে ২০০৪ সালের এপ্রিল, মার্চের শেষ ও মে মাসের প্রথম সপ্তাহে সব ইচ্ছার যাদুমন্ত্রে বদলে যায়। আমরা রামঘাটে একদিন ও সিদ্ধবট ঘাটে কদিন স্নান করেছি। ভৈরবগড়ে শিপ্রার উপর দিয়ে যে বড় ব্রীজ চলে গেছে সেখানে রোজ স্নান করেছি। এত জল যে রামঘাটে লোহার পাইপ বসিয়ে লোহার মোটা শিকল বেঁধে দিয়েছে। শিকলের উপরে আধা গা জলে ডুবিয়ে লোহার পাইপ ধরে, গলায় 'স্বেচ্ছাসেবী'র নম্বর ও পরিচয়ের লকেট ঝুলিয়ে বসে আছে কিশোরেরা। শিকলের ভিতরে থেকে স্নান করতে হবে বলে এই নাবালক আইনী প্রতিনিধিরা সতত সতর্ক করছে সকলকে। আমি ভাবি যে আইনের সাবালক রক্ষাকারীগণও যদি এমত জাগ্রত কর্তব্যপরায়ণ হতেন তবে এই দেশটার চেহারা বদলে যেত। সিদ্ধবট ঘাটে এমন স্নানার্থীর ঢল নামে না তবে সেখানেও তারের বেড়া ও 'বাহর জানা মানা হ্যায়' লেখা চেতাবনী ঝুলছে। পাঠক ভাবতে পারেন 'এবার এত জল এলো কোথা থেকে।' যা শুনেছি বলছি। একটু উজানে পাম্প করে নদীতে জল দেওয়া হচ্ছিল; একটু নীচে একটি নাতি উচ্চ বাঁধ দিয়ে জল যাতে যে গতিতে আসছে সেই গতিতেই চলে না যায় তার ব্যবস্থা হয়েছিলো। পাইপ বাহিত পরিশ্রুত জলের পরিমাণও ছিল পর্যাপ্ত। বিদ্যুৎ সরবরাহ ছিল চব্বিশ ঘণ্টা। জল ও বিদ্যুৎ মুফ্‌ৎ।

কি বর্ণনা দেব শিবিরগুলির? ১২৮ নং ভৈরবগড় রোডে গড়ে উঠা 'ধনঞ্জয়দাস কাঠিয়াবাবা ট্রাস্ট' এর শিবিরটি একেবারেই ছোট। আমরা যাওয়ার আগেই পিছনে রসুইঘর, নাহান ও স্যানিটারী টাট্টির ব্যবস্থা হয়েছে। মাঝখানে পঞ্চাশ/ষাট ফুট রাস্তা রেখে দু'পাশে তাবু পড়েছে। দু'টি অতি বিশাল ও সাত আটটি ছোট তাবু। ছোটগুলির প্রত্যেকটিতে জনা বারো মানুষের শয়নের ব্যবস্থা হয়। একেবারে কেন্দ্রস্থলে একটি পূজাবেদী। রান্নাঘরের সামনে পংক্তি ভোজনের জায়গা রেখে সামনের দিকে করা হয়েছে অভিনয় মঞ্চ। সেখানে প্রতি রাত্রে কৃষ্ণলীলা পালা হয়েছে মাসভর। অভিনেতা, পরিচালক, সূত্রধারেরা সপরিবারে থাকার জন্য ব্যবস্থা হয়েছে আলাদা ভাবে। ওরা আমাদের সঙ্গে প্রসাদ পেতেন না। সকাল বেলা ভাণ্ডার ঘর থেকে দিনের প্রয়োজন মত আহার্য ও ইন্ধন নিয়ে যেতেন ও নিজেরা রান্না করে খেতেন। মঞ্চে কৃষ্ণলীলা আরম্ভ হত রাত আটটায়। দুপুরে, বিকালে, সন্ধ্যায় পাঠ প্রবচন হতো ঐ মঞ্চে বসে। বিশাল চত্বরে সতরঞ্চি পাতা ছিল শ্রোতাদের বসার জন্য। তবে হলফ করে

বলতে পারবো না সতরঞ্চিতে বসলে পরিধেয় বস্ত্রে বেশি ভক্ত-পদ-রজঃ লাগে না ধরিত্রী মাতার কোলে সোজাসুজি বসলে।

কত লোক এই ছোট শিবিরে প্রতিদিন প্রতিবেলায় প্রসাদ গ্রহণ করতেন সে খবর দিতে পারবেন আমাদের শঙ্কর, অর্থাৎ শ্যামলদাস ব্রহ্মচারী মহারাজ। বেশ কজন মান্যবর বিদ্বান প্রতিদিনই সময়মত চলে আসতেন ও গলবস্ত্র হয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে অনুরোধ করলে প্রসাদ গ্রহণ করে সকলকে কৃতার্থ করে যেতেন। কিছু পরিচিত পুরুষ ও মহিলা অন্য শিবিরে থাকতেন হাটাপথ বিশ পঁচিশ মিনিট দূরে। তবে প্রসাদ গ্রহণের জন্য এখানে চলে আসতেন প্রতি বেলায়। তাছাড়া কিছু নিরন্ন মানুষ ও বাসন কোসন ধুয়ে দিতে আসা মায়েরা তো ছিলেনই। খরচ? জানি না। তবে তাঁবু যারা ভাড়া দিয়েছেন তাদেরকে বাবা যে এক কিস্তি টাকা দিয়েছিলেন এবং ওরা যে রশিদ দিয়েছিলেন, সেই রশিদের অঙ্কটা আমার চোখ দেখে ফেলেছিল, সেটাতে লেখা ছিল ষাট হাজার টাকা। এই সবই সামলাচ্ছেন একা বাবা মহারাজ।

আমাদের বাবা মহারাজের সন্ন্যাস নাম ডঃ বৃন্দাবন বিহারীদাস কাঠিয়াবাবা। ইনি কলকাতার নিকটবর্তী সুখচর আশ্রমের মহন্ত। সদা হাস্যমুখ, শ্রীচৈতন্যদেব বর্ণিত বিনয়ী বৈষ্ণবের মূর্ত প্রতীক বৃন্দাবন বিহারীদাসজী দেশে একজন বিনয়ী, বিদ্বান ও সুবক্তা সন্ন্যাসী হিসাবে পরিচিত। ইনি বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত ও ইংরেজিতে অনর্গল বক্তৃতা করেন ও নিজের সীমাবদ্ধ আর্থিক ক্ষমতা নিয়েই আর্তত্রাণে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিন বছর আগে পশ্চিমবঙ্গের ভয়াবহ বন্যার সময়ে তিনি নৌকায় চড়ে জলবন্দী মানুষের জন্য খাদ্য নিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ নৌকা ঘুরলে একটা গাছের ডাল তাঁর কান ও চোখের মাঝখানে সজোরে লাগে। দৈবানুগ্রহে তাঁর চোখটা বাচে। কিন্তু এতে তাঁর উপচিকীর্ষা অবদমিত না হয়ে আরও উচ্ছসিত হয়ে উঠেছে। আতঙ্কিত স্নেহভাজনদেরকে তিনি বুঝিয়েছেন যে এই ঘটনা বা দুর্ঘটনার দ্বারা তাদের উপলব্ধি হওয়া দরকার যে সবই ঈশ্বর ইচ্ছায় হয়। ভবিতব্য 'নন্দলাল' হয়ে ঘরে বসে থেকে স্তব্ধ করে দেওয়া যায় না। তাই তিনি বলেছেন—

> যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে
> মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি।। গীতা-১৮/৫৯

"তুমি অহঙ্কার বশতঃ মনে করছ যে যুদ্ধ করবে না, তোমার এই সংকল্প মিথ্যা (প্রতিপন্ন হবে); তোমার ক্ষত্রিয় স্বভাব (ঈশ্বর ইচ্ছায়) তোমাকে যুদ্ধ করাবে।"

সুতরাং তাঁর সন্ত স্বভাব তাঁকে দিয়ে উপযুক্ত কাজ করাবেই. এই কাজ বন্ধ করার সংকল্প করলেও 'মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে' হয়ে যাবে। করছেন ও তাই। শ্রীমৎ ধনঞ্জয় দাসজীর অপ্রকট হওয়ার পর সুখচর আশ্রমে জায়গা অকুলান থাকায় তিনি তাঁর গুরুদেবের স্নানঘরটিতে বাস করেছেন আট বছর। এখন একটি ঘর তাঁর হয়েছে বটে কিন্তু ঘরে বইপত্রাদির পাহাড়ের মধ্যে তাঁর শয্যাটিকে একটি কন্দরই মনে হয়। তিনি এখানেই সদা চিদানন্দে লীন হয়ে থাকেন। এখানে থেকেই তিনি এক অনন্য উপায়ে নিম্বার্ক দর্শন ও তাঁর গুরুদেব ধনঞ্জয় দাসজীর বার্তা প্রচার করছেন। বেশ কবছর ধরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্বার্ক জয়ন্তী পালন করছেন। আমন্ত্রিত হয়ে আসছেন বিদ্বজ্জন। মুম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ, জগন্নাথ সংস্কৃত

বিশ্ববিদ্যালয়, পুরী, বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে এমন সেমিনার হয়েছে তাঁর চেষ্টায়। গত বছর (২০০৩) ঢাকাতে হল এই অভিনব প্রচার। তিনিই করেছেন উজ্জয়িনীর ভৈরবগড়ে এই ধনঞ্জয় দাস চ্যারিটেবল ট্রাস্টের নামে শিবির।

দঙ্গলে দঙ্গলে পুণ্যার্থী তীর্থযাত্রীরা আসছেন ও যাচ্ছেন। এপ্রিলের পাঁচ তারিখ থেকে স্নান আরম্ভ হয়েছে। চলবে সে মাসের চার তারিখ পর্যন্ত। যাত্রীরাও আসতেই থাকবেন আর যেতেই থাকবেন। ইন্দোর থেকে প্রকাশিত হিন্দী পত্রিকা 'দৈনিক ভাস্কর' ২০ এপ্রিল ২০০৪ (বর্ষ ২১ সংখ্যা ১০৮) সংখ্যায় প্রথম পৃষ্ঠার শীর্ষে আট কলম জোড়া বড় বহুবর্ণ ছবিতে রামঘাটে স্নানরত বহুলক্ষ পুণ্যার্থীর দৃশ্য ধরেছেন এবং এতে লাল বড় অক্ষরে লিখেছেন, 'অদ্ভুত..., অপূর্ব..., অবিস্মরণীয়...।' নীচে ব্যানার হেডলাইন ঃ ৩০ লাখ নে কিয়া পর্ব স্নান। সারাটা প্রথম পৃষ্ঠায় শুধুই স্নানের খবর। ডান দিকে খবর—সিংহস্থ মহাপর্বকে দৌরান শাহী স্নান আউর উস্‌মে ভী কহীঁ অধিক জন সৈলাবর কে সাথ সোমবার কো সম্পন্ন পর্ব স্নানকো মিলাকর অভীতক কোই এক করোড দশ লাখ শ্রদ্ধালু শিপ্রা মেঁ স্নান কর চুকা হ্যায়।'

এই মহাভীড় উপচে পড়ছে সর্বত্র। দেড় ঘণ্টা ধরে শ্বাস রোধকারী সর্পিল লাইনে দাঁড়িয়ে, গরমে সিদ্ধ হয়ে তবে মহাকাল দর্শনের সিদ্ধি লাভ হয় আমাদের। কালভৈরব দর্শনের লাইন আরম্ভ হয়ে যায় দেড় কিলো মিটাব দূরে শিপ্রা তীরে ভৈরবগড় রোড থেকেই। শহরে যান বাহন বলতে চার চাকার ঠেলা। এগুলিতে সাধারণত ফল, সবজি ইত্যাদি নিয়ে বিক্রেতারা ঠেলে ঠেলে নিয়ে যায়। এখানে মানুষের ভীড়ে এদের গতি শ্লথতর। নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে ঠেলে ঠেলে, দশজন পর্যন্ত বসছে একেকটায়, কোমর (কোমরটাই বসছে তো!) পিছু ভাড়া পাঁচ টাকা। খুব রোজগার করছে ঠেলা ওয়ালারা। খুব আকাঙ্ক্ষা ছিল যাব রামকৃষ্ণ মিশনের শিবিরে ; বিষ্ণুপুরি মহারাজের পরমার্থ সাধক সংঘে, বতিবঞ্জন সহ ক'জন পরিচিত শ্রদ্ধালু এসেছেন সেখানে; যাব ভাবত সেবাশ্রম সংঘে, সান্দিপনী আশ্রমে এবং মহন্ত মহারাজ শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দদাসজীব শিবিরেও। হয়নি যাওয়া। ঠেলা ওয়ালারা চিনলে যাওয়া যেত। হেটে হেটে যা দেখেছি সবই আগে নাম শুনিনি এমন কিছু। চেনা নামের কোন কিছু চোখে পড়েনি।

আমাদের ভৈরবগড়ের ধনঞ্জয় দাস চ্যারিটেবল্ ট্রাস্টেও কি কম লোক এসেছেন? আমরা এসেছি তো সতেরো তারিখে, চলে যাওয়ার তারিখ বাইশ। দেখেছি কেবল ঐ ছ'দিন। আগে ও পরে আরো কত জন এসেছেন জানি না। বাবার সঙ্গে আছেন খাজাঞ্চি শম্ভু দেববর্মা, তদারক নবেন্দু, ব্রহ্মচারী শ্যামল দাস, এরা। আনুড়-এর বিনয়কৃষ্ণ মুখার্জীর স্ত্রী কল্যাণী বৌদির ভাই সুধাংশু বাবু ছিলেন, তিনিই দেখালেন চৈত্র ১৪১০ এর 'বাসুদেব' টি। এতে ঢাকায় অনুষ্ঠিত নিম্বার্ক জয়ন্তী সম্বন্ধে এই অধীনের লেখাটি উঠেছে। আগরতলা থেকে গিয়েছিলেন একটি দল ইঞ্জিনিয়ার বিদেশচন্দ্র সাহা ও ডাক্তার রাম গোপাল সাহার নেতৃত্বে। ওদের দলে ছিলেন দিলীপ রায়, শুক্লা দাস, বীণা রায় এবং আরো অনেকে। কেন জানি বাইশ তারিখের কনফার্মড রিটার্ন টিকিট ক্যানসেল করলেন ওরা। পরে ফিরতে কষ্ট হয়েছে। সস্ত্রীক বেলঘরিয়াবাসী ডাঃ ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় এসেছিলেন মার্চেই। যাবেন মে মাসে। প্রতিদিন সামনের তাঁবুতে খুলতো তাঁর দাতব্য চিকিৎসালয়। রোগী হতো বেশ। এসেছিলেন কাশীর

গৌরী মা ও তাঁর সঙ্গে তেরোজন। ঢাকা থেকে উৎপল বাবু একজন বন্ধু সহ; কলকাতা থেকে সমীর-বুলা-গুড্ডু, স্ত্রী ও পুত্র কন্যাসহ শ্রীমান পাপ্পু মহারাজ বা ইঞ্জিনিয়ার অশোক চক্রবর্তী এবং মিস্টার বাসু ও তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা। শুনেছি পরে গিয়েছিলেন আমাদের শ্রীমান অলক ও তার মা ভক্তিমতী অঞ্জলি, শেষ শাহী স্নানে। অঞ্জলি জীবনে বহু তীর্থে গিয়েছেন এবং এখনো যান। এঁরা বোধ হয় প্লেনে ইন্দোর গিয়ে তবে উজ্জয়িনী গিয়ে থাকবেন। হয়তো ভাই প্রীতম এবং আমাদের কন্যাসমা সোমা মাও গিয়েছিলেন। আমাদের ফিজিও থেরাপিস্ট স্পোর্টস্ ম্যান শ্রীমান সুজিৎ তো ছিলই। যার যার স্বভাবটিও সঙ্গে ছিল। নবেন্দু সদাই বলছিল, 'আর ভাল লাগছে না, বাবাকে বলেছি আমি কালই চলে যাব।' পাপ্পু সর্বদাই দেখছেন কোথায় কি হচ্ছে না। কাউকে লাগিয়ে সেটি করাচ্ছেন বা নিজেই করছেন। শ্রীমান সমীর টুকটাক এটাওটা করছেন ও মাঝে মাঝে একে ওকে একটি বাক্যের হুল ফুটিয়ে তাঁর দেবর্ষির ভূমিকা পালন করছেন। যাঁকে হুল ফোটালেন সে গর্জাচ্ছে আর তিনি মুচকি হাসি হেসে আড় চোখে তাকিয়ে দেখছেন। এসেছিলেন লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়ের বরপুত্র সত্যব্রত মুখার্জীও। ব্যবসায়, ধর্মশাস্ত্র, দর্শন, সাহিত্য ও ইতিহাসের এক বিরল সহাবস্থান হয়েছে সত্যব্রত মুখার্জীর মনোভূমিতে।

এক রাতের এগারোটায় সদলে গিয়েছিলাম 'শ্রীনিম্বার্ক নগরে' 'শ্রীজী' মহারাজের শিবিরে। এলাহি কাণ্ড। বিশাল নগর বটে। দুর্গা পূজার প্যান্ডেলের কায়দায় নানা রঙের কাপড় দিয়ে ঢেকে সব প্রাসাদ বানিয়েছে। বহিঃপ্রাকারের ভিতরে বিশাল উঠানে খান ষাটেক গাড়ি। আলোর কি সে বাহার! ঘরে ঘরে পাখা ঘুরছে। শ্রীজী মহারাজ ডেকেছিলেন ডঃ বৃন্দাবন বিহারী দাসকে। এবার তিনি নিম্বার্ক জয়ন্তী তাঁর অধিষ্ঠান রাজস্থানের সালিমাবাদে করতে চান। তাঁর ইচ্ছা বৃন্দাবন বিহারীজীও তার সঙ্গে যোগ দিন। এদিকে এবার নিম্বার্ক জয়ন্তী আগরতলায় হওয়ার কথা। জগন্নাথ বাড়ি মঠের শ্রীমৎ ত্রিদণ্ডী স্বামী ভক্তি কমল বৈষ্ণব মহাশয় অকুণ্ঠ সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন' কিন্তু 'শ্রীজী' মহারাজের ইচ্ছাই তো আদেশ। ভিতরে গেলাম ও মহারাজকে প্রণাম করলাম। পাশেই বসে আছেন কার্তিকেয় তুল্য চেহারার এক কিশোর। পরে শুনলাম ইনি 'যুবরাজ'। মনে মনে তৈরি করে নিলাম বাকিটা। এই 'যুবরাজ'ই সম্ভবত ভবিষ্যতের 'শ্রীজী মহারাজ'। এইভাবেই সুলক্ষণ যুক্ত কোন বালককে নির্বাচন করে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে ভবিষ্যতের দলাইলামা তৈরি হতো তিব্বতে। অনেকটা এই আদলেই থিয়োসফিস্টগণ তৈরি করেছিলেন কৃষ্ণমূর্তিকে।

শ্রীমতী বেলা ধর আমাদের ফিরে যাবারও একটা ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। বাইশে এপ্রিল বিকাল পাঁচটায় উজ্জয়িনী থেকে ছাড়বে ইন্দোর-বিলাসপুর নর্মদা এক্সপ্রেস। তাতে করে আমরা সন্ধ্যা ছ'টায় বিলাসপুরে এসে পৌছব পরদিন, অর্থাৎ পঁচিশ ঘণ্টা পরে। বিলাসপুরে বাইশ ঘণ্টা বাস করে পরদিন কুর্লা (মুম্বাই) হাওড়া সুপার ডিলাক্সে চড়বো বিকেল চারটেয় এবং রাত্রি শেষে চারটেয় পৌছব হাওড়া। কিন্তু ক্যালকুলেশানে একটু ত্রুটি ছিল। বাইশে এপ্রিল যে একটি শাহী স্নানের দিন সেই ফ্যাক্টারটা তিনি হিসেবে নেন নি। আমার চিন্তা সেদিন স্টেশনে পৌছবো কেমন করে? সেদিন সব গাড়ি বন্ধ। বাবাজী তো কোন উদ্বেগে ভুগেন না। তিনি তো 'যস্মিন স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে। (গীতা-৬/২২)। তিনি বলেছেন পাঠিয়ে দেবেন। আসার দিন ভোর (বোধহয় শেষ রাত বলাই

ভাল।) তিনটেয় রামঘাটে শাহী স্নান করার জন্য বেলা শিবিরের আরো ক'জনের সঙ্গে বেরিয়ে গেল। রামঘাটে স্নান সেরে ফিরে এল সকাল পাঁচটায়। আবার আমার সঙ্গে স্নান করলে সিদ্ধবটের ঘাটে সকাল ন'টায়। সেদিন রাস্তায় লোক আর লোক। দুটো একটা গাড়ি চলছে সামনের সীটে একজন সাধুকে বসিয়ে। তিনি হলেন পুলিশের জন্য পারমিট। দুপুরে প্রসাদ পেয়েই গাড়িতে বসলাম। সাড়ে বারোটা। স্বরূপ দেববর্মা নামের একজন কেউ স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমেছেন এবং লোকারণ্য দেখে ঘাবড়ে গেছেন। বুদ্ধি করে ফোন করে তাকে উদ্ধার করার আবেদন জানিয়েছেন। তাকে আনবার জন্য গাড়ি যাবে। সেই গাড়িতে আমরা যাচ্ছি। তাই গাড়ির সময়ের সাড়ে চার ঘণ্টা আগেই রওয়ানা। ধীরে ধীরে চলছিল গাড়ি। কিন্তু রেলস্টেশন থেকে অন্ততঃ পাচশো মিটার দূরত্বে থেমেই গেল। সঙ্গে আসা ছেলেটি আমাদের ব্যাগগুলি নিয়ে প্রায় অভেদ্য সেই জনঅরণ্য ঠেলে এগোয় ও আমরা তার পেছনে গিয়ে প্ল্যাটফর্মে পৌছলাম। ছেলেটি স্বরূপকে খুঁজতে চলে গেল আমরা দেয়ালে পিঠ ও দুপায়ের ফাঁকে ব্যাগ নিয়ে দাঁড়ালাম। বেলা দেড়টা। আমাদের ট্রেন পাঁচটায। আছি প্ল্যাটফর্ম একএ। চারটের সময় খবর পেলাম নর্মদা এক্সপ্রেস ছাড়বে ছ'নম্বর থেকে। এবার সহায়ক কেউ নেই ঈশ্বর ছাড়া। তাঁকে তো আর ব্যাগ বইতে বলা যায় না। সুতরাং ব্যাগ নিয়ে ওভারব্রীজে উঠে ও নেমে এলাম ছ'নম্বরে। এখানে পিঠ লাগাবার দেয়ালও নেই। পেলাম একটা চারকোনা থাম। দাড়ালাম এর কাছে। লক্ষ্মীরাণীর গায়ে লেপ্টে। লক্ষ্মীরাণীর বাড়ি খড়গপুরে। বেরিয়েছিলেন তীর্থে, আরো উনত্রিশ জনের সঙ্গে। দলছুট হয়ে যান। ওরা ফিরে গিয়ে ছেলেকে জানায় যে তার মা হারিয়ে গেছে। এদিকে যাট বছরের লক্ষ্মীরাণী হারিয়ে গেলেও বুদ্ধিমতীর কাজ করেছে। তার ছেলে তার কাছে একটা কাগজ দিয়েছিল। সেটা 'মোবিল নম্বর।' হন্তদন্ত হয়ে ছুটেও উনত্রিশ জনকে খুঁজে না পেয়ে সে একজন পুলিশকে অনুরোধ করে তাকে থানায় নিয়ে যেতে। সে নিয়ে যায়। সেখানে লক্ষ্মী তার কথা বলে ও ছেলের 'মোবিল নম্বর' দেয়। কাজ হয়। ছেলের সঙ্গে কথা হয়। ছেলে এসেছে তাকে নিতে। ফোকলা দাঁতে হাসছে লক্ষ্মী। আমার প্যান্ট শার্ট পরা থাকলেও সে গায়ের গন্ধে টের পেয়েছে আমি বাঙালি। তাই ভীড়ের মধ্যে আমার গায়ে লেপ্টে দাঁড়িয়ে আছে লক্ষ্মীরাণী।

হারিয়ে যাওয়ার উপর একটা ক্লাসিক বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন একবার 'এয়ার ইন্ডিয়া' কর্তৃপক্ষ। হীথরো এয়ার পোর্ট, লন্ডন। বিশাল একটি থামের গোড়ায় একাকী দাঁড়িয়ে আছেন বিষন্ন বদনা বছর তিনেকের এক মহিলা। ডান হাতের আঙুলের নখ দাঁতে কাটছেন। সাড়ে ছ'ফুট উঁচু এক বিমান ক্যাপ্টেন নীচু হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করছেন—

ক্যাপ্টেন—হ্যালো ডার্লিং! আর য়্যু লস্ট?

তিন বছরী মহিলা—হাউ সিলি! হাউ ক্যান্ আই বি লস্ট? আঁইম্ হীয়ার! মাই প্যারেন্টস্ আর লস্ট। আধা পৃষ্ঠা জোড়া বড় ছবির তলায় ডান দিকে লেখা ছিল—উই কেয়ার। এয়ার ইন্ডিয়া!

বেঁচে থাকুক এয়ার ইন্ডিয়া, প্রাণ যায় আমার, বেলার, লক্ষ্মীরাণীর ও আরো হাজার কয়েক যাত্রীর। ঠায় দাঁড়িয়ে আছি কয় ঘন্টা ধরে। অবশেষে নর্মদা এক্সপ্রেস এলো সাড়ে ছ'টায়। সেই সময়ে যে কসরৎ দেখিয়ে বহু দূর পর্যন্ত সোজা হয়ে, বাঁকা হয়ে, লাফিয়ে,

ডিঙিয়ে বা উবু হয়ে যেভাবে সঠিক কামরায় উঠলাম ও সীট দখল করলাম তা লক্ষ্য করলে যে কোন সার্কাসের ম্যানেজার আমাদেরকে চাকরির অফার দিতেন নিঃসন্দেহে। কেউ আসেন নি বলে আমরা সেই অফার প্রত্যাখ্যান করার লজ্জা থেকে রেহাই পেয়ে গেলাম। জয় রামকৃষ্ণ। গাড়ি চলছে। তেইশ তারিখ বিকাল চারটে থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত গাড়ি ঠায় দাঁড়িয়ে পেণ্ড্রা স্টেশানে। সামনে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি হয়েছে, গাছ পড়ে আছে, মালগাড়ি আটকে আছে ইত্যাদি টুকরো টাকরা খবর আসছিল। পরিচয় হল ক'জন যাত্রীর সঙ্গে। বিলাসপুর বাসী তরুণ শ্রীমান কিষণলালের হয়ে পড়লাম আঙ্কল আর মাম্মী। সেই পীড়াপীড়ি করে স্টেশানের ক্যান্টিন থেকে এনে খাওয়ালো গরম সামোসা। বিলাসপুর পৌছলাম রাত তিনটেয় (অর্থাৎ সাহেবী মতে পরদিন)। পাঁচ নম্বর রিটায়ারিং রুমে স্থান মিললো।

সা'ড়ে তিনটেয় শুয়েও ঘুম ভেঙে গেল ছ'টায়। স্টেশনেই প্রাতরাশ সেরে একটু বাইরে যাওয়া গেল। বহু ঘোড়ার গাড়ি। ঘোড়া এত দুর্বল যে এদের দ্বারা হর্স পাওয়ার নয় গোটস্ পাওয়ার মাপা যাবে। বেলা ঘোড়ার গাড়ি চড়বেন। তাই তাতে করেই এক চক্কর মারা গেল। নেমে নেমে দেখা হল উৎকলের জগন্নাথ মন্দির ও বেঙ্গলি এসোসিয়েশনের কালীবাড়ি। কিনলাম একটু ছাতুও। গাড়ির চালক বছর বারো বয়সী শ্রীমান সামাদের সঙ্গে কিছু কথা বলা হল। গাড়িটা চালায় তার চাচা। সকালে সে ঘোড়া দুটোর খিদমৎ করতে এসেছিল। আমরা জুটে গেলাম। পঁচিশ টাকা রোজগাব হল। সলজ্জ হাসি হেসে বললো চাচাকে পনেরো টাকা দেবে।

সন্ধ্যা ছটায় এলো কুর্লা-হাওড়া ডিলাক্স এক্সপ্রেস। এর আরেক নাম জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস। এটিতে বাতানুকুল শ্রেণীর টিকিট। আরামে রাত কাটিয়ে সকাল সাতটায় হাওড়া। আমাদের কুম্ভ ওডিসি শেষ। জয় মহাকাল, জয় কাল ভৈরব। জয় রামকৃষ্ণ।

অণুক্রমণিকা

দেশ বিদেশে বেড়াতে গিয়ে কত মানুষ, কত ঘটনা, কত জায়গার কথা যে এসে পড়েছে তার আর ইয়ত্তা নেই। প্রাসঙ্গিক কিছু নাম এখানে বর্ণানুক্রমিক সাজিয়ে দিলাম। নামের পাশে পৃষ্ঠাও দেওয়া হল। অনুসন্ধিৎসু পাঠক প্রয়োজনবোধে দেখতে পারবেন।

অক্সফোর্ড—২, ৮, ৩৯, ১১৫
অগাস্টিন, সেন্ট—৯৩, ১০০
অনিরুদ্ধ (দেবনাথ)—১১৯
অরওয়েল, জর্জ—৮৫
অরওয়েল, নদী—৮৪
অরওয়েল হেইভেন—৮৫
অর্জুন—৩০
অল্ডবরা—১২৯
আইফেল, আলেকজান্ডার গুস্তাভ—২১
আইফেল টাওয়ার—২১
আওরঙজেব—৫০
আকবর—৩৭
আগা খান—৮২
আচার্য, জহর—৮৯
আচার্য, অগ্নিকুমার—২৪, ১০২
আনিসুজ্জমান, ড. প্রফেসার—১৩৯
আপ্পুঘর, দিল্লি—২৭
আটলান্টা—৫৭
আবদুস সামাদ—৪৩, ৫১
আম্মান—৫, ৭, ৯
আর্চ দ্য ট্রায়াম্ফ—১৯
আর্নল্ড, ম্যাথু—১১
আর্মাগেড্ডন—২৯ .
আলসেস্—লোরেন—৬৪, ৬৯
আলী, সৈয়দ মুজতবা—১৪৩
আল্পস পর্বতমালা—৬২
আলিয়া—৬
আহমদ, মোক্তার—১১৪
অ্যাংলিকান চার্চ—৯৪
ইনকুইজিশান—৮১
ইন্টারলেকেন—৭৮, ৭৯
ইপ্সউইচ—৬, ১০, ৮৪, ৯১
ইপ্সউইচ মিউজিয়াম—৮৯
ইরাসমাস—৪৫
ইংলিশ চ্যানেল—৭, ১৪, ১৫, ১৬
ইংল্যান্ড—৩, ৬, ৭, ৮, ১০, ১১, ১২
১৩, ১৪
উজ্জয়িনী—১১, ১৫৩, ১৫৭
এঙ্গেলবুর্গ—৭৩
এলিয়ট—৯৯
এম. বি. বি. কলেজ লাইব্রেরি—৫
ওপেনটপ বাস—৩৬
ওয়াল্ট ডিজনি—২৫
ওয়ালটেয়ার—১৪
কক্স বাজার—১৪১
কান্স্তানতিন—৪৯
কবিতা (পোদ্দার)—১০২
কবোল্ড, ফেলিক্স থর্নলি—৮৪
কাঠিয়াবাবা, ধনঞ্জয়দাসজি—১৩৪, ১৩৫
" বৃন্দাবন বিহারীদাসজি—৪, ৯, ৪৩, ৮৮, ১৩৩
" সচ্চিদানন্দ দাসজি—৪, ১৫৭
" সন্তদাসজি—১৩৫
কার্ডিনাল উলজি—৮৪, ৮৮
কার্লাইল—১৬
কিলরয়, মি.—৭৮
কিশোরগঞ্জ—৯, ২৪, ৪৪
কুম্ভ—১৫৩, ১৫৬
কৃষ্ণস্বামী—৭৬
কোকাকোলা—৬৮
ক্যান্টন—৬৪
ক্যান্টারবেরি—৯২, ১০০

ক্যান্টারবেরি টেলস—৫৭, ৯৬
কেমব্রিজ—৪৩, ৫১
কেলভিন, জন—৮০
ক্যালভিনিস্ট—৬৪
ক্রমওয়েল, ওলিভার—৪৮
ক্রাইস্ট চার্চ পার্ক—৮৪
„ „ ম্যানশন—৮৪
ক্লিভল্যান্ড—৯, ১০
খিরবেত কুমরান—৫
গণচৌধুরী, নরেন্দ্র ডা.—১০৩
গিরি মহারাজ, স্বামী কৃপালানন্দ—১১৫
গীতা—৯
গুপ্ত, শেখর—১৫৪
গ্যালারিজ লাফায়েৎ—১৯, ২০
গ্রীনিচ—১১৭
গ্লেশিয়ার গার্ডেন—৭৯
ঘোষ, গুড্ডু—১৬৩
„ বুলা—১৬৩
„ সমীর—৯, ১৬৩
ঘোষ, জ্যোতির্ময়, ডা.—২
চট্টগ্রাম—১৪১
চট্টোপাধ্যায়, ভোলানাথ, ডা.—১৬২
„ কৃষ্ণকিশোর প্রফেসার—১২৩, ১৪৩
„ ধ্যানেশ নারায়ণ—৮, ১৩৮
„ শ্যামাপ্রসাদ, মেজর—৭৬
চসার, জেফ্রি—১৩, ৫৭ ৯৬
চন্দ্রনাথ মন্দির—১৪৫
চার্চ অব দ্য হোলি সেপালকার——৪৯
চার্বাক—৪৭
চিত্তরঞ্জন—৯, ১০
চিত্তদা (রঞ্জন চক্রবর্তী)—১০২
চৌধুরী, অনুপ—৫৪
চৌধুরী, মণিলাল—২
জগন্নাথ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়—৮
জয়নাব—৭০
জর্ডন—৫, ৬
জাহাঙ্গীর—১৪১
জুরা পর্বতমালা—৬২
জুলিয়াস সিজার—৯
জেনেভা—৮০
জেরুসালেম—৫
জোয়ান অব আর্ক—১৭
জ্যোতিশ্বরানন্দ স্বামী—১৪৭
টয়েনবি, আর্নল্ড—৪৮
টিটলিস—৭৫
টিটিসী—৭১
টেমস্ নদী—১২২, ১২৬
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ—৯৭
ডিকেন্স, চার্লস—৯৯
ডিজনি পার্ক—২৬
ডিজনি স্টুডিও—২৬
ডিজনিল্যান্ড, প্যারিস—২৪, ৩৫
ডী, জন—৫০
ডেড সী—৫
„ „ স্ক্রল—৫
ডোনাল্ড—৪৯
ডোভার—৭, ১১, ১৪
ঢাকা—১৩২, ১৪০
ত্রিপুরা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিষদ—৯
দত্ত, চিত্তরঞ্জন, মেজর জেনারেল (অ.প্র.)—১৩৬, ১৩৯
দত্ত মধুসূদন—৪৪
দয়াত্মানন্দজি, স্বামী—৫৩
দান্তে, আলিঘেরি—৪৭
দাস, করুণাময় অধ্যাপক—৩৬
দাস, চানমোহন—২৫
দাস, ফণিভূষণ—২৪
দাস, সমীর ডা.—১৪৩
দিব্যানন্দজি মহারাজ, স্বামী—৮, ৫২

দীপক, দেব—১০২
দেবদাস, কৃষ্ণা—৮৫
দেবনাথ মনোরঞ্জন—১০২
দেববর্মণ, সহদেব বিক্রম কিশোর—৮
দেববর্মা, পঞ্চমা—৬০
ধর, ঋতা—১৪১, ১৪৬
ধর, জহরলাল—১১২
ধর, দীপঙ্কর—৩২
ধব, পার্থ, ডা —১৪১
ধর প্রভাসচন্দ্র, এপিটাফ—১০৭
ধর, প্রসূন—৩, ৬, ৮, ৬৬, ৭৪, ৯০, ১০৫
ধব বেলা—১, ১৩, ১৫
ধর, মণিলাল ডা.—১২, ১০২, ১৩৮
ধর, মুদিতা—৬, ৮, ৬৬, ৭৪, ৯০, ১০৫
ধব, রতিবঞ্জন—১৫, ১৬
নকুল—৩
নভোতেল—২৩
নাভার্ট, বোয়াজিযান—৬
নাবদ—২৮
নাৎসি—১৮
নিউটন, আইজাক—৫০, ১২২
নিজডেন লন্ডন—১১১
নেপোলিযন বোনাপার্ট—১৮, ১৯
নেহরু, জওহরলাল—৫০
ন্যাশনাল আকাদেমি অব আর্তস, প্যারিস—২২
পণ্ডিত সুকুমারী—৯
,, সুবোধ নারাযণ—৯, ১০
পাপ্পু (অশোক চক্রবর্তী)
পাল, জিতেন—২, ২৪
পালিত, রাজীব ডা.
পীযুষদা, (ভট্টাচার্য)—৯, ১০২
নেতাজি সুভায বিমান বন্দব—১
পুরী—৮
পূর্ণাত্মানন্দজি মহারাজ, স্বামী—৮৯, ১৫৪
পৃথ্বীরাজ, থিরু ওয়াইআর—১৩
,, যমুনা—১৩
পোপ, আলেকজান্ডার—১২০
পোপ, ভ্যাটিকানেব—১৭
প্যারিস—১১, ১৪, ১৮
প্রদীপ বিকাশ (রায)—১০২
প্রসাদ, মিসেস—৭৫
ফটো তোলা বিগত যুগে—৭২
ফিশার, জন—৪৪
ফ্রান্স—৪, ৭, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, ১৭
ফনেবো—৮১
বঙ্কিমচন্দ্র—১৬, ১৭
বন্দ্যোপাধ্যায, শবদিন্দু—৯৬
বসু, অপর্ণা—২
,, অমলকুমাব, অধ্যাপক—১৫৫
,, প্রতীক—৬৭, ৭১, ১০৫
,, প্রদীপ—২
,, বৃষ্টি—৬৭, ৭০, ৭১, ১০৫
,, মালবিকা—৬৭, ৭১, ১০৫
বাইবেল-জন—৪৭
,, I করিন্থিযান—৪৮
,, জন—৪৭
বাকিংহাম শাযাব—৪৩, ৫২, ৫৪
বাণী বৌদি—১২৩
বার্বিজ, চার্লস—৫০
বাবাট্রসি—
বার্ক, এডমান্ড—১৩
বার্টন, জন—৪৮
বার্লিন—৭১
বাহাযা ইন্দোনেশিযা—১৪
বাংলাদেশ ভিসা অফিস—১২
বিদ্যাসাগব, ঈশ্বরচন্দ্র—৪৪, ৪৬
বিশ্বামিত্র—৪৭
বুদ্ধদেব—৪৭, ৯২

বেকন, স্যার ফ্রান্সিস—৫০
বেকেট, সেন্ট টমাস—৮৮, ৯৪
বেঙ্গলি কালচারাল এসোসিয়েশান,
লন্ডন—১০৫
বেথলেহেম—৫
ব্রহ্মানন্দ মহারাজ, স্বামী—৩০
ব্রেইন, ডেভিড—১, ২৪
ব্ল্যাক ফরেস্ট—৭০
ভক্তি, শ্রীমতী—৬৭
ভাগবত—৯
ভট্টাচার্য, কৃষ্ণা—৯, ১০
,, কে. ডি.—১০
,, প্রিয়ব্রত—৮৯
,, মহুয়া—৬৭, ৯৩
,, সুধাবঞ্জন—২, ৪৩
,, সৌমজিৎ—৬৭, ৯৩
ভদ্র, কাবেরী—৮৫
,, যোগেশচন্দ্র—৭৬
ভার্জিল—৪৭
ভার্সাই—৩৬, ৪২
ভৌমিক, অমরেন্দ্র নারায়ণ—৮৬, ১৩১
,, কল্যাণাশীষ—৮৬
,, ছায়া—৮৬
,, পার্থসারথি—১০
মজুমদার, সুধীবরঞ্জন—৯১
মদ্রদেশ—৩
মনু সংহিতা—৪৬
মহাভারত—৩
মহেশখালি—১৪১, ১৫১
মা, আনন্দময়ী—১২১, ১৩৫
মাদ্রী—৩
মার্টিন, হেনরি—৪৮
মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল—৯৯
মিতা (ব্যানার্জী)—১০২
মিল্টন, জন—১৩, ৫০
মুখোপাধ্যায়, বিনয়কৃষ্ণ, অধ্যক্ষ—১৫৭
,, সত্যব্রত—১৬৩
মুজিবর রহমান—১৭
মুহম্মদ বিন তুঘলক—৩৭
মৃৎ প্রদীপ (গল্প)—৯৬
মেইজ হিল—১১৮
মেহতা, নাগেশ—১০
রফিকুল—৭০
রাজশ্রী, শ্রীমতী—৬৭, ৭৫
রাজা, এথেল বার্ট (১ম)—৯৩
,, জন—৮৪
,, হেনবি টিউডর—৪৪
,, হেনরি—৯৪
রানী, বার্থা—৯৩
,, রাসমণি—৪৪
বামকৃষ্ণ—৮
রামঠাকুব সঙ্ঘ—১২৪
বামানুজন, শ্রীনিবাস—৫০
বায়, জয়ন্ত—৮৫, ৯৩
,, দ্বিজেন্দ্রলাল—৪৬
,, পঙ্কজ—৩, ৯৩
,, পায়েল—৮৫, ৯৩
,, পূর্ণিমা—৯৩
,, শঙ্কর ডা.—৭৮, ১০৪
,, সুজিত—১২, ১৩৬, ১৫৩
রাসেল, বার্ট্রান্ড—৫০
রবার্ট ব্রাউনিং—১২, ১৭
রাহীনা—৭০
রীনা, সামশেদ বেগম—১৪৪
রিচার্ড ২য়—৪৮
রেইমস—৬৭
লক্ষ্মী আম্মা—৭৬
লন্ডন—২, ৪, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৮
লন্ডনে দুর্গাপূজা—১০১, ১০৮
লাভলেস, রিচার্ড—৯৯

লুই ফিলিপ—১৯
লুই, চতুর্দশ—৩৭
„ ত্রয়োদশ—৩৭
„ পঞ্চদশ—১৭, ১৮
লুজার্ন—৭৯
লুথেরান—৬৪
লেডি, মার্গারেত বিউফোর্ত—৪৪
লেসলি, অগাস্টিন—১৪, ১৫৫
লোয়েস্টফ্ট্—৪৩, ৫৯
ল্যাম, চার্লস্—৩৬, ৫০
ল্যুভর মিউজিয়াম—১৯
শ, জর্জ বার্নার্ড—১৭, ১৪১
শল্য—৩
শিখা (চক্রবর্তী)—১০২
শেক্সপীয়ার, উইলিয়াম—২, ৮, ১৩, ৩৬
শেনিযান—৩, ১২
শ্রীরামকৃষ্ণ—৪২, ৪৪, ৪৭
স্টান্ট ম্যান, অ্যাকশান—৩১, ৩২
স্ট্রসবুর্গ—৬৯
স্ট্রাটফোর্ড আপন আভন—১, ৮
সচ্চিদানন্দ দাস, স্বামী—৪
সম্রাট অশোক—১০২
সরকার, রতিরঞ্জন—১০২
সহদেব—৩
সংকেত (বিপ্রতীপ) দে—৯, ১৫, ২৭, ৩০, ৭৭, ১০২, ১০৭
সাহা, অঞ্জলি—১৩৭, ১৬৩
„ অলক—১, ২, ৪, ৫২, ১৫৪, ১৬৩
„ চুমকি—১, ১০২, ১৫৪
„ প্রীতম—৫৬, ১৬৩
„ বিদেশচন্দ্র—১৪৫, ১৫৩
„ রাম গোপাল ডা.—১৫৩
„ সঞ্জীব—১০৩, ১৫৪
„ সোমা—১, ২, ৯, ১০, ১০২, ১৫৪, ১৬৩
সাঁজে এলিজে—২১
সিনে ম্যাজিক—২৭
সিমিয়ন, চার্লস—৪৮
সুইজারল্যান্ড—৩, ৪, ১০, ১২, ৬২, ৮৩
সুমেধানন্দজি মহারাজ, স্বামী—৮
সেইন নদী—১৮, ২০
সেন, দীপক—১৪৫
সেন, শঙ্কর—২, ৩, ৪
সেন, অমর্ত্য—৫০
সেন, সুমঙ্গল—২৪
সেন্ট অগাস্টিন—১৪
স্বামীনারায়ণ মন্দির—১১১
স্বাহানন্দজি মহারাজ, স্বামী—৫২
হকিঙ স্টিফেন—৫০
হিটলার—১৮, ৬৪
হিন্দুপ্রগতি সংঘ, লন্ডন—১০৭
হিথরো—৬, ১০
হেনরি, অষ্টম—৪৪, ৪৭, ৯৫, ১২২
„ প্রথম—৪৪
হেলভেশিয়া—৬৩
হ্যারড্স্ ডিপার্টমেন্ট স্টোর—১১২